ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪০৩:৪

ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী	ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র একটি অপ্রকাশিত পত্র
ডঃ আয়েশা বেগম	কোটালীপাড়া দূর্গঃ দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীনতম দূর্গ নিদর্শন
ডঃ আবু তাহের বাব	বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চায় শিল্পী এস. এম. সুলতান এর অবদান
এস. এম. গোলাম নবী	রাজশাহীর বিয়েঃ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক গীত
ডঃ আলী আহমদ	চট্টগ্রামে দেওবন্দ আন্দোলন
মিস নাজনীন ইসলাম	বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থার নিয়ম ও অনিয়মঃ ১৯৯২ সালের গণ-পদোন্নতির একটি পর্যালোচনা
মোঃ ওমর আলী	প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের উপর একটি সমীক্ষা
খবির উদ্দীন আহম্মদ	মালিক ও ভাড়াটিয়াঃ বাড়ী ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রসঙ্গ
ডঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল	বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা
ডঃ স্বরোচিষ সরকার	বিংশ শতাব্দীর বাংলাঃ শব্দের রূপ বৈচিত্র ও বানান-বিভ্রাট
ইমরান হোসেন	বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খান বাহাদুর আহছান উল্লার (১৮৭৩-১৯৬৫) অবদানঃ একটি পর্যালোচনা
ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী	মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম'
ডঃ এম. মাহবুবর রহমান	বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর বাংলার জনস্বাস্থ্যঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা
ডঃ এম. আবুল কাশেম	বাঙ্গালী মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার ধারা (১৯৪০-১৯৭০)
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ ও ডঃ নুরুল হোসেন চৌধুরী	স্থানীয় সাহিত্যে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দূর্ভিক্ষ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আই.বি.এস জার্নাল

সম্পাদক মন্ডলী

মোখলেসুর রহমান
ইস. ইতিহাস বিভাগ, রা. বি.
এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী
ইস. ইতিহাস বিভাগ, রা. বি.
এম. শামসুর রহমান
লোক প্রশাসন বিভাগ, রা. বি.
নূরুল হোসেন চৌধুরী
ইতিহাস বিভাগ, রা. বি.
ঝরণা নাথ
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রা. বি.
প্রীতি কুমার মিত্র
ইতিহাসতত্ত্ব, আই. বি. এস., রা. বি.
এম. জয়নুল আবেদীন
অর্থনীতি, আই. বি. এস., রা. বি.

নির্বাহী সম্পাদক
মাহমুদ শাহ্ কোরেশী
সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস
পরিচালক, আই. বি. এস., রা. বি.

প্রবন্ধে উদ্ধৃত তথ্য ও মতামতের জন্য ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ–এর কোনো দায়দায়িত্ব নাই।

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক, আই. বি. এস. জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী–৬২০৫
বাংলাদেশ।

আই. বি. এস. জার্নাল

১৪০৩ ঃ ৪

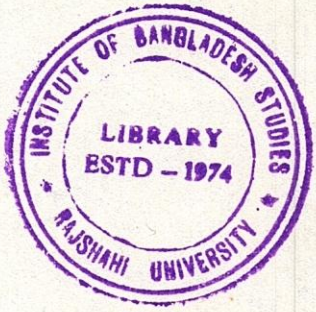

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

সম্পাদিত

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকঃ
মোফাজ্জল হোসেন
সচিব, আই. বি. এস.
ফোনঃ ৭৫০৭৫৩

প্রকাশ কালঃ
আষাঢ় ১৪০৩
জুন১৯৯৭

মূল্যঃ টাকা ৫০.০০

প্রচ্ছদ শিল্পীঃ
ডঃ আবু তাহের বাবু

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণঃ
সোনালী প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
এ/১৭৪ শিল্পনগরী, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৬১৮৪২

সূচীপত্র

ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী	ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র একটি অপ্রকাশিত পত্র	৫
ডঃ আয়েশা বেগম	কোটালীপাড়া দূর্গঃ দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীনতম দূর্গ নিদর্শন	৯
ডঃ আবু তাহের বাবু	বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চায় শিল্পী এস. এম. সুলতান এর অবদান	২৭
এস. এম. গোলাম নবী	রাজশাহীর বিয়েঃ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক গীত	৩৭
ডঃ আলী আহমদ	চট্টগ্রামে দেওবন্দ আন্দোলন	৪৭
মিস নাজনীন ইসলাম	বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থার নিয়ম ও অনিয়মঃ ১৯৯২ সালের গণ-পদোন্নতির একটি পর্যালোচনা	৫৭
মোঃ ওমর আলী	প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের উপর একটি সমীক্ষা	৭৩
খবির উদ্দীন আহম্মদ	মালিক ও ভাড়াটিয়াঃ বাড়ী ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রসঙ্গ	৮৫
ডঃ মোহাম্মদ গোলাম রসুল	বিংশ শতাব্দীর বাংলা	৯৭
ডঃ স্বরোচিষ সরকার	বিংশ শতাব্দীর বাংলাঃ শব্দের রূপ বৈচিত্র ও বানান-বিভ্রাট	১০৭
ইমরান হোসেন	বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খান বাহাদুর আহছান উল্লার (১৮৭৩-১৯৬৫) অবদানঃ একটি পর্যালোচনা	১৩১
ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী	মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম'	১৩৯
ডঃ এম. মাহবুবর রহমান	বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর বাংলার জনস্বাস্থ্যঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা	১৪৭
ডঃ এম. আবুল কাশেম	বাঙালী মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার ধারা (১৯৪০-১৯৭০)	১৬৭
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ ও ডঃ নুরুল হোসেন চৌধুরী	স্থানীয় সাহিত্যে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষ	১৮১
খন্দকার নাইমুল ইসলাম	গ্রন্থ পর্যালোচনা	১৯৭

প্রবন্ধকার পরিচিতি

ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী,	সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের প্রফেসর ও পরিচালক, আই. বি. এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ আয়েশা বেগম	প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ আবু তাহের বাবু	সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব এস. এম. গোলাম নবী	সেকশন অফিসার, (গ্রন্থাগার শাখা) আই. বি. এস. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ আলী আহমদ	প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
মিস নাজনীন ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মোঃ ওমর আলী	সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব খবির উদ্দীন আহম্মদ	সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ মোহাম্মদ গোলাম রসুল	অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ স্বরোচিষ সরকার	সংকলন বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
ডঃ ইমরান হোসেন	প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ সাইফুদ্দীন চৌধুরী	পরিচালক, বরেন্দ্র গবেষণা যাদুঘর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এম. মাহবুবর রহমান	প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ এম. আবুল কাশেম	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ	এম. ফিল গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ নুরুল হোসেন চৌধুরী	প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব খন্দকার নাইমুল ইসলাম	প্রভাষক, লোক প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র একটি অপ্রকাশিত পত্র

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ কোরেশী

শুধু বাংলাদেশে নয়, বিগত এক শতাব্দী বা তার কিছু বেশী সময়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় যে সব পণ্ডিত ভাষা–সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বৃহত্তর অংগনে অবদান রেখেছেন, প্রফেসর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁদের অন্যতম। বাংলার পটভূমিতে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

আমাদের সৌভাগ্যঃ আমরা তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছি; অনেকে তাঁর লেখা পুস্তক, প্রবন্ধ নয় শুধু–বক্তৃতায়, আলাপচারিতায় তাঁর অগাধ জ্ঞানভান্ডারের দক্ষিণা লাভে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি চারবার খুব স্বল্প সময়ের জন্য তাঁর সান্নিধ্যের সুযোগ পাই। প্রথমবার ১৯৫৪ সালের জুন মাসের এক অপরাহ্ন। একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভর্তির প্রথম সোপান পার হওয়া গেল। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হলো অল্প দিন পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি দ্বিতীয় দফা অবসর গ্রহণ করছিলেন তখন। তাঁর বিদায়–সভায় আমাদের পক্ষ থেকে কে যেন বলেছিলেন যে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা সরাসরি তাঁর ছাত্র হতে পারলাম না। কারণ তিনি আমাদের কোনো ক্লাস নেননি। পরদিন দুপুরে অধ্যাপক রবীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী যখন ক্লাস নিচ্ছিলেন হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ ব্যাগ হাতে পরিচিত ভংগীতে ক্লাসে ঢুকে বললেন ঃ রবীন্দ্র, তুমি একটু ওদের সংগ বসো। এদের আমি ছাত্র বানিয়ে যাই। ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের ব্যাপারে কিছু মূল্যবান উপদেশ আমরা সেদিন শুনি।

এর ক'বছর পর–১৯৫৯ সালের হেমন্তের এক সন্ধ্যায় আমি হাজির হই তাঁর করাচীর বাসায়। ফরাশি সরকারের বৃত্তি নিয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যায়নের জন্য আমি প্যারিসে যাচ্ছিলাম। করাচীতে ভিসা নেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে ২/৩ দিন থাকতে হলো। আমার ফুফাতো ভাই মরহুম শামসুল আলম (ডেপুটি সেক্রেটারী, স্বাস্থ্য) আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। সস্নেহে নানা প্রসংগে কথাবার্তা বলেন ডঃ শহীদুল্লাহ এবং আমাকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন।

প্যারিসে গিয়ে সর্বনের ভারতীয় সভ্যতার ইনষ্টিটিউটে প্রফেসর লুই রনুর তত্ত্বাবধানে ডক্টরেটের জন্য কাজ শুরু করি। রনু সাহেব শহীদুল্লাহ সাহেবকে বেশ কিছু কোর্সে সহপাঠী রূপে পান। ১৯৩০ সালে তিনি ডিগ্রী করেন। ডঃ শহীদুল্লাহর দু'বছর পর। আমার অধ্যাপকের নির্দেশে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান/অবস্থান বিষয়ে কাজ শুরু করবার কিছু পরে আমি তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি খুব দ্রুত জবাব দেন। এরপর আমি একটু দেরী করে কিছু খবরাখবরসহ দ্বিতীয়বার চিঠি লিখি করাচীর ঠিকানায় কিন্তু তার কোনো উত্তর পাইনি। সম্ভবত এই সময়ে ঢাকা চলে আসার কারণে তিনি আমার চিঠি পাননি।

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর ১৯৬৫ সালের জুলাইতে আমি ঢাকায় এলে বাংলা একাডেমীতে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করি এবং আমার অভিসন্দর্ভ তাঁকে দেখাই। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন ও বেশ

নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমার গ্রন্থে তাঁর ওপরও এক পৃষ্ঠা লেখা আছে। তিনি তাও পড়লেন এবং পরে, উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন ও দোওয়া করলেন। আমি তাঁকে কদমবুচি করলাম। এ সময়ের একটা অভিজ্ঞতা হলোঃ তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে, শুদ্ধ উচ্চারণে ফরাশি ভাষায় কথা বললেন কিছুক্ষণ। এবং তাতে অনভ্যাসজনিত ইতস্ততভাব বা উপমহাদেশীয় মুদ্রাদোষ দেখা গেল না। উল্লেখ্য যে, আমার অভিসন্দর্ভটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় এবং প্যারিস থেকে আমার কাছে আগরতলায় প্রেরিত হয়। মহামনীষী শহীদুল্লাহ তখন আর জীবিত ছিলেন না। পরে তাঁর প্যারিসের পড়াশুনা বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকায় আমার একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর ইংরেজি জার্নালে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র অভিসন্দর্ভে প্রকাশিত তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর জুল ব্লক-এর ভূমিকাটি অনুবাদ করি এবং জন্মশতবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতেও একটি প্রবন্ধ লিখি। (*J. I. B. S.* vol. VIII & vol. IX)। আরো অনেকে এর মধ্যে এই অক্লান্তকর্মী জ্ঞানতাপসের দীর্ঘজীবনের সাধনার বহু বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, মূল্যায়নের প্রয়াসও পেয়েছেন। কিন্তু তবু মনে হয় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, সঠিক বিচার তাঁর জীবৎকালেও যেমন হয়নি তেমনি তাঁর মৃত্যুর পর বিগত সাতাশ বছরেও হয়নি।

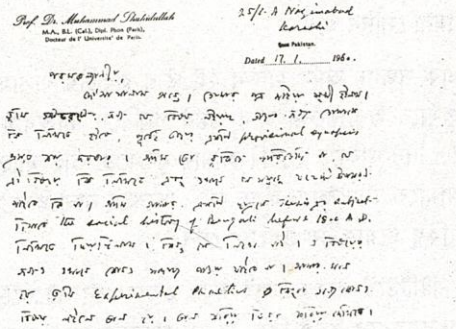

Prof. Dr. Muhammad Shahidullah
M.A., B.L. (Cal), Dipl. Phon. (Paris)
Docteur de l 'Universite ' de Paris

25/1-A Nazimabad
Karachi
Pakistan
Dated 17.1.1960

পরম কল্যানীয়

দো'আ সালাম অন্তে। তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। তুমি ডক্টরেটের জন্য যে বিষয় লইয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে কি লিখিতে হইবে; পুর্বেই তাহার একটি Provisional Synopsis

প্রস্তুত করা দরকার। আমি তো বুঝিতে পারিতেছি না, যে এই বিষয়ে কি লিখিবে এবং ওখানে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট উপকরণ পাইবে কিনা। আমি আমার একটি ছাত্রকে Thesis এর Subject হিসাবে The Social history of Bengali before 1800. A.D. লিখিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু সে লিখে নাই। এ বিষয়ের জন্যও ওখানে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না। আমার মনে হয় তুমি Experimental phonetics কিংবা অন্য কোনও বিষয় লইলে ভাল হয়। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে। "ভাবিতে উচিত হয় প্রতিজ্ঞা যখন"। Bibliothique Nationale যে কয়েকটি বাংলা বইয়ের পাণ্ডুলিপি আছে, তুমি আমাকে তাহাদের লিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠাইলে সুখী হইব। Prof Louis Renou কে আমার অভিবাদন জানাইবে এবং আমার Thesis "Les Chauts Mystiques" যাহা ওখানকার প্রকাশক Adrien Maisoneuve ছাপাইয়াছিল তাহা পাওয়া যায় কিনা জানাইবে। তাঁহার কোনও বই পাইলে আমি কৃতজ্ঞ হইব। আমি ভাল আছি। তোমার কুশল কামনা করি। ভাল কথা, আমার অন্যতম Prof. Przuluski এবং Jean Bacot বাঁচিয়া আছেন কিনা জানি না। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আমার অভিবাদন জানাইবে। ইতি

একান্ত শুভাকাংক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

[কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আমি শিরোনাম পরিবর্তন করলেও বিষয় পরিবর্তন করিনি। আমার অভিসন্দর্ভঃ *বাঙলার মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের ধারাঃ ১৮৫৭–১৯৪৭;* লুই রনুর মতো প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ছাড়া ইসলামোলজির অধ্যাপক শার্ল পেল্লা (যিনি ইতিহাস সম্মেলনে ঢাকা ও রাজশাহী এসেছিলেন '৫০/'৬০ এর দশকে এবং যিনি *'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম'*–এর অন্যতম সম্পাদক) ছিলেন আমার দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক তবে তৃতীয় পরীক্ষক কবি, উর্দু ও পাকিস্তানী সভ্যতার অধ্যাপক অঁদ্রে গ্যাঁব্রতিয়ের–এর কাছ থেকে আমি সবচে বেশী সাহায্য পেয়েছি। তাছাড়া লন্ডন, অক্সফোর্ড, ন্যুইয়ক, কোপেনহ্যাগেন, ষ্টকহোম প্রভৃতি শহরের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি এবং দেশ থেকে গাদাগাদা বইপত্র নিয়ে যেতে হয়েছিল। তাছাড়া, একবছর ফনেটিক্সও পড়েছি; তাঁর বইটি এখনো প্যারিসে পাওয়া যায়। তবে তাঁর অধ্যাপক দু'জন পুশিলুস্কি (?) এবং জঁ বাকো বহু আগেই পরলোকগত ছিলেন]।

কোটালীপাড়া দুর্গঃ দক্ষিণ বঙ্গের প্রাচীনতম দুর্গ নির্দশন

ডঃ আয়শা বেগম

বাংলা অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। হাজার বছর ধরে এখানে যে ঐশ্বর্যময় প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল তার খুব কম স্বাক্ষরই আজ পরিলক্ষিত হয়। নদী মাতৃক বাংলাকে সাধারণত পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে; এগুলি (১) পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর অপরপারের এলাকা (Trans-Bhagirathi area of west Bengal), (২) উত্তরের হিমালয় পাদদেশে অবস্থিত এলাকা (Himalays foot hills and duar area in the North (Now in west Bengal), (৩) উত্তরের পুরাতন বরেন্দ্র এলাকা (Northern paradella or varendra area), (৪) বাংলার মেঘনার অপর পারের ভূ-ভাগ (Trans-Meghna territories of Bengal) ও (৫) দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল (The Della in the south). প্রাচীনকাল থেকে এই প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি প্রশাসনিক এলাকার সীমা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এসেছে। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়েছে। নদ-নদী পরিবেষ্টিত বাংলার নদীই সৃষ্টি করেছে বাংলার ভূগোলের প্রাকৃতিক সীমা, আর সে সীমাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বাংলায় শহর ও দুর্গের অবস্থিতি প্রধানত নদীর উপকূলে পরিলক্ষিত হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করতে এ অঞ্চলের নদী, উপ-নদী, শাখা-নদী, দীঘি-নালা, খাল-বিল, দুর্ভেদ্য অবস্থা সৃষ্টি করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে সহায়তা প্রদান করেছে।[১] আবার একথাও সত্য যে নদীর গতিপথ পরিবর্তন ও ভাঙ্গনের ফলে বাংলার অনেক প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদ, সুরক্ষিত রাজধানী শহর ও দুর্গ বিলীন হয়ে গেছে।

একদা সমৃদ্ধ বাংলার অনেক জনপদ এখন সনাক্তকরণ প্রায় অসম্ভব। যে সব শহর ও দুর্গের নাম লিখিত তথ্য, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা ইত্যাদি সূত্রে জানা যায় তার অবস্থান প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ধারণ করা সহজ সাধ্য নয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে নির্মিত দুর্গ এবং এর দুর্ভেদ্য প্রকার, বুরুজ, প্রবেশ পথ ইত্যাদি কালের গতিতে অধিকাংশই ধ্বংশ হয়ে গেছে; অধিকন্ত যে সব স্থানে এ সব নির্দশন অবস্থিত ছিল বলে জানা যায় সে সব স্থানের অস্তিত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে নিরূপণ করা হয় অনুমানের উপরে ভিত্তি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাও প্রায় অসম্ভব। উত্তর বাংলার মহাস্থানগড় (বগুড়া) বর্তমানে প্রায় নিঃসন্দেহরূপে এ অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন দুর্গ নিদর্শন রূপে স্বীকৃত। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে দক্ষিণবঙ্গের সর্ব প্রাচীন দুর্গ কোটালীপাড়া (থানাঃ কোটালীপাড়া, জেলাঃ গোপালগঞ্জ, বৃহত্তর ফরিদপুর) একেবারেই অনালোকিত ও অনালোচিত

বলে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। কোটালীপাড়া দুর্গ প্রায় অনালোচিত থাকার কারণ প্রথমত এখানে কোন পরিকল্পিত জরিপ ও নিয়মানুগ খনন কাজ এখনও সম্পাদিত হয়নি। কোন প্রাচীন শহর ও দুর্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এবং নিশ্চিত রূপে জানতে সাধারণতঃ সেই স্থানের বিস্তৃত জরিপ অনুসন্ধান ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননই প্রধান এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কোটালীপাড়া দুর্গ ও এ জনপদে কোন প্রকার জরিপ, অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও খনন কাজ সম্পাদক করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ বঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক যে সীমিত গবেষণা হয়েছে[২] তাও আমাদের সবার কাছে প্রায় অজানা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক আগে থেকেই কোটালীপাড়া দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীনতম দুর্গ নিদর্শনটির অবস্থান প্রায় জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। কোটালীপাড়া দুর্গটি (চিত্র ও নকশা) এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দক্ষিণ বঙ্গের কেবল প্রাচীনতমই নয়, বৃহত্তম দুর্গ নির্দশন রূপেও প্রতীয়মান। দক্ষিণ বঙ্গে অবস্থিত কোটালীপাড়া দুর্গটির প্রাচীনত্ব, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত লিখিত তথ্য, তাম্র শাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, সম্প্রতি জরিপ ও বাস্তব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অস্পষ্টতা দূর করে এ দুর্গ সম্বন্ধে যথা সম্ভব স্পষ্টতর ধারনা গঠন করার প্রয়াশই এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

কোটালীপাড়া দুর্গটি (২২°৫৯ উঃ অক্ষাংশ এবং ৯০°০০ পূঃ দ্রাঘিমা) গোপালগঞ্জ জেলার (বৃহত্তর ফরিদপুর) কোটালীপুর থানায় গোপালগঞ্জ (সদর) থেকে ২৮.৯৭ মিটার (১৮ মাইল) দক্ষিণ-পূর্বে ঘাঘর নদীর বাম তীরে অবস্থিত।[৩] ঘাঘর নদীর একটি শাখা দুর্গটির ভিতরে প্রবেশ করেছে এবং এ নদীটি মধুমতি নদীতে গিয়ে মিশেছে। আদিতে দুর্গটির আকৃতি বর্গাকার ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[৪] যদিও বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (১৯৭৭) প্রকাশিত তথ্যে উল্লেখ করা হয় দূর্গটি সুরক্ষিত অবস্থায় আছে "In a good state of preservation",[৫] প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণের অভাবে অনেক আগে থেকেই দুর্গটি ধ্বংসের অন্তিম পর্যায়ে পৌছে গেছে। বর্তমানে প্রাচীন দুর্গটির ধ্বংসাবশেষের উপরে কয়েকটি নতুন গ্রাম গড়ে উঠেছে। দুর্গটির চারদিকের পাড়গুলি ছিল পাহাড়ের মত উঁচু। বর্তমানে পাড়গুলি আগের মত উঁচু অবস্থায় নেই। এই পাড়গুলির উপরে বিস্তৃত উঁচু ভূমিতে সম্প্রতি জন বসতি গড়ে উঠেছে। এ এলাকায় অসংখ্য জলাশয় মজে গিয়ে কৃষি ভূমিতে পরিণত হলেও কোথাও কোথাও এ সব জলাশয়ের মৃত খাত পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অনেক আগেই যে কোন কারণেই হোক এই এলাকা পরিত্যাক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এখানে জঙ্গল পরিস্কার করে বসতি স্থাপিত হয়। মানুষের প্রয়োজনে উঁচু বেষ্টনী ঢিবিগুলি কেটে ফেলে সমতল ভূমিতে পরিণত করা হয়। এই ধ্বংস প্রক্রিয়া বিরতিহীনভাবে ঘটে চলেছে যার ফলে কোটালীপাড়ার মত এককালে সুরক্ষিত বৃহৎ নগরীর কীর্তি নিদর্শন অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংশের শেষ সীমায় পৌছে যাবে সেখানে আর কোন প্রত্নবস্তু উদ্ধার কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হবে না। ভূমিকম্প বা প্রবল বন্যা এ ধরনের কোন প্রাকৃতিক কারণে কোটালীপাড়া নিম্নভূমিতে পরিণত হয়েছে বলে অনুমিত হয়। ফলে

বর্তমানে কোটালীপাড়া প্রায় সারা বছর জলমগ্ন হয়ে থাকে। ১৯৯১ সনে শুকিয়ে যাওয়া পুকুরের পাড়ে ইটের প্রাচীরের রেখা পরিলক্ষিত হয়েছিল। যে সব প্রাচীন জলাশয় এখানে রয়েছে পানি কমে গেলে ঘন তৃণদলে আচ্ছাদিত মাটির দেয়াল কখনও কখনও দেখা গেছে এবং এসব তৃণদলে আচ্ছাদিত মসৃণ দেয়ালগুলির অভ্যন্তরভাগে প্রাচীন ইটও পাওয়া গেছে। তবে এসব ধ্বংসাবশেষ কোন ইমারতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত উপসংহারে পৌছাতে সাহায্য করে না।

কোটালীপাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যতই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ুক না কেন এ দুর্গনগরী বর্তমানে কোটালীপাড়া নামক গ্রাম ও তার আশে পাশের গ্রামের উপরে একই স্থানে অবস্থিত বলে প্রতীয়মান হয়। কোটালীপাড়া যে একটি দুর্গ তা এর নামের অর্থের মধ্যেই নিহীত আছে। 'কোট', 'আল' ও 'পাড়া' এই তিনটি শব্দের যৌগিকরূপ কোটালীপাড়া। মোট তিনটি শব্দের প্রথমটি 'কোট' অর্থ দুর্গ (fort), দ্বিতীয়টি 'আল' অর্থ বেষ্টনী বা প্রাকার (rampart) এবং শেষ শব্দটি 'পাড়া' অর্থ বসতি বা লোকালয়।[৬] অনেকে মনে করেন এ দুর্গের (কোট) অবস্থিতির কারণে এ স্থানের কোটালীপাড়া নামকরণ হয়েছে। অতএব দূর্গ শব্দটি কোটালীপাড়া শেষে অতিরিক্ত যোগ না করলেও কোটালীপাড়া যে একটি প্রতিরক্ষা সম্বলিত নগরী তা আর উল্লেখের অবকাশ নেই।[৭] বাংলাদেশ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে (১৯৭৭) কোটালীপাড়ার নাম লেখা হয়েছে কোতওয়ালীপাড়া (Kotwalipara) যা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না কারণ এ শব্দটি আরবী এবং প্রাচীন বাংলায় এ শব্দের অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা নয়।[৮]

নলিনী কান্ত ভট্টশালীর মতে কোটালীপাড়া বাংলার বৃহত্তম দুর্গ এবং এর আয়তন ২$\frac{১}{২}$মাইল x ২$\frac{১}{২}$ মাইল। তার মতে বাংলার দ্বিতীয় বৃহৎ দূর্গ মহাস্থানগড় (১০০০ হাত x ১৫০০ হাত) এবং কোটালীপাড়া দুর্গের পরেই এ দুর্গটির স্থান। ১৯২৫ সনে এল. এস. এস. ওমেলীর বর্ণনা অনুসারে বেষ্টনী মাটির প্রাচীর (mud wall) ৪.৫৭ মিটার থেকে ৯.১৪ মিটার (১৫ ফুট থেকে ৩০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল। নলিনী কান্ত ভট্টশালীর দুর্গের বর্ণনায় উল্লেখ করেন ". . . the big fort is there and brick constractions very often come up unexpectedly from low water logged places." তিনি দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণের বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে ঐ স্থানটি বুজর্গের কোণা নামে পরিচিত এবং পাশ্ববর্তী এলাকা থেকে প্রায় ১৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এ স্থানটি বাইরের পরিখার কাছে আরো বেশী উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল এবং এখানে প্রাচীরের প্রশস্ততা ছিল ১৫০ হাত।[৯] এ কোন থেকে প্রায় অর্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পুকুর ও পুকুরে পারে বৃহৎ বৃক্ষ পরিবেষ্টিত একটি বাড়ি, যে বাড়িটি জতিয়া বাড়ি নামে পরিচিত ছিল। ভট্টাশালীর বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে পুকুরের উত্তর পাড়ে পূর্ব-পশ্চিমে দু'টি রাস্তা আছে। এ স্থানের সামান্য উত্তরে অবস্থিত গোবিন্দপুর নামে একটি গ্রাম আছে; ভট্টাশালীর ধারনা তাম্র শাসনে উল্লিখিত গোপেন্দ্র চোর্কারে 'গোপেন্দ্র' ও গোবিন্দপুরের 'গৌবিন্দ' শব্দ দুটি এক ও অভিন্ন।[১০]

সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ ভিত্তিক প্রতিবেদন অনুসারে বিলুপ্ত প্রায় কোটালী পাড়া দূর্গের যে চিত্র পাওয়া যায়[১১] তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। প্রতিবেদনে দুর্গটি আনুমানিক ১৭.৬ কিলোমিটার এলাকার উপরে বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। বর্তমানে দুর্গ এলাকায় ৭০০ মিটার পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ঘাঘর নদী। নদী ও দুর্গের মাঝে স্থান জুড়ে রয়েছে যথাক্রমে পশ্চিমগাঁও, ডুবারপাড়া, ফেদরা (ফেরধরা), কয়েখা ইত্যাদি গ্রাম; উত্তরে রাঢ়ির বিল ও গোবিন্দপুর; পূর্বে বিদ্যাধরজ্যোতি বা জটিয়ার বাড়ি, ভুয়ারপাড়, শান্তিকুটির, বুজরগের কোণা ও সিতাইনমুতি; দক্ষিণে পিঞ্জকোষ্ঠী (পিঞ্জরী) ও সুয়াগ্রাম। পশ্চিমকোণে অবস্থিত গুয়াখোলা, কুরপাল ও ঘুঘরাহাটি[১২] গ্রামগুলি অত্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ববাহী যা আমরা অন্যান্য তথ্য সূত্রে জানতে পারি। মাটি দিয়ে তৈরী এ দুর্গের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ কিলোমিটার। দূর্গ প্রাকার পাশ্ববর্তী বিলের ভূমি থেকে তখন ২.৪৩ মিটার উঁচু ছিল। দুর্গ প্রাচীরের সংলগ্ন বহির্ভাগ ঘিরে আছে ৬০ মিটার প্রশস্ত পরিখা। এ পরিখা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজে গেছে। তবে কোন কোন স্থানে এর গভীরতা প্রায় ২.২০ মিটার। মাটির প্রাকার কোন কোন স্থানে ৭০ মিটারের কাছাকাছি বিস্তৃত। এ দুর্গের বাহুগুলি স্থানীয় জনগণের কাছে যথাক্রমে পূর্বপাড়, পশ্চিমপাড়, দক্ষিণপাড় ও উত্তরপাড় নামে পরিচিত। দূর্গের অভ্যন্তরে নিচু বিল এলাকার কিছু অংশ মাটি থেকে বসতবাড়ী তৈরী করছে এবং আবাদী জমিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। দূর্গ এলাকা ও মাটির প্রাকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে বিলুপ্ত হতে চলেছে। এ এলাকাগুলি সিকির গ্রাম, রতাল, গচাপাড়া, চিত্রপাড়া, পাড়কোণা, আমতলী, মনসাবাড়ী ও ডউয়াতলী নামে পরিচিত। মধ্যবর্তী গ্রামটির নাম উনসিয়া।[১৩] এ গ্রামে দূর্গের পশ্চিম প্রাচীরের সীমানায় পরিখার কাছাকাছি স্থানে ১৯৭৮ সনে একটি গর্ত খোড়ার সময় কিছু প্রাচীন ইট বেড় হয়ে পড়ে। ইটগুলি দেখতে পাতলা ও চওড়া এবং এ ধরনের নির্মাণ কাজ গুপ্তযুগের বলে প্রতীয়মান হয়। পশ্চিম প্রাচীরের কাছাকাছি স্থানে এক পুকুরে একটি নাগ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। নাগ কাষ্ঠটি কয়েক শ বছরের পুরাতন হতে পারে বলে আ. কা. মো. যাকারীয়া তার পুস্তক বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদে উল্লেখ করেন।[১৪] পশ্চিমপাড় নামে দুর্গের বাহুর উপর নির্মিত হয়েছে কোটালীপাড়া থানা সদরের বিভিন্ন ইমারত। দুর্গ প্রাকারের অপরাপর অংশ বর্তমানে ঘন কাঁচা বাড়ি ঘর ও ঝোপঝাড়ে পূর্ণ। পূর্ব পার্শ্বস্থ জটিয়ার বাড়ির মাটির নিচে কিছু প্রাচীন ইটের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরপাড়, দক্ষিণপাড় ও পূর্বপাড়ে[১৫] ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। পূর্ব পাড়ের ভাঙ্গনটি অত্যন্ত প্রশস্থ এবং এ স্থানটি "বড় ভাংগা" নামে পরিচিত। অনুমিত হয় যে এই স্থানেই ছিল দূর্গে প্রবেশের প্রধান ফটক।[১৬]

কোটালীপাড়ার (দূর্গের) ধ্বংসাবশেষের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণে একে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত অত্যন্ত গুরুত্ববাহী জলদুর্গের নির্দশন বলে অভিহিত করা যায়। নদী বিধৌত বাংলায় নৌপথই নৌযান যাতায়াতের প্রধান অবলম্বন ছিল এবং নৌবাহিনী ছাড়া তখন এ অঞ্চলে যদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা ছিল না। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তাই পানি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। লিখিত

তথ্যের উপরে ভিত্তি করে কোটালী পাড়া যে প্রাচীন বাংলার অতি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষিত নগরী ছিল তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। যতদূর ধারণা করা যায় এটি ছিল বহিঃ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জলদূর্গ। দুর্গটির ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থান (topo graphical situation) এর সীমা, বাইরের নদীর সাথে দুর্গ অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশাল বিলের সংযোগ জলপথ ও সর্বপরি এর গঠন বৈশিষ্ট্যে এটি যে একটি শক্তিশালী বৃহৎ জলদূর্গ ছিল তার যথার্থ সমর্থন যোগায়। কোটালীপাড়া দুর্গের চারপার্শ্বে রয়েছে মাটির সুউচ্চ বাধানো পাড়ের ন্যায় বেষ্টনী প্রাচীর (mud wall) আর এই মাটির প্রাচীর ঘিরে চার দিকে রয়েছে প্রশস্থ দীঘি। বাংলার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জলদুর্গের স্থান সর্বাগ্রে।[১৭] জল দুর্গের সংজ্ঞায় দুর্গের চতুর্দিকে অগাধ জলাশয়ে পরিবৃত থাকার বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ রয়েছে। কোটালীপাড়া দুর্গের অভ্যন্তর ভাগ যে গভীর জলরাশি পূর্ণ বিল ছিল সেখানে সম্ভবত প্রতিরক্ষা কাজে নিয়োজিত নৌবাহিনী অবস্থান করত। উন্নত নৌশক্তি ছাড়া তৎকালে এ অঞ্চলে যুদ্ধজয়ের বা আত্মরক্ষার সম্ভাবনা ছিল না এবং শক্তিশালী রাজার রাজ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নৌ-বাহিনী এবং বৃহৎ জল দুর্গ। সমর সজ্জায় প্রস্তুত হয়ে সেনাবাহিনী বাহির আক্রমণ প্রতিহত করে দ্রুত দূর্গের অভ্যন্তরে সংযোগ পথ দিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম ছিল এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসা তাদের জন্য সহজ ছিল। এভাবে সুরক্ষিত জলদূর্গ থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা তৎকালীন নদীবহুল বাংলার উন্নত জল দূর্গের দুর্ভেদ্য শক্তির পরিচয় বহন করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং পানির মধ্যে বিরাজমান যে সু সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষায় পানির যে ভূমিকা তা নিঃসন্দেহে বাংলায় দুর্গ স্থাপত্যের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত এবং কোটালীপাড়া দূর্গে পানির এ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের কৃষি নির্ভর মানুষের কখনও সাময়িক ধ্বংস ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ হলেও চিরকাল পানির সাথে প্রায় একাত্ম বাংলার মানুষের খাদ্য শষ্য, জীবিকা, ও আত্মরক্ষা এবং আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনতিক্রম্য জল দুর্গ বাইরের আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্য এই জলময় বদ্বীপ অঞ্চলে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়।[১৮]

ভট্টাশালীর মতানুসারে এ অঞ্চলের প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল কোটালীপাড়া দুর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা জনপদে। তার বর্ণনায় "a most impressive monument in the shape of a great fort."[১৯] বলে কোটালীপাড়া দুর্গকে উল্লেখ করা হয়। রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, "... Kotalipara... was once a thriving seat of civilization and possibly a centre of sea borne trade and commerce."[২০] একদা এত সমৃদ্ধ সুরক্ষিত নগর দুর্গ কেন এই সুদূর দক্ষিণ বঙ্গের নিম্নাঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল এ প্রশ্নের উত্তরে ঐতিহাসিকেরা প্রায় সবাই একমত যে ভূ প্রকৃতির পরিবর্তনের ফলেই কোটালীপাড়ার অবস্থান বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। কোটালীপাড়ার নিচু

অবস্থানের জন্য সম্ভবত অতীতে এখানে সংঘটিত কোন বড় ধরনের ভূমিকম্প দায়ী[২১] এবং ফলে কোটালীপাড়া একটি জলবদ্ধ স্থানে পরিণত হয়। ভট্টাশালীর মতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই শাসনকেন্দ্রটি ধ্বংস হলে উক্ত রাজবংশের কোন একজন উত্তরাধীকারী তাদের শাসন কেন্দ্র উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ভূমিতে স্থানান্তরিত করে।[২২] ভট্টাশালী লিখেছেন, "There is ample evidence to prove that this part of the country reffered in remote antqity from a general subsistence due most probably to a great earthquake. This event can be dated on the evidence of the plates in the last quarter of the 6th century A. D. the vicirity of chandra-Verman's fort begans to be water logged and unfit for habitation. The headquarters of the locality had to be moved north on more stable land and the people also migrated there."[২৩]

ভট্টাশালীর মতে সে সময়ে সম্ভবত রাজধানী কোটালীপাড়া থেকে ঢাকা জেলার সাভারে নিয়ে যাওয়া হয়। ভট্টাশালী তার এই মন্তব্যের পক্ষে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেন নি।

ভট্টাশালী তার অনুমানের স্বপক্ষে হরহ লিপির উল্লেখ করেন। এ লিপি থেকে জানা যায় ঈশন বর্মা (আঃ ৫৫৪ শতক) কন্যাকুব্জের (কনৌজ) মৌখুরী রাজ বংশীয় নৃপতি ৬ষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি গৌড় রাজদের পরাজিত করে কোন সমুদ্রতীরবর্তী আশ্রয়ের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য করে।[২৪] তাছাড়া প্রবোধশিবের গুরগী শিলালিপি (প্রবোধ শিবের শাসনকাল আনুমানিক দশম থেকে একাদশ শতক) থেকে জানা যায় যে কালাচুরী রাজার ভয়ে গৌড়রাজ (মহীপাল ১) সমুদ্রে অবস্থিত জলদুর্গে অবস্থান করেছিল। কালাচুরী রাজা এবং গৌরাজ উভয়েরই নিশ্চিত পরিচয় জানতে পারা যায় না। শিলালিপিটির কিছু অংশ ভাংগা জন্য আর অধিক তথ্য এতে পাওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু অন্যান্য সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান সঠিক হলে এ বিষয়টি নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে ১০-১১ শতাব্দী পর্যন্ত কোটালীপাড়া দুর্গ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথম মহীপালদেরকে গৌড়ের রাজা এবং তার আক্রমণকারী প্রতিপক্ষকে কালাচুরী রাজা গাঙ্গেয়দেব বলে মনে করা যায়।[২৫] গুরগী শিলালিপি বাক্য ইঙ্গিত প্রদান করে যে সম সাময়িক কোন একজন নৃপতি দক্ষিণবঙ্গে কোটালীপাড়ার ন্যায় কোন একটি সুরক্ষিত দুর্গে অস্থায়ী আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।[২৬]

কোটালীপাড়া দুর্গটি অনেক আগে থেকেই চন্দ্রবর্মনকোট বলে পরিচিত এবং এ নামটির উৎপত্তির মূলে একটি "ফরিদপুর তাম্র শাসনের" উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ঘুঘরাহাটিতে (বৃহত্তর ফরিদপুর) প্রাপ্ত সমাচার দেবের (চতুর্দশ বছর) (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতক) তাম্র-শাসনে "চন্দ্রবর্মনকোট' নামে একটি

দূর্গের উল্লেখ আছে। সমাচার দেবের তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমা নির্দেশকালে একে "চন্দ্রবর্মন কোট" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি চন্দ্রবর্মন কোটের (কোটালীপাড়া দূর্গের) নামকরণ চন্দ্রবর্মনের নাম অনুসারে হয়ে থাকে তাহলে কে এই চন্দ্র বর্মন যার নাম ৬ষ্ঠ শতকে সমাচারদেবের সময় অবধি স্মরণীয় হয়ে ছিল? দিল্লীর কুতুবমিনারের কাছে মেহেরওয়ালী লৌহ স্তম্ভে উৎকীর্ণ 'চন্দ্র' নামে একজন রাজার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গদেশে সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এ 'চন্দ্র' প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে যদি লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ 'চন্দ্র' প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত হয় তাহলে ধরে নিতে হতে সমুদ্রগুপ্তের পূর্বেই বঙ্গদেশ তারা জয় করে নেয় এবং কিছু কাল পরে বঙ্গদেশ আবার স্বাধীন হয়ে যায়। যার ফলে সমুদ্রগুপ্তকে আবার বঙ্গদেশ নতুন করে জয় করতে হয়েছিল। এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা খুব কম। রমেশ চন্দ্র মজুদার তাই লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ 'চন্দ্র' কোন গুপ্ত বংশীয় রাজা নয় বলে তার ধারণা ব্যক্ত করেন।

কোটালীপাড়াদুর্গের উৎস নির্ণয়ে একজন শাসকের নামের সাথে যোগসূত্র আছে বলে উল্লেখ করা হয়। বাকুড়া জেলায় সুসুনিয়া পর্বতগাত্রে পুষ্করনাধিপতি সিংহবর্মন ও তার পুত্র চন্দ্রবর্মনের নাম উল্লেখ আছে। এ চন্দ্র বর্মনের নামানুসারে দক্ষিণবঙ্গের দুর্গটির চন্দ্রবর্মন কোট নাম ধারন করেছে বলেও উল্লেখ করা হয় যা গ্রহণ করতে যথেষ্ট অন্তরায় রয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে একমাত্র নামের মিল ছাড়া অন্য কোন প্রকারেই সুদূর দক্ষিণ বঙ্গের এ বিশাল আয়তনের দুর্গের সাথে পশ্চিমবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের এ রাজার কোন যোগ সূত্র আছে বলে অন্য কোন তথ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হয়নি।[২৭]

তিনজন স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতি – গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের সম্বন্ধে বিস্তৃত কিছু জানা সম্ভব না হলেও প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে দক্ষিণবঙ্গে কোটালীপাড়ায় অবস্থিত সুরক্ষিত রাজধানী থেকে তারা ৬ষ্ঠ শতকে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এ বিষয়ে প্রমাণ সরূপ মোট আটটি লিপির উল্লেখ পাওয়া গেছে। এগুলি প্রধানত তাম্রশাসন। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ইতিহাসের অত্যন্ত নির্ভরশীল ও তথ্যবাহী প্রমাণ বলে সর্বজন স্বীকৃত। এই লিপি সম্ভার অধিকাংশই ভূমিদান সম্পর্কিত তাই এতে সন্নিবেশিত তথ্যের যথেষ্ট বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক স্থান, নদী বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের নাম ও আকৃতি প্রকৃতি বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এসব তথ্য সর্বত্র সন্দেহাতীতভাবে প্রয়োগ করা কঠিন। অধিকন্তু এসব তাম্রশাসনের তথ্য অপ্রতুল সে বিষয়ে সন্দহ নেই। গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের সময় কাল সম্বন্ধে যে আটটি লিপির উল্লেখ করা হয় তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রণিধান যোগ্যঃ

১. জয়রামপুর তাম্র–শাসন লিপি, গোপচন্দ্রের শাসনকাল, প্রথমবর্ষঃ জয়রামপুর তাম্রলিপি উড়িষ্যার (ভারত) বালেশ্বর জেলায় পাওয়া যায়। প্রাপ্তিস্থানের তথ্য অনুসারে এ অঞ্চলকে গোপচন্দ্রের সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনাধীন দণ্ডভুক্তির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।[২৮]

২. মল্লসারুল তাম্র-শাসন লিপি, গোপচন্দ্রের শাসনকাল, তৃতীয় অথবা ৩৩তম বছরঃ মল্লসারুল তাম্র-শাসনটি বর্ধমান জেলায় (ভারত) মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া যায়। গোপচন্দ্রের নৌ অধিপতি বিজয় সেন কর্তৃক এ তাম্র শাসনটি জারি করা হয়। এর প্রাপ্তি স্থল উপরে বর্ণিত গোপচন্দ্রের রাজ্যের পশ্চিম সীমা সম্প্রসারণের বিষয়ে তথ্য প্রদান করে।[২৯] এখানে গোপচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ ও পরমভট্টারক রাজকীয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে এবং এরূপ উপাধিতে তিন জন রাজাকেই তৎকালীন সব লিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. ফরিদপুর তাম্র শাসন লিপি, গোপচন্দ্রের শাসন কাল, অষ্টাদশ বছরঃ ফরিদপুর তাম্র শাসনে বারাক মন্ডল বিষয় = অধিকরনস্য এর উল্লেখ রয়েছে। এখানে জনৈক বৎসপাল স্বামীর ভূমি ক্রয়ের উল্লেখ আছে যিনি পূন্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সেই ভূমি ভট্টগোমিদত্ত স্বামীকে দান করেন বলে লিপিবদ্ধ করা আছে। এখানে রাজার নাম ও ধ্রুবিলাটি নামের একটি বড় গ্রামের উল্লেখ রয়েছে।[৩০] পারজিটারের (Mr. Pergiter) মতে ধ্রুবিলাটি স্থানটি ফরিদপুর শহর থেকে প্রায় ২৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত বর্তমান ধুলট গ্রাম।

৪. ফরিদপুর তাম্র-শাসন লিপি ধর্মদিত্যের শাসন কাল, ৩য় বছর[৩১]ঃ এ ফরিদপুর তাম্র শাসনটি তারিখযুক্ত। এটি কোটালীপাড়া থেকে আবিস্কৃত হয়। বৃত্তাকার সীলে বারাক মণ্ডল বিষয়= অধিকরনস্য এর উল্লেখ রয়েছে। এ ভূমি দান দলিলে ধ্রুবিলাটি গ্রামের ভূমি বাজসনেয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের জনৈক ব্রাহ্মণ চন্দ্র স্বামীকে ভূমি দানের উল্লেখ আছে।

৫. ফরিদপুর তাম্র-শাসন লিপি, ধর্মদিত্যের শাসনকাল, তারিখ বিহীনঃ এ তাম্র-শাসনও একই কোটালীপাড়া পরগনা থেকে প্রাপ্ত। এ দলিলে জনৈক বাসুদেব স্বামী কর্তৃক বাজসেনেয় শ্রেণীর লৌহিত্য গোত্রের এক ব্রাহ্মণ সোম স্বামীকে ভূমি দান প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। এখানে তৎকালীন রাজার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।[৩২]

৬. কুরপালা তাম্র-শাসন লিপি, সমাচার দেবের শাসনকাল, ৭ম বছরঃ কুরপালা তাম্র শাসনটি কোটালীপাড়া ও ঘুঘরা হাটী গ্রামদ্বয়ের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত কুরপালা গ্রামে আবিস্কৃত হয় এ লিপিটির এ পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[৩৩]

৭. ঘুঘরাহাটি তাম্র-শাসন লিপি, সমাচার দেবের শাসনকাল, চতুর্দশ বছরঃ ঘুঘরাহাটি তাম্র-শাসনটি বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এতে গ্রামের বয় জ্যেষ্ঠদের দ্বারা বারাক মন্ডলের অধীনস্থ ব্যাঘ্রচোরক (Vyaghra chorka) এর কিছু ভূমি ব্রাহ্মণ সুপ্রতিক স্বামী (Supratikasvamin) কে দেওয়ার (trasfer) বিষয় উল্লেখ করা আছে।[৩৪]

উল্লিখিত তাম্রশাসনগুলিকে (নং ১ থেকে নং ৭ পর্যন্ত) সাধারণতঃ ফরিদপুর তাম্র-শাসন বলে অভিহিত করা হয়। এসব তাম্র-শাসনগুলির মধ্যে একটি প্রাচীন লিপি পদ্ধতির অভিন্নমিল (Palaeographical affinity), সাধারণ অবস্থানগত বৈশিষ্ট্য (common topographical), প্রশাসনিক বিবরণ (administrative details) এবং সময়ের দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য (synchronisable historical information) অর্থাৎ এ সব তাম্র-শাসনের বিষয়গুলি একটির সাথে অন্যটি অতি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। এগুলি সবই নব্যাবকাশিকা (Navyavakasika) কেন্দ্রের অধীনস্থ বারাক মন্ডলের ভূমি দাস বিষয় সম্পর্কিত। এ অঞ্চলের শাসন কর্তাকে 'উপরিক' বলে এবং কখনও কেবল মহারাজা বলেও উল্লেখ করা হয়। 'উপরিক' নাগদেব এবং জ্যাষ্ঠ কায়স্থ (কর্মচারীর পদবী) এরা উভয়েই গোপচন্দ্রের এবং ধর্মাদিত্যের অধীনে কার্যরত ছিল বলে জানা যায়। এতে করে এ দু'জনের শাসনকালের মধ্যে একটা যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

৮. নালান্দা সীল, সমাচারদেবের শাসন কাল, তারিখ বিহীনঃ নালান্দা সীলে উৎকীর্ণ লিপির পাঠ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি এবং এর বিস্তৃত বিবরণ জানা সম্ভব হয়নি। তবে নালান্দা সীল প্রাপ্তীতে সমাচারদেব যে পূর্ব ভারতের একজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়।[৩৫]

এসব তাম্র-শাসন ছাড়াও সমাচার দেবের দু'টি স্বর্ণমুদ্রা, গুপ্ত সম্রাটদের-চন্দ্রগুপ্ত ২য়, স্কন্ধগুপ্ত ও গৌড়ের শাসক শশাংকের - কয়েকটি মুদ্রা মাদারীপুরের (ফরিদপুর) কোটালীপাড়া ও যশোর জেলায় পাওয়া গেছে।[৩৬] উল্লিখিত তথ্যের উপরে ভিত্তি করে এ ধারণায় উপনিত হওয়া যায় যে গোপচন্দ্র, ধর্মদিত্য ও সমাচারদেব-এ তিনজন রাজা ৬ষ্ঠ শতকে কোটালীপাড়া রাজধানী থেকে দক্ষিণবঙ্গে স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালনা করেন।

এ কথা প্রতীয়মান হয় যে কোটালীপাড়া দুর্গ এ পর্যন্ত জ্ঞাত দুর্গ স্থাপত্যের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে অবস্থিত প্রাচীনতম এবং বাংলার অন্যতম বৃহৎ দুর্গ নিদর্শন।

বাস্তব পর্যবেক্ষণে অনুধাবনযোগ্য যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সুরক্ষিত কোটালীপাড়া নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখণন বিষয়ে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগের কোন কার্যকর ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়নি। কোটালীপাড়া একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক সম্ভবনাময় স্থল একে সংরক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ মালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কোটালীপাড়া দুর্গ নগরীর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সুপারিশমালা পর্যায়ক্রমে মোট তিন ধাপে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম ধাপঃ নীতি নির্ধারণ (Policy level), দ্বিতীয় ধাপঃ পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planing level), তৃতীয় ধাপঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (Implementaion level). সুপারিশমালার অনুসরণে নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে প্রথমে কোটালীপাড়া দুর্গ নগরীর সীমা চিহ্নিত করে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়ে সংরক্ষণের আওতায় আনয়ন কতে হবে। এ জন্য একটি প্রাথমিক প্রকল্পের (Preliminary project) সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। এই এলাকার সীমার মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নস্থল সমূহের পরিচিতি তুলে ধরে ধরাবাহিক তালিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ তালিকাভূক্ত প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, বেষ্টনী প্রাচীর, পুকুর, রাস্তা অন্যান্য প্রত্নস্থল সমূহকে ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্বের ভিত্তিতে সংরক্ষণ (Conservation) পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অগ্রাধিকার প্রদানে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। বর্ণিত প্রত্নস্থল সমূহকে সংরক্ষণের জন্য গ্রহণ করার পূর্বে এগুলির সংরক্ষণের উপযোগীতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে। অন্যথায় এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর অর্থবহ হওয়ার চাইতে ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। সংরক্ষণ করার সময়ে যতদূর সম্ভব প্রাচীনত্ব রক্ষা করতে যত্নবান হতে হবে এবং সেজন্য সংস্কার, নবায়নে রদবদল সম্প্রসারণ ও সংযোজন থেকে বিরত থাকতে হবে। যথার্থ আদি অবস্থা ঠিকভাবে রক্ষা করার বিষয়টি সজাগ ভাগে অনুসৃত হতে হবে। প্রত্নস্থল ও ধ্বংসপ্রায় ইমারত সমূহকে এদের বৈশিষ্ট্য ও ধরণের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে যেমন ঐহিক ও ধর্মীয় স্থাপত্য নিদর্শন ইত্যাদি। তবে কোটালীপাড়া দূর্গের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে দালান কোঠা অপেক্ষা এলাকা ভিত্তিক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই সার্বিকভাবে অপরিহার্য কারণ বহুকাল পূর্বেই এলাকার প্রাচীন ইমারতাদীর ধ্বংসাবশেষ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোটালীপাড়ার ক্ষেত্রে একথা প্রণিধানযোগ্য যে এ প্রত্ন স্থলটি একদা দক্ষিণবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল এমন কি রাজধানীরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। কোটালীপাড়ার ঐতিহ্য সম্বন্ধে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের নিজেদের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এদেশে সংরক্ষণ বিষয়ক সল্প কিছু নীতিমালা থাকলেও সচরাচার তার প্রয়োগ দেখা যায় না। সংরক্ষণের বিষয়ে কয়েকটি নীতি রয়েছে (1) East Bengal Building conservation Act (EBBC) of 1952, (2) The Paurashava Act of 1977 and (3) The Building conservation Regulation of 1984. ইমারত নির্মাণ ও জমি ব্যবহারের বেলায় এ নীতিমালা একে তো অপ্রতুল তার উপর এর প্রয়োগ বাস্তবায়িত করা প্রায় অসম্ভব।

সংরক্ষণ কাজে দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি মাষ্টার প্লান (Master Plan) প্রণয়ন করা অপরিহার্য বলে প্রতীয়মান হয়। এ পরিকল্পনায় পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে কোটালীপাড়ার প্রাচীন প্রত্নস্থল সমূহের সংস্কার কাজে নির্মাণ সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে এবং সহজ ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংরক্ষণের তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে নিয়মানুগ জরিপের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক

পর্যায়ক্রমিক উৎখনন কাজ বাস্তবায়িত করতে হবে। সংরক্ষণের পর যাতে এ প্রত্ন এলাকা পুণরায় ব্যবহারিক উপযোগিতা অর্জন করতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দেশ বিভাগের আগে কোটালীপাড়া দুর্গের চতুপার্শ্বের পারগুলিতে অসংখ্য দালান কোঠা থাকলেও[৩৭] বর্তমানে এই প্রত্নস্থল সনাক্তকরণের জন্য আমাদের মূলত নির্ভর করতে হয় প্রাপ্ত তাম্রশাসনসমূহ, মুদ্রা ও লিখিত বিক্ষিপ্ত তথ্য ও মাঝে মধ্যে প্রাপ্ত প্রত্ন উপকরণের উপরে। কল্পনাপ্রসূত তথ্য বিভ্রান্তি উদ্রেক করে তাই তথ্য উৎসের প্রামনিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া বাঞ্ছণীয়। কোটালীপাড়া দুর্গের অবস্থিতি সম্পর্কিত যে তথ্য সদ্ভাব রয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। বেশ কিছু সংখ্যক বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত তাম্র শাসন নির্ভরশীল তথ্যবাহী বলেই প্রতীয়মান হয়। কোটালীপাড়ায় প্রাপ্ত লিপি সম্ভার অধিকাংশই ভূমি দান সম্পর্কিত তাই এর সন্নিবেশিত তথ্যের একটা বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। প্রাচীন ভৌগোলিক স্থান বা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বর্তমানে লুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এসব তথ্য সন্দেহাতীতভাবে সর্বত্র প্রয়োগ করা নাও যেতে পারে। এসব তাম্র শাসন মুদ্রা ও লিখিত তথ্য কোটালীপাড়া দুর্গ নগরীর ভৌগোলিক পরিচয় পুনর্গঠন করতে যে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে তা অস্বীকার করা যাবে না। উল্লিখিত তথ্যাদি ছাড়া গত আশি বছরেও তেমন কোন নতুন উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আর আবিস্কৃত হয়নি। অধিকন্তু যে বিক্ষিপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে এ দীর্ঘ সময়কালের মধ্যে তা প্রায় সবই অনালোচিত থাকায় কোটালীপাড়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি মোটেও সম্প্রসারিত হতে পারেনি। আলোচ্য প্রবন্ধ এই দীর্ঘ দিন উপেক্ষিত এবং অনালোচিত বিষয়টিকে পুনরায় গবেষকদের আলোচনায় আসতে সহায়তা ও সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি। গবেষণা ক্ষেত্রে এ দৈন্যদশা দূর করার উদ্দেশ্যে।

পরিকল্পিত জরিপ অনুসরণ করে প্রণালী সিদ্ধ খনন কাজ শুরু করা আশু প্রয়োজন যার অন্য কোন বিকল্প নেই।

বিস্তৃত কোটালীপাড়ার অবস্থান নির্ধারণ এবং বাংলা স্থাপত্যে বিশেষ করে বাংলার দুর্গ স্থাপত্যে এর ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার যথার্থতা উপলব্ধি করার প্রয়োজনীতা অস্বীকার করা যাবে না। কোটালীপাড়া দুর্গ বহু পূর্বে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে; আজ কেবল বিদ্যমান রয়েছে তার জীর্ণ কঙ্কাল। বর্তমানে ধ্বংসাবশেষে কেবল দুর্গের অনুচ্চ প্রকারের চিহ্ন দীর্ঘ সময়ের সাথে সংগ্রাম করে টিকে আছে। তাই একদা দক্ষিণ বঙ্গের প্রাণ স্পন্দনে সমৃদ্ধ দুর্গ নগরী কোটালীপাড়া সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারনা স্পষ্টতর করে তোলার জন্য গবেষকদের পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এজন্য প্রত্নতাত্বিক অনুসন্ধানের অনিবার্য প্রয়োজন। এ নিবন্ধে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্য, প্রত্নবস্তু ও সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইতিহাস খ্যাত কোটালপিাড়া দুর্গের পড়ে থাকা জীর্ণ কঙ্কাল সময়ের যাদুঘরে দীর্ঘ কালের ঘুমন্ত রহস্যে পরিণত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। আয়শা বেগম, 'মুগল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ইদ্রাকপুর জলদুর্গ,' *নিবন্ধমালা,* উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ম খণ্ড, ১৯৯৪ পৃ. ১২৮

২। Dr. M. Harunur Rashid, *History of South East Bengal in the light of Recent Archaeological Materials*, Ph. D. thesis, Cambridge University, 1968. P. 249-279.

৩। ম্যাপ ও চিত্র ১, ২, ৩

৪। বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ১৯৯১ইং

৫। Narul Islam Khan, *Bangladesh District Gazetteer* (Faridpur) Dhaka: Govt. Press, 1977 P. 359

৬। L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteer* (Faridpur) Calcutta: Bengal Secretariat Book Dept. 1925, p. 122. 'It has been surmised that the name katalipara means the hamlet (para) on the ramparts (ali) of the fort (kot)."

৭। *Ibid*, P. 122

৮। Nurul Islam Khan, *op. cit.* p. 359

প্রাচীন কোন নামের পরিবর্তন হতে পারে স্বাভাবিক নিয়মে। তা লোকমুখে প্রচলিত হয় এবং ম্যাপ ও দলিলপত্রেও এ নাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন সে নাম গ্রহণ করা হয় এবং তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু এখানে ঐ গেজেটিয়রেই কেবল কোতওয়ালীপাড়া (Kotwalipara) লেখা হয়েছে।

৯। O' Malley, *op. cit.* p. 123

১০। N. K. Bhattasali cf. O'Malley, *op cit.* P. 123

১১। মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-পরিচালক, *চলতি প্রতিবেদন,* প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ, ১৯৯১-৯২, পৃ. ১-৪

১২। কোটালীপাড়া দুর্গের সম্প্রতি গৃহীত চিত্র ১, ৩, (সৌজন্যেঃ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ)। মৌজা জিও কোডম্যাপ কোটালীপাড়া থানা দ্রষ্টব্য।

১৩। উনসিয়া গ্রামে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পিতৃপুরুষের ভিটা অবস্থিত। এর পাশ্ববর্তী গ্রামে একটি পুকুরে প্রাচীন ইটের সন্ধান পাওয়া গেলে স্থানীয় কলেজের জনৈক শিক্ষক তার বসবাসের জন্য ঐ ইট দিয়ে একটি দালান তৈরি করেন। দ্রষ্টব্যঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২

১৪। আ.কা. মোঃ যাকারীয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ,* ঢাকা শিল্পকলা একাডেমী ১৯৮৪, পৃ. ৩৯৬

১৫। চিত্র ১, ২ ও ৩

১৬। মোঃ মোশারফ হোসেন, *প্রাগুক্ত* পৃঃ ৩

১৭। Ayesha Begum, 'Forts in Medieval Bengal: An Archilectural Study' Ph. D. Thesis IBS 1992. P. 96-97

১৮। Aysha Begum, *op. cit.* p. 101

১৯। cf. O' Malley, *op. cit.* p. 125

২০। R. C. Majumder, *History of Bengal.* Vol. 1, Dacca: University of Dacca, 1963, p, 6

২১। F. E. Pergiter cf O'Malley *op cit* p. 125

২২। N. K. Bhattasali, *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, Dacca, 1929, p. 2

২৩। *Ibid*, p. 2

২৪। R. C. Majumder, *op, cit.* 56
M. Harunur Rashid *op. cit*, p. 249 f f

২৫। M. Harunur Rashid, 'Pala Rule in south East Bengal,' Jvrm vol.- 3 Rajshahi 1974, p.p. 27-47
Majumder *op. cit.* pp. 55-56, 141
দ্রষ্টব্যঃ Rashid কালাচুরি রাজা বলতে সাধারণত কাক্কালাদেব দ্বিতীয়কে ধরা হয়ে থাকে। ইনি ছিলেন গংগারয়দবের পিতা। প্রথম মহীপালের শাসনের শেষ দিকে সে (মহীপাল) শক্তিশালী কালাচুরী শাসক গংগায়াদেবের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কালাচুরী দলিল তাদের শাসকদের বিজয় দাবী করে থাকে। উপরিউক্ত তথ্যসূত্র সহজেই এরূপ সম্ভাবনা ব্যক্ত করে যে গৌড়ীয় রাজ নৃপতিদের বিপক্ষীয়রা পূর্ব থেকেই তাদের শাসন পরিচালনা করছিলেন।

২৬। Rashid, *op. cit.* pala Rale ... p. 30

২৭। ক) নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, *কৃষ্ণনাথ সার্বভৌম ও তাঁহার আনন্দ লতিকা,* পি. এইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪, পৃ. ৫১
পুষ্করনাধিপতি চন্দ্রবর্মনের রাজ্য কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা সঠিক বলা যায় না। তবে তার রাজ্য সুদূর দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চন্দ্র ও 'চন্দ্রবর্মন' সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়।
খ) অমিয় বসু (সম্পাদিত) *বাংলায় ভ্রমণ,* ১ম খণ্ড, কলিকাতাঃ পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে বিভাগ, ১৯৪০ পৃ. ২৩৮
বাঁকুড়া জেলার সুসুনিয়া পর্বতগারে উৎকীর্ণ পুষ্করনাধিপতি সিংহ বর্মন ও তাঁর পুত্র চন্দ্র বর্মনের নাম উল্লেখ আছে। মুসুনিয়ার পঁচিশ মাইল উত্তরপূর্বে দামোদর নদীর দক্ষিণপাড়ে পোখনা নামে একটি গ্রাম আছে। যেখানে প্রাচীন কালের ভাস্কর্য নিদর্শন ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকের মতে খুব সম্ভব এস্থানই চন্দ্র বর্মনের রাজধানী পুরস্করণার ধ্বংসাবশেষ।
সমাচারদেবের তাম্র শাসনে উল্লিখিত চন্দ্র বর্মন এবং সুসুনিয়া পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ চন্দ্রবর্মন যদি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হন তাহলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে বাঁকুড়া হতে ফরিদপুর পর্যন্ত চন্দ্রবর্মনের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে নয়জন নৃপতিকে পরাজিত করে আর্যাবর্তে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেন তাদের মধ্যে একজন রাজার নাম চন্দ্রবর্মা। সম্ভবত ইনি পুষ্করণাধিপতি চন্দ্র বর্মন এবং তাঁকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করে নেন। এ মন্তব্য গ্রহণ করতে হলে যথেষ্ট প্রমাণের প্রয়োজন আছে। প্রাচীন স্থানগুলোর সটিক জরীপ ও নিয়মানুগ খনন করে আরো তথ্যভিত্তিক গবেষণায় স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব অন্যথায় নয়।

২৮। S. N. Rajaguru, *Orissa Historical Journal Vol XI.* 1963 No. 4 p. 206 f f

২৯। N. G. Majumder, *Epigraphica Indica XXII*, pp 155. 161

৩০। F. E. Pergiter, *Ind. Art. XXXIX*, 1910 pp 204 f f According to pergiter the dates of the three plates of Dharmaditya, and Gopachandra are propady 531, 567 and 586. cf. O'malley. op. cit. p. 18

৩১। Pergiter *op. cit*, Ind. Art. p. 195 ff

৩২। *Ibid*. p. 200 ff

৩৩। R. D. Banarjce, *JASB*, NS, Vi. 1910. pp. 429 ff Binoychandra Sen, *Some Historical Aspects of the inscription of Bengal*, Calcutta: Calcutta University, 1942, p. x vi, Introduction.

৩৪। Banarjee, *op. cit.* p. 429 ff Pergiter, *JASB* NS, Vii, p. 479 ff Bhattasali, *Dacca Review O'Sammilan*, X 1920, pp. 39-57

৩৫। *Archaeological Survey of India*, Memo no. 66, p. 31

৩৬। O'Malley, *op. cit.* p. 18

৩৭। যাকারীয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৫

চিত্র–১। কোটালীপাড়া দুর্গঃ দক্ষিণপূর্ব কোণে কিছু অংশের সাধারণ দৃশ্য ১৯৯১ সনে ধারণকৃত চিত্র। সৌজন্যেঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ)

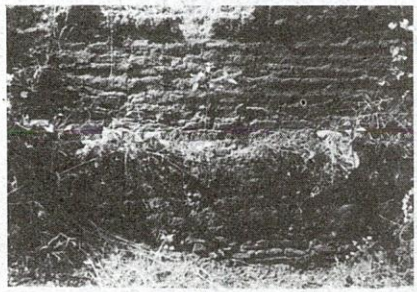

চিত্র–২। কোটালীপাড়া দুর্গের ধ্বংসপ্রাপ্ত বেষ্টনী প্রাচীরের চিহ্ন ১৯৯২ সনে প্রবন্ধকার কর্তৃক ধারণকৃত চিত্র।

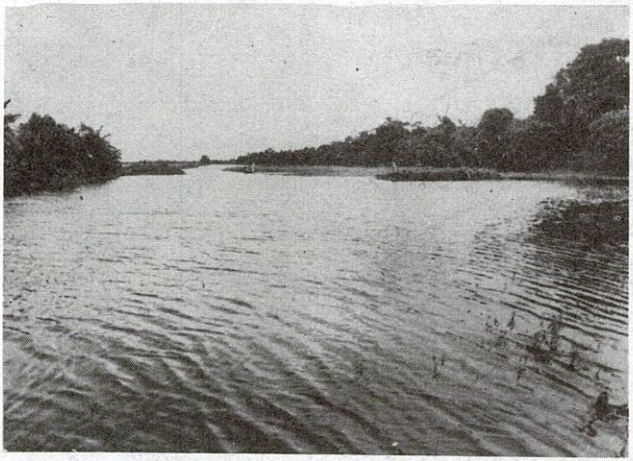

চিত্র–৩। কোটালীদূর্গঃ পূর্ব অংশের বাইরের দৃশ্য (সৌজন্যে–প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ)

৩। কোটালীপাড়া দুর্গ: দক্ষিণবঙ্গের প্রাচীনতম দুর্গ নির্মাণ

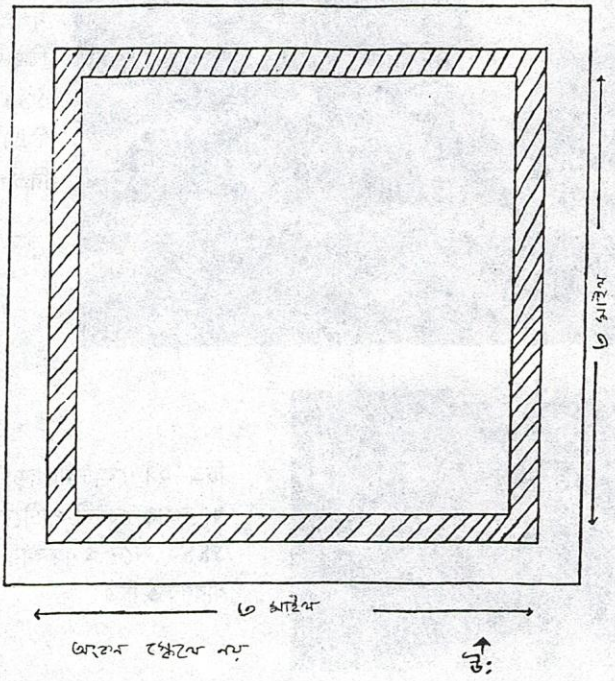

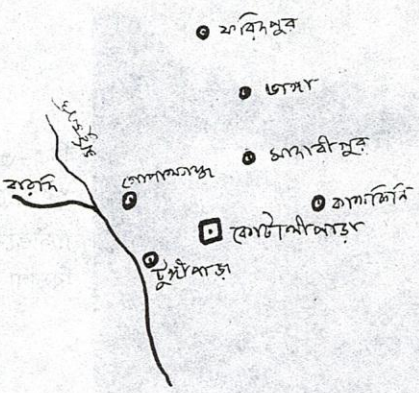

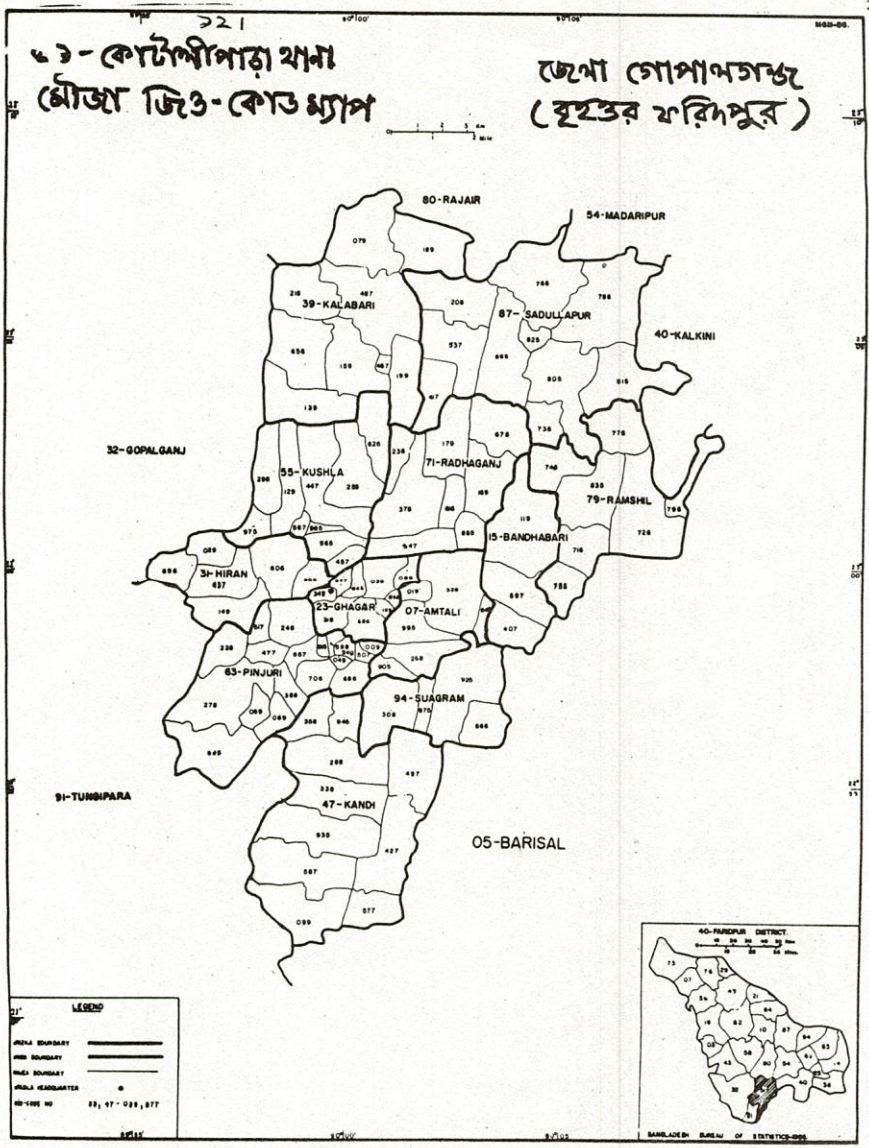
৯১-কোটালীপাড়া থানা
মৌজা ভিত্তি-কোড ম্যাপ
জেলা গোপালগঞ্জ
(বৃহত্তর ফরিদপুর)
80-RAJAIR
54-MADARIPUR
39-KALABARI
87-SADULLAPUR
40-KALKINI
32-GOPALGANJ
55-KUSHLA
71-RADHAGANJ
79-RAMSHIL
15-BANDHABARI
31-HIRAN
23-GHAGAR
07-AMTALI
63-PINJURI
94-SUAGRAM
91-TUNGIPARA
47-KANDI
05-BARISAL
LEGEND
40-FARIDPUR DISTRICT
BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS-DOS

বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চায় শিল্পী এস. এম. সুলতান এর অবদান

আবু তাহের বাবু

ভূমিকা

"শেখ মোহাম্মদ সুলতান বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পী"।[১] এটাই হলো তাঁর সম্পর্কে অনেকের ঈর্ষার কারণ। মীজানুর রহমান লিখেছেন –"ঈর্ষার জন্ম তখনই হয় যখন কাউকে কোন বিষয়ে নিজের চেয়ে বড় মনে হয়, কিংবা নিদেন সমান্তরাল। এই ঈর্ষাটা ভালো একাধারে গতি ও প্রগতির লক্ষণ–কিন্তু এই ঈর্ষার সংগে বুঝতে হলে প্রয়োজন যে নির্দোষ মেধাশক্তির, তার ঘাটতি হলে প্রগতি হটে যায়, স্থান করে নেয় প্রতিক্রিয়াশীল ঈর্ষা। তখন সেটা নিছক বারোয়ারী পরশ্রীকাতরতা। এই নির্দোষ ঈর্ষা এবং নিছক পরশ্রীকাতরতার বলি চিত্রকর এস.এম. সুলতান"।[২] অনেকেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার কথা তুলে তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্যের ভান দেখান। তবে শিল্পী সুলতানের শিল্প রচনার সামনে তাঁরা নিশ্চুপ। "তাঁর ছবির অভিব্যক্তি সোজাসুজি দর্শকের মনকে নন্দিত করে তোলে"।[৩] অর্থাৎ এতে রয়েছে শিল্পীর সৃজনশীল বিশুদ্ধতা, সরলতা এবং নিরপেক্ষতা। চিত্রচর্চায় যেমন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন নিজের দেশকে বিষয় করেছিলেন, যাতে ছিল এদেশের গ্রামীণ কর্মজীবি মানুষ। তেমনি শিল্পী এস. এম. সুলতানও তাঁর চিত্রকলায় আমাদের কৃষিভিত্তিক সমাজের মেরুদণ্ড গ্রামীণ কৃষক এবং তাদের জীবনকে একটি আদর্শে দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দেশকে ভালবেসেছেন, ভালবেসেছেন দেশের মানুষকে, যে মানুষ সত্যিকারের মানুষ সেই কৃষক সম্প্রদায়কে। এই চিরন্তন সত্যকে তিনি তাঁর চিত্রকলায় বিষয় করেছেন, দিয়েছেন শ্বাশ্বত রূপ। এ প্রসংগে আহমদ ছফা লিখেছেন– "সুলতানের কৃষকেরা জীবনের সাধনায় নিমগ্ন। তারা মাটিকে চাষ করে ফসল ফলায় না। পেশীর শক্তি দিয়ে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে প্রকৃতিকে ফুল–ফসলে সুন্দরী সন্তানবতী হতে বাধ্য করে। এইখানে জীবনের সংগ্রাম এবং সাধনা, আকাঙ্খা এবং স্বপ্ন, আজ এবং আগামীকাল একটি বিন্দুতে এসে মিশে গিয়েছে। . . . আগামীতে যাঁদের সাধনায় সংগ্রামে বাঙলার ইতিহাস পাবে গতি, পাবে প্রাণ, সেই অনাহারক্লিষ্ট, রোগগ্রস্থ, ন্যজদেহ কিষাণ–কিষাণীক আঁকলেন বীর করে রেনেসাঁস পেইন্টারের যেমন তাদের আঁকা চিত্রে, গড়া ভাস্কর্যে মানুষ– মানুষীকে সৌন্দর্য এবং অজেয়তার প্রতীক করে নির্মাণ করেছেন, সুলতান সেই সৌন্দর্য, সেই অজেয়তা চারিয়ে দিয়েছেন বাঙলার কিষাণ–কিষাণীর শরীরে। একটি সমাজের মানুষকে তার তুলি বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে"।[৪]

প্রচণ্ড মানসিক শক্তি আর সৃষ্টির বেগময়তা নিয়ে পৃথিবীতে কিছু প্রাণের জন্ম ঘটে, যাঁরা অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে নিজেকে টিকিয়ে রাখে, এবং সবাইকে জানিয়ে দেন তাদের আবেগের উত্তাপ। এরকমই শিল্পী সুলতান আটপৌড়ে জীবনে জন্মেছিলেন, তাঁর ছিল

না কোন পারিবারিক বন্ধন, ছিল না পিছুটান। সারা জীবন তিনি শুধু ছুটে চলেছেন এক দূর্বার আকর্ষণে, সৌন্দর্যের টানে, সৃষ্টির নেশায়। এই ছুটে চলার পথে তাঁর সৃষ্টির আবেগ যন্ত্রণা এসেছে, দিয়েছেন কিছু শৈল্পিক রূপ, চেতনার জন্ম, তাতে রূপ পেয়েছে প্রকৃতি ও মানুষ, যে মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ মাটি থেকে উত্থিত হয়েছে।

শিল্পী এস. এম. সুলতানের চিত্রকর্ম

শিল্পী সুলতানের প্রথম জীবনে ছুটে চলার পথে আঁকা সবগুলো ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে। সেইসব ছবির সংগ্রহ কাদের কাছে আছে তার আর কোন হদিস পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গোরা সৈন্যদের ছবি এঁকেছেন, তারপর যুদ্ধ শেষে কিছুকাল কাশ্মীরের গ্রাম্য জনগণের সাথে অবস্থান করেছেন। সেই সময় কাশ্মীরী প্রকৃতি ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে বেশ কিছু ছবি এঁকেছেন। এই ছবিগুলোর মধ্যে তখন তাঁর ইম্প্রেশনিজমের ধারা লক্ষ্য করা যায়। এই ইম্প্রেশনিষ্ট অংকন শৈলী হলো রং এর সাথে রং মিশিয়ে ছবিতে আলোছায়ার প্রভাব দেখানো যাতে বর্হিরেখা আলোছায়ার সাথে মিশে গিয়ে ছবিতে ডাইমেনশনের গভীরতা আনে। শিল্পী সুলতানের কাশ্মীরে জীবনযাত্রার উপর ছবিগুলো বেশীর ভাগ ছিল জলরংয়ে আঁকা এবং সেই সময়কার মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ "জলরং তাঁর কাছে যুৎসই মাধ্যম বলে বিবেচিত হয়েছে; আশ্চার্য কুশলতায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর হৃদয়াবেগ প্রকৃতির প্রতি তাঁর শিশুসুলভ কৌতুহল, তাঁর রোমান্টিক অভিজ্ঞতা আর তাঁর ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে"।[৫] ইংল্যাণ্ডের ইম্প্রেশনিষ্ট শিল্পী টার্নারের আঁকা জলরং চিত্রের যে ধারা তা হলো খুব দ্রুততার সাথে ছবি আঁকা শেষ করতে হয়, শিল্পী সুলতানও সেইরূপ দ্রুততার সাথে জলরং দিয়ে ছবি এঁকেছেন, এবং তিনি ছবিগুলো এঁকেছেন বড় বড় কাগজের সিটে। শিল্পী সুলতান কাশ্মীরের বিষয়বস্তুর উপর যে সব জলরংয়ে ছবি এঁকেছেন তাতে ছিল ছান্দিক বিরতিহীন গতি, পরবর্তীতে তাঁর বাংলার কৃষকভিত্তিক ছবির বর্ণনাভিত্তিক বা ন্যারেটিভ কম্পোজিশনেও তা এসেছে। এই জলরংয়ে আঁকা কাশ্মিরী বিষয়বস্তুর ছবিতে তিনি কখনও কখনও সূক্ষ্মভাবে গাছের গুড়ি, লতাপাতা ও ফুল প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এঁকেছেন। পরবর্তীকালে তিনি জলরংয়ে আঁকা ছবিতে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন এনেছেন, তখন এঁকেছেন গ্রামবাংলার নৈসর্গ চিত্র। তাতে রয়েছে পল্লী বাংলার শান্ত মনোরম পরিবেশ বিশাল আকাশ, মিলিয়ে যাওয়া দিগন্ত, তালগাছ, নৌকা, জেলে, কুঁড়েঘর, মেঠোপথে গরুগাড়ী ইত্যাদি। এইসব কাশ্মীরের ও বাংলার গ্রামীণ বিষয় নিয়েই তিনি পাকিস্তানের লাহোর ও করাচীতে একক চিত্র প্রদর্শনী করেছিলেন। জলরং ছাড়াও প্রদর্শনীতে তিনি কিছু ছবি তেলরং মাধ্যমে, আবার কখনও চারকোল, প্যাস্টেল ও কালিকলম ব্যবহারেও এঁকেছেন। সেইসময় তিনি তেলরং মাধ্যমে আঁকা নৈসর্গ চিত্রে স্প্যাচুলা বা 'পেইন্টিং নাইফ' ব্যবহার করেছেন। যাতে আছে পুরু রংয়ের আস্তর, টোনের বিভিন্নতা।[৬] এই সময়কার ছবিগুলি সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী নয়। কিছুটা ফর্ম ভেঙ্গে, একটু বিমূর্ত বা আধা বিমূর্ত ধারায়। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিজ দেশে ফিরে এইরূপ ধারায় আর ছবি

আঁকেননি। তাঁর মতে, দেশের মানুষ যা বুঝতে পারবে এবং প্রশংসা করতে পারবে সেইরূপ আঁকতে শুরু করেন। এইসময় তাঁর নৈসর্গ চিত্রে আসে ফসলের জমি ও কৃষক জীবন, এখানে মানুষ প্রধান বিষয় হয়ে এসেছে। এসব ছবিতে তিনি বাংলার কৃষকদের দুঃখ দারিদ্রতাকে তুলে ধরতে চাননি, এঁদের স্বাস্থ্যকে রুগ্ন বা এঁদের হালের বলদগুলিকেও রুগ্ন দেখাতে চাননি। আমাদের জীবনের আনন্দ আছে, বেদনারও সুখ আছে। কৃষক হাল চাষ করে ফসল ফলায়, খাদ্য উৎপন্ন করে, আমাদের অন্ন যুগিয়ে দেয়। তাই তিনি যখন তাঁদের জীবনকে উপজিব্য করেই শিল্পচর্চা করছেন তখন তাঁদের জীবনকে অভাবগ্রস্থ না দেখে সুখী জীবনরূপে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, ছবিতে তাঁদের বিশাল পেশীবহুল দেখিয়েছেন, বাহুতে শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তি শিল্পী সুলতানের নিজেরই শক্তি, যে শক্তিতে তিনি পরাধীনতার শেকল ভাংতে চেয়েছেন, যে শক্তিতে তিনি প্রগতির প্রতিবন্ধকতা, সামাজিক অবক্ষয় ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। শিল্পী জয়নুল এর আঁকা ছবির বলদ এর মাঝে যে শক্তির প্রকাশ পাওয়া যায়, যাতে রয়েছে সামাজিক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করার প্রয়াস তাই এখানে অন্যরূপে উপস্থিত।

প্রকৃতপক্ষেও বাংলার কৃষক সম্প্রদায় বাহুর শক্তিতে লাঙ্গল দিয়ে মাটির সাথে যুদ্ধ করে ফসল ফলায়, তাই তাঁদের পেশীগুলো বলিষ্ঠ, দেহ সবল ও সতেজ, তাঁদের মধ্যে এখনও আদিম কৃষিকার্য ও জীবনযাত্রা লক্ষ করা যায়। তাই শিল্পী সুলতান তাঁদের সেইরূপভাবে ছবিতে প্রকাশ করেছেন। তিনি ড্রইংয়ে রেখেছেন আদি বংশধরদের আদিম চরিত্রটা। বাঙ্গালির মৌলিকত্বকে ধরে রাখার এক অনন্য প্রয়াস তার কাজে পরিলক্ষিত। এছাড়াও তাদের বলিষ্ঠ মাংশপেশী সম্বলিত স্বাস্থ্যবান ফিগার ছবিতে এনেছেন এইজন্য যে, তাঁরা শুধু মাটির সাথেই যুদ্ধ করেন না, সেই মাটির অধিকার রক্ষা করার জন্যও যুদ্ধ করেন। এইভাবে তাঁরা কালে কালে যুদ্ধ করে এসেছেন, সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে, বিদেশী শাষণ ও শোষণের বিরুদ্ধে। ছবিতে কৃষকের পেশী নিঃসন্দেহে 'শক্তির প্রতীক' যে শক্তিতে আগামীতেও তাঁরা তাঁদের শ্রমের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবে, রক্ষা করবে নিজেদের অস্তিত্বকে।

ইয়োরোপের গথিক ও রনেসঁস যুগের চিত্রকলায় অনেক শিল্পী তাঁদের আঁকা ছবিতে যিশু খ্রীষ্টকে অতিমানব হিসাবে সাধারণ মানুষদের চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। এসব ছবিতে যীশুর মহত্বকে এবং ব্যক্তিত্বকে বুঝাবার জন্য এইরূপ দেহটি বিরাট আকৃতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তেমনি পরবর্তীতে শিল্পী পিকাসো তাঁর আঁকা 'লে দমোয়াজেল দাভিঙ্গনোঁ' (১৯০৬–৭) ছবিতে সমাজের সাধারণ অবহেলিত মানুষকে অতিমানবিক সত্ত্বায় বিরাট আকারে প্রকাশ করেছেন। এই মানবিকতারই প্রকাশ শিল্পী সুলতানের কৃষকদের ছবিতে দেখিয়েছেন তাঁদের বৃহৎ আকারে উপস্থাপন করে। তিনি কৃষকদের শরীরে যে পেশীবহুল স্বাস্থ্য দেখিয়েছেন তা বাস্তবেও বাংলার কৃষকদের দেহে ঐরূপ গোলাকৃতি পেশী আকৃতি দেখতে পাওয়া

যায়। কারণ তারা খুবই পরিশ্রমী এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তাই তাঁদের পেশীগুলোর আকৃতি সেইরূপ আকার ধারণ করে। তবে শিল্পী সুলতান পেশীর প্রকাশ অঙ্কনে একটু অতিরঞ্জিত বা বেশী মাত্রায় দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে ড্রইং পুরোপুরি বাস্তবধর্মী না হয়ে তাঁর আদর্শগত রূপের সাথে সংগতি রেখে পরাবাস্তবতার ভাব এনেছে।

সুলতানের আদর্শের যে কৃষক তা বিশেষ কোন দেশের বা কালের প্রতিনিধিত্ব করেনা। যদিও তাঁর ছবিতে বাঙালী কৃষককুলের চিরন্তন রূপ বা ভাবমূর্তি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে করে ছবিতে দেশীয় বৈশিষ্ট্য এসেছে। তবে কৃষকের মৌলিকত্ব হচ্ছে তিনি যেখানকার এবং যে দেশেরই কৃষক হোন না কেন তাঁর সত্ত্বার চেহারা এক। তাই তিনি যখন তাঁর 'প্রথম বৃক্ষরোপণ' ছবিটি আঁকেন সেখানে আদি পিতা আদমকে একজন বাঙ্গালী কৃষক হিসাবেই দেখিয়েছেন। শাস্ত্রে আদমকে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি ছিলেন খুব উঁচু-লম্বা, পেশীবহুল 'বাল্কি' শরীর, পেশীগুলো মাটির মতো, অর্থাৎ মাটি দিয়ে তৈরী আদম। তিনি সেইরূপ আদি পিতা আদমকে বিরাট শরীর, বিরাট দাঁড়িমুখের প্রতিকৃতিসহ পৃথিবীতে প্রথম বৃক্ষরোপণ করতে দেখিয়েছেন, পাশে আদিম খন্তটা রয়েছে।

অন্যান্য কৃষকদের ছবিগুলোতে তিনি কৃষকদের এই আদমের সন্তান হিসাবে এরকমই পেশীবহুল করে এঁকেছেন। বৃক্ষরোপন ছবির পশ্চাৎপটে অর্থাৎ ছবির উপরের অংশে, আদমের মাথার পেছনে দুইজন দেবদূত বা 'পরী'কে গাছে পানি দেবার জন্য স্বর্গ থেকে পানি আনতে দেখানো হয়েছে। এটা গথিক যুগের শিল্পী জওত্তোর 'দি ল্যামেনটেশন' (১৩০৫) ফ্রেসকো ছবিটির পশ্চাৎপটে যেরূপ যীশুর মৃত্যুতে স্বর্গের দেবদুতরা বা পরীদের শোকার্ত দেখানো হয়েছে, সেইরূপ শিল্পী সুলতানের এই ছবির পশ্চাৎপটে উপস্থাপনাও ঐরূপ সম্পর্ক বা ভাব লক্ষ্য করা যায়, যা ছবির এই অংশে গৌরানিকত্বের সরাসরি ভাব প্রকাশ করে এবং আধুনিক কিছুটা খর্ব করে।

ইয়োরোপের অনেক শিল্পী 'এ্যাগজাইল ফ্রম হ্যাভেন' ছবিতে এঁকেছেন আদম ও ইভকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে, তাঁদের অপরাধের জন্য। আর শিল্পী সুলতান আদমকে পৃথিবীতে প্রথম চারা রোপণ করতে দেখিয়েছেন। এখানে চারা রোপণ হচ্ছে আদম জাতিকে আশ্রয় দেওয়া। এই গাছ থেকেই আদম সন্তানেরা জীবনে বেঁচে থাকার সবকিছু পাবে। যা 'জীবনবৃক্ষ' প্রতীক হিসাবেও অনেক শিল্পেই দেখা যায়। শিল্পী সুলতান এই বৃক্ষকুলকেই রক্ষা করার কথা বারবার বলেছেন। গাছপালা যেন দুষিত আবহাওয়ায় মরে না যায়, অকারণে যেন কাটা না হয় এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগান হয়। তাই দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তিনি জনগণকে শৈল্পিক চেতনাবোধ আনার কথা বলেছেন, গাছের গুরুত্বের কথা বলেছেন।

শিল্পী সুলতানের আঁকা ছবিতে কৃষকই প্রধান মানুষ, তাই মাটি হচ্ছে তাঁদের। এই মাটির অধিকারও তাঁদের। যে সরকার আসুক আর যে শ্রেণীই তাঁদের কতৃত্ব করুক, কিন্তু তাঁদের জমির দখল তাঁরা দিবেনা, যা বারবার তাঁর 'চর দখল' ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কৃষকরা এক অংশও জমির চর আরেকজনকে দিতে চায় না। তাঁর ফসলের জমি রক্ষা করার জন্য সে রুখে দাঁড়ায় রুদ্র মূর্তিতে। বাংলার কৃষকদের মধ্যে এই স্বভাবটা অনেক প্রাচীন, বরাবরই তা চলে আসছে। অন্য কাউকে এদেশে তাঁরা কর্তৃত্ব করতে দিতে চায় না। তাই যুগে যুগে বহু জাতি এদেশে এসেছে, করেছে তাদের শাসন, শোষণ, কিন্তু বাংলার কৃষক কখনই তাঁদের মাটির সত্ত্বার অধিকার ছেড়ে দেয়নি। বারবার বিদ্রোহ করেছে, যুদ্ধ করেছে এবং ধরে রেখেছে তাঁদের অধিকার। এই জমিরই অধিকার আর শ্রমের ন্যায্য পাওনা বুঝে নেবার জন্য ১৯৭১ সালে তাঁরা পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছে, যুদ্ধ করেছে, অর্জন করেছে তাঁদের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রথম গ্রামের কৃষকরাই তাঁদের লাঠি বল্লম, তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সম্মুখে রুখে দাঁড়িয়েছে।

কৃষক জীবন নিয়ে অনেক শিল্পীই ছবি এঁকেছেন, যেমন গথিক যুগে 'দ্যা লিমবার্গ ব্রাদার্স' এর ১৯১৩ থেকে ১৬ সালের মধ্যে আঁকা 'লে ত্রে রিশ জ্যর দ্য দ্যুক দ্য বেরি' (ডিউক অব বেরিক সমৃদ্ধ সময়) দিনপঞ্জীর ছবিতে সামনের অংশে কৃষক দম্পতি এবং কৃষি কার্যটাকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। ছবির পেছনের অংশে বিশাল অট্টালিকাসহ সেখানে সমাজের কিছু ধনি মানুষদের দেখানো হয়েছে। এতে যেমন সমাজের মানুষদের শ্রেণীবিভাজন দেখানো হয়েছে এবং ছবির একেবারে উপরের অংশে সৌরজগতে ভাগ্যচক্র এঁকে তাতে শেষ বিচারের মানদণ্ড ও বিচারকের সূর্য হাতে পালকীতে চড়ে আসতে দেখানো হয়েছে। এছাড়া রনেসঁস যুগের শিল্পী মিলে'র ১৮৫০ সালের আঁকা 'দ্য সোয়ার' ছবিতে একজন কৃষককে শস্য রোপন এর জন্য বীজ ছিটাতে দেখানো হয়েছে। শিল্পী সুলতান তাঁর চিত্রে কৃষকদের দেখিয়েছেন সবাই কর্মরত, কাজ ছাড়া তাঁরা কিছু বোঝেন না। মেয়েরাও এখানে কাজে ব্যস্ত। সমবায়ের ভিত্তিতে মাটিতে তাঁরা কাজ করেন। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় সব সময় মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করেন। তবে ছবিতে তিনি নারী-পুরুষের শ্রম বিভাগও দেখিয়েছেন, আর বিভিন্ন ঋতুর প্রভেদসহ ঋতুর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর আঁকা 'নবান্ন' ছবিটিতে দেখা যায় কৃষক মেয়েরা এখানে স্বাস্থ্যবতী, জমির উর্বরতার মতোই। তাঁরা কর্মব্যস্ত, ধান ভানছেন, ধান ঝাড়ছেন, দৈনন্দিন কাজ করছেন। অন্যান্য ছবিতে মেয়েদের পুকুর ঘাটে পানি আনতে যাওয়া থেকে মাছকুটা, গাই দোয়ানো সব কিছুই তাঁর ছবির বিষয় হয়েছে। শিল্পী সুলতানের মতে, এইসব ছবি বারবার আঁকলেও তাঁর মনের তৃপ্তি মিটেনা, আবার আঁকতে ইচ্ছে করে।

তাঁর কৃষকদের ছবিতে মানুষের গায়ের রংয়ে, মাটির রং আর ছনের ঘরের রং এর সাথে মিলিয়ে হলুদ ও খয়েরী রং এর প্রাধান্য এসেছে। আর প্রকৃতিতে এসেছে নীল আকাশ, ফসলের জমি, গাছপালায় সবুজ, হলুদের প্রাধান্যসহ অন্যান্য রং এর ব্যবহার। তাঁর উল্লেখযোগ্য অনেক চিত্রে লোকশিল্পের লক্ষ্মীসরা ও পটচিত্রের যেরূপ উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেরূপ উপকরণ ও 'আর্থ কালার' এর ব্যবহার আছে। যেমন তিনি গাবের আঠার সাথে জিংক অকসাইড মিশিয়ে ক্যানভাসের উপর প্রথম ছবি আঁকার জন্য আস্তর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সিরিস গাম ব্যবহার করেননি, কেননা বর্ষাকালে ক্যানভাস ঢিলে হয়ে পড়ে। গাবের আঠা জেলেরাও জালে ব্যবহার করে, ফলে সুতা পচে না। অনেক ছবির ক্যানভাস তিনি ব্যবহার করেছেন দেশীয় চটের কারপেট, এবং ছবিতে রং ব্যবহার করেছেন দেশজ সহজলভ্য রং যেমন–জিংক অকসাইড, পিউরি, রেড অকসাইড, গ্রীন অকসাইড, নীল প্রভৃতি। তিসির তেল এবং একটু কোপেল বার্ণিশ এইসব অকসাইড রং এর সাথে মিশিয়ে ভাল করে চটকিয়ে নিয়ে ছবিতে ব্যবহার করেছেন, যাতে 'স্টিকি' ভাবটা না থাকে। এইসব আর্থকারার গ্রামীণ লোকশিল্পীরাও তাঁদের ছবিতে ব্যবহার করে। তাই শিল্পী সুলতানের ছবিতে দেশীয় রং ও উপকরণ এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশী মাত্রায় দেখা যায়। তিনি নিজেও এই সহজলভ্য রং ছবিতে ব্যবহার করেছেন আর গ্রামের ছেলে–মেয়েরাও যেন তাদের চিত্রচর্চার প্রবণতাকে বাড়াতে সহজলভ্য ও সস্তা উপাদান পেতে পারে সেইরূপ চেষ্টা করেছেন। প্রাথমিক শিল্প শিক্ষার শুরুতে গ্রামের ছেলে–মেয়েরা এগুলো ব্যবহার করছে, তবে বড় শিল্পী হতে পারলে আরো ভালো রং ব্যবহার করবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, আমাদের নিজেদের দেশে ছবি আঁকার রং প্রস্তুত করতে হবে। কেননা, এখানো আমাদের দেশে ছবি আঁকার জন্য ভালো রং তৈরী হয়নি, হয়েছে শুধু বাড়ী ঘর রং করার ও সাইনবোর্ড লেখার রং তৈরী।

শিল্পী সুলতানের ছবিতে আঙ্গিকগত দিক লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাতে আছে কাহিনী ভিত্তিক উপস্থাপন বা 'ন্যারেটিভ কম্পোজিশন'। আর আছে রৈখিক চরিত্র ও ছান্দনিকতা, সবকিছু মিলিয়ে দেশীয় বৈশিষ্ট্য ভরপুর। ছবিতে কৃষককে তিনি আদিম অনুভূতি নিয়ে আঁকেন। আধুনিক চাষাবাদ আঁকেননা, যেভাবে আদিম অবস্থা থেকে চাষাবাদ চলে আসছে, ঠিক সেইভাবে। এতে যেমন তিনি আমাদের নৃ–তাত্ত্বিক পরিচয় ছবিতে রাখতে চেয়েছেন তেমনি আগামীতে চাষাবাদের পদ্ধতি পাল্টিয়ে যাবে। চাষাবাদে ট্রাকটর বেশী ব্যবহার হবে, তখন এই পুরানো চাষের পদ্ধতি থাকবে না। তাই এইসব ইতিহাস এবং স্মৃতিকে তিনি ছবিতে ধরে রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, আমাদের কৃষকরা আগের দিনে যেরূপ খেয়ে–দেয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলেন, কিন্তু আজকের কৃষকদের মধ্যে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। সেই শরীর আর তাঁদের নেই এবং তাঁদের মনের অবস্থা এমনভাবে হারিয়ে ফেলেছেন যে, তাঁদের মুখে হাসি নেই, গান নেই। নিরানন্দ তাঁদের চেহারা, দেখলে মনে হয় কত ব্যথা বেদনা তাঁরা বহন করছেন–কি অভিমান–কি অভিব্যক্তি যার কোন

প্রকাশ নেই। তাঁরা যেন মৌন থেকে সবকিছু সহ্য করে চলেছেন। তাঁদের ভাওয়াইয়া, জারীগান ছিল, এখন তা আর তাঁদের মুখে নেই। এখন সেসব গান ফলাও করে রেডিও স্টেশন থেকে শোনানো হয়। কিন্তু সত্যিকারের আমাদের নদী দিয়ে আর কোন মাঝি তা গেয়ে যাচ্ছে না, আমাদের কানে আর আসছে না। এইজন্য ওদের মতো শিল্পী সুলতানের মনেও বেদনা আছে, তিনি ওদের সেই আকাঙ্খিত কথাই অশ্রুত গানই ছবিতে প্রকাশ করেন। তাঁরা তো সুখী ছিলো, তাঁদের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ ছিল। তাঁদের সেই সুখের জীবনটাকে ছবিতে তিনি পুনপুন এঁকেছেন। তাঁদের সেই পুরোনো দিনের কথা স্মরণে আসুক, একদিন আবার তাঁরা স্বনির্ভর হোক।তাঁদের অস্তিত্ব সত্ত্বা যেটা বিলুপ্তি ঘটে যাচ্ছে তাকে পুনরুদ্ধার করুক। তিনি যদি দুঃখের কথা, 'সাফারিং' এর কথা অবক্ষয় যেটা হয়েছে তা প্রকাশ করতেন, তবে আর কোনদিন আমরা জাগতে পারবোনা। তাই শিল্পী সুলতান সমাজ পরিবর্তনের আশা করেন, মেহনতী কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির আশা করেন, তাঁদের সুস্বাস্থ্য আশা করেন। সেহেতু তাঁর চিত্রকলাসমূহ আমাদের কাছে সব সময় আশার বাণী শুনাবে, মনের সাহস যোগাবে, সংগ্রাম করার শক্তি যোগাবে আগামী কালকে সুন্দর ও নতুন সমাজ গড়বার। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

> "অনেক শিল্পী আদিম শিল্প বা নিগ্রো আর্ট থেকে প্রভাব নিয়েছেন, তাহলে সে যুগ কি আধুনিক ছিল না? অতএব সে যুগকে টেনে এনে এযুগে তাকে আধুনিকীকরণ করছি, তাতে জানবার আছে আমরা আদিমযুগকে পরিহার করিনি। সেই ফলগুলোকেই আমরা পুনরায় পাচ্ছি। বাস্তবধর্মী শিল্পীদের কাছ থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি, দিক নির্দেশনাও পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে পরিপ্রেক্ষিত পাচ্ছি, রং এর মিশ্রণ এবং প্রকৃত রং পাচ্ছি। বর্তমানে পৃথিবীতে কিছু শিল্পী আকৃতি ও রং নিয়ে ক্যানভাসে খেলা করছে, কিছু সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, যাতে বুঝবার কিছু না থাকে। এটা একটু শিশুসুলভ বলে মনে হয়। এই প্রকাশভঙ্গীকে বাধা দেবার উপায় নেই। কারণ শিল্পী মন, যা পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তাকে বললে সে বলবে 'আমার ভেতর কে যে এইসব করে, বা আমার দ্বারা হয়, কিংবা আমাকে দিয়ে করান হয়। এটা আমি বুঝতে পারিনা, আমি করে চলেছি, এটা আপনার কেমন লাগে জানিনা, ভাল লাগলে ভাল'–তার প্রকাশ এইরূপে। এই যে তারা ছুটে চলেছে কোন পথে তাও তানা জানেনা। যে অর্থ তারা এসব ছবি আঁকতে ব্যয় করছে তা সমাজসেবায় ব্যয় হলে ভাল হতো, গরীবের জন্য। এই বিলাসিতা করবার কি প্রয়োজন আছে। যার অস্তিত্ব আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য কোন কাজে লাগবে না। নতুন প্রজন্মের জন্য এইসব করার কোন প্রয়োজন নেই"।[৭]

তাই শিল্পকলাকে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের আরো কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। তাতে সৃজনশীলতা ও দর্শন যেটা থাকবে সেটা আমাদের দেশের প্রকৃত মানুষকে নিয়ে, মানুষের জন্য করতে হবে।

শিল্পী সুলতানের চিত্রে বাঙালির মুলসত্ত্বা অসাম্প্রদায়িক রূপ নিয়ে উপস্থাপিত। সে যেন শুধু এই পৃথিবীরই মানুষ। এখানে তিনি কেবল মানবধর্মের কথাই প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিত্রে দালান কোঠা, যান্ত্রিক গাড়ী, কল-কারখানা আসেনি। তিনি অধিকাংশ সময় গ্রামে বসে ছবি এঁকেছেন। তাই তাঁর ছবিতে শুধু গ্রামের দৃশ্য ও মানুষ এসেছে। এই গ্রামীণ কৃষক যখন তাঁর চিত্রে অবসর নিচ্ছে তখন তিনি তাঁর হাতে একটি ফুল ধরিয়ে দিয়েছেন। ছবিতে কৃষকটি একহাতে দুই আঙ্গুলে ধরা ফুল থেকে সুবাস নিচ্ছে, অপর হাতে হুঁকা ধরা আছে। অর্থাৎ কৃষিকার্যের মাঝে পরিশ্রান্ত হয়ে কৃষকটি অবসর যাপনে হুঁকা টেনে জমির পার্শ্বে শুয়ে পড়ে জমির পার্শ্বেই গজিয়ে উঠা একটি ফুল গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গন্ধ শুকছে। এই ফুলের সুবাস তাঁর জীবনে যৌবনের আনন্দ, বেঁচে থাকার আনন্দ, মাটির সাথে জীবনের একাত্মতার আনন্দ। আবার কখনও তাঁর ছবিতে এসেছে পথপরিক্রমা। এখানে একজন কৃষক যৌবনদীপ্ত বাহু বলে তাঁর যৌবনবতী স্ত্রী ও পুত্রকে সাথে নিয়ে পথ অতিক্রম করছে। দূরে আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ, হয়তো এখুনি ছুটে আসবে ঝড় বা প্লাবন। তাই আর অপেক্ষা নয়, ফিরে যেতে হবে নিরাপদ আশ্রয়ে। আবারো কখনো তার ছবিতে অনেক মানুষজন একসাথে জমির মধ্যে মারা গেছে দেখানো হয়েছে। এতে বাংলাদেশের চিরায়িত ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছাসের করুণ দৃশ্যই তিনি তুলে ধরেছেন। এরপর তাঁর বৃহৎ আকারের ছবি 'সবাক সচল ইতিহাস' আমাদের ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা স্মরণ করে দিয়েছে। পাক সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণ, হত্যা ও ধর্ষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বৃদ্ধ ও মহিলারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে যুবকরা অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এই পালিয়ে যাবার দৃশ্যে একজন বৃদ্ধকে তিনি দেখিয়েছেন, সে হাঁটতে পারে না, তাকে দোলনায় বা খাটিয়ায় চড়িয়ে পথ অতিক্রম করছে দুইজন শক্তিমান পুরুষ। এখানে যে শক্তি বা বাহুবল বৃদ্ধদের রক্ষা করার জন্য পথ চলায় দেহের ভার বহন করছে, পরবর্তীতে সেই শক্তিই যুদ্ধ করেছে, দেশ স্বাধীন করতে। অর্থাৎ আগামীতেও তিনি এই বাহুর শক্তিতেই নতুন সমাজ গড়বার আশা ব্যক্ত করেছেন, এখানে যুবকরাই হচ্ছে অগ্রগামী, চালিকা শক্তি।

উপসংহার

আমাদের সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক সমাজ, এবং কৃষিজাত সামগ্রীই আমাদের জীবনধারণের প্রধান উৎস, তাই কৃষক আমাদের মেরুদণ্ড। বর্তমানে আমাদের কৃষককূল অর্থাভাবে ক্লিষ্ট এবং আর্ত, তাদের অনেকেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। অথচ এরাই জীবনের প্রাণকেন্দ্র। "শিল্পী সুলতান তাঁর চিত্রকর্মে প্রমাণ করেছেন যে, শস্য বপনের মধ্য দিয়ে একজন কৃষক একটি প্রত্যয়ের জন্ম দেয়, একটি বিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং জীবনের জয়যাত্রার একটি অহঙ্কারের জন্ম দেয়"।[৮] এই আদর্শের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলার কৃষকদের সামগ্রিক জীবনকে তুলে ধরেছেন এবং বারবার তাঁদের সম্বন্ধে ভাববার অবকাশ করে দিয়েছেন। এছাড়া আমাদের দেশে ভোগবিলাসী কিছু মানুষ যখন অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে সমাজের নেতৃত্ব করে বেড়াচ্ছেন তখন শিল্পী সুলতানের চিত্রকর্ম আমাদের এই বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, কালে কালে এই ভোগবিলাসী মানুষগুলোর পতন হয়েছে, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর মানবপ্রেমিক মানুষ ইতিহাসে পেয়েছে অমরত্ব।

তথ্য নির্দেশঃ

১। বুলবুল ওসমান। "বাংলাদেশের চিত্রশিল্পের উন্নয়নঃ সামাজিক পটপ্রেক্ষিত"। *শিল্পকলা (ষান্মাসিক), পৃ. ১৮।*

২। মীজানুর রহমন। "সম্পাদকের কড়চা"। *মীজানুর রহমান ত্রৈমাসিক পত্রিকা,* ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুলাই–সেপ্টেম্বর, (ঢাকা: ইডেন প্রিন্টিং প্রেস ওয়ার্কস), পৃ. ১১৭।

৩। আল মাহমুদ। "শিল্পী এস. এম. সুলতান"। *এস.এম. সুলতান এবং তাঁর চিত্রকর্ম,* (ঢাকা: জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট এর আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীর স্মরণীকা, ১৯৮৬), পৃ. ৩২।

৪। আহমদ ছফা। "বাংলার চিত্র ঐতিহ্যঃ সুলতানের সাধনা"। *বাঙালী মুসলমানদের মন।* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮১), পুনমুদ্রন নৃ, ১৯৯০, পৃ. ৩০–৪১।

৫। তারেক মাসুদ। "আদম সুরত" (ধারাভাষ্য)। নৃ, সাহিত্য ও শিল্প সংকলন, সংখ্যা–১, (ঢাকা: বাংলাদেশ প্যাকিং প্রেস লিঃ, ১৯৯০), পৃ. ৬৩।

৬। আমজাদ আলী। "বাংলার একজন তরুণ শিল্পী"। নৃ, পৃ. ৫৯–৬০।

৭। ক্যাসেটে ধৃত শিল্পী এস.এম. সুলতানের সাক্ষাতকারে প্রদত্ত তথ্য। নড়াইলঃ ১৪ই এপ্রিল, ১৯৯০ ইং।

৮। সৈয়দ আলী আহসান। "সুলতানের চিত্রকর্ম"। *এস.এম. সুলতান ও তাঁর চিত্রকর্ম।* (ঢাকা: জার্মান সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ), পৃ. ৩০।

২

রাজশাহীর বিয়েঃ অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিক গীত

এস. এম. গোলাম নবী

বিবাহ মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। 'পরিবার প্রতিষ্ঠাকল্পে দু'জন নর-নারীর নৈতিক, দৈহিক ও বৈধ মিলন বিবাহের মাধ্যমে সমাজ কর্তৃক সমর্থিত হয়।'[১] রাজশাহী অঞ্চলের বিয়ের অনুষ্ঠান এবং বিয়ের আচার অনুষ্ঠানকে ঘিরে মেয়েলী গান বিশেষ চমৎকারিত্বের দাবীদার। লোক-সাহিত্য গবেষক খোদেজা খাতুন যথার্থই বলেছেন, "বিবাহটা চির জীবনের পালাগান। সমগ্র জীবনের উপর যে অনুষ্ঠানের এত প্রভাব, সংগীতে-নৃত্যে-বাদ্যে-বাজনায় তাকে বিশিষ্ট ও মনোরম করে তুলতে কে না চায়?"[২] মানবজীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রতিটি দেশেই সামাজিকতায় এবং আনুষ্ঠানিকতায় মাধুর্যময়। বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলেই বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানগুলো বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও গীত-নৃত্যে ভরপুর। তবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় সমাজে, বিশেষ করে পল্লী সমাজে বিবাহের আচার অনুষ্ঠানগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং গীতময়। বিবাহ অনুষ্ঠানে গীত সংগীতগুলো সরস ও আন্তরিকতাপুষ্ট। ভাব, ভাষা সবই গ্রামীণ সমাজের, তাই এ সবের মধ্যে গ্রামীণ জীবনের খাঁটি পরিচয় মেলে। পল্লীর বিবাহ উৎসব, দাম্পত্য জীবনের নিখুঁত ছবি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী-জা-ননদ মিলিত পারিবারিক জীবনচিত্র, বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন থেকে কণ্যার বিদায়-বিচ্ছেদ জনিত বেদনাকাতর হৃদয়ালেখ্য দেখতে পাওয়া যায় বিবাহের গীত, নৃত্য এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে। সনাতন পল্লীর প্রাণের ঘ্রান পাওয়া যায় এতে। আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে প্রাণের কথাটি ঝংকৃত হয়, তাই বিয়ের গীতে যে রস পরিবেশিত হয়, তা সত্যিই উপভোগ্য।

মেয়েলী সংগীতে রোমান্স সুলভ প্রেমানুভূতির উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা বাস্তবতার সীমা লংঘন করেনি। নর-নারীর মিলিত জীবনের কেন্দ্র স্থলে যে স্পর্শকাতর মনটির বাস, এই সংগীতের রস সেই মনকে অপূর্ব ভাবাবেগে নিষিক্ত করে। এই ভাবাবেগ মানুষের মনোজীবনের বাস্তবালেখ্য। তাই, এই সংগীত অপূর্ব কাব্যরসের নির্ঝর।[৩] লক্ষ্য করা গেছে যে বিবাহের গান প্রত্যেক জাতিরই লোক সংগীতের সর্বাধিক মূল্যবান অংশ।[৪]

বিয়ের গানগুলো মূলতঃ মেয়েরাই গেয়ে থাকে। রাজশাহী তথা উত্তরাঞ্চলে এইসব মেয়েলী সংগীত "গীত" নামে পরিচিত। রাজশাহীর বিবাহ অনুষ্ঠানগুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা হলোঃ

১। বিবাহপূর্ব অনুষ্ঠানঃ

ক. পানচিনিঃ বিবাহের প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান হলো 'পানিচিনি'। ঘটক বা কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের সমঝোতার পর বরপক্ষ কণের বাড়ীতে কণে দেখতে যায়। এ সময় বরপক্ষ মাছ, পান, সুপারী, মিষ্টি ইত্যাদি সংগে নিয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই

বরপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কণে দেখে এবং বরপক্ষের কোন বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কণের মুখে চিনি তুলে দেয়। রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে এই আনুষ্ঠানকে 'পানচিনি' বলা হয়। উত্তরাঞ্চলের অন্যত্র এই অনুষ্ঠানটি 'পাকাদেখা' বা 'রায়নামা' নামেও পরিচিতি। এই দিনই বিয়ের তারিখ ধার্য করা হয়। তাছাড়া এই দিনই উভয় পক্ষের দেনা পাওনা এবং মোহরানা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় একে 'পানছিন্নি' ও বলে। এইদিনই আনুষ্ঠানিভাবে কণেকে নাকফুল পরিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানাটি "নিরোক্ষণ" বা "আক্‌দ" নামেও পরিচিতি। আজকাল নাকফুলের বদলে সোনার আংটি পরিয়েও "নিরোক্ষণ" বা "আক্‌দ" করা হয়। এরপর কণে পক্ষ বরের বাড়ীঘর দেখতে যায়। একে 'ঘর-বর' দেখা বলে।

খ. থুবড়া খাওয়ানঃ বিয়ের 'পাকা কথা' সম্পন্ন হবার পর বর ও কণের নিজ নিজ বাড়ীতে এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। আগের দিনে 'থুবড়া খাওয়ান' অনুষ্ঠানটি বিয়ের ঠিক সাতদিন পূর্বে হতো। বর্তমানে বিয়ের পাঁচদিন বা তিনদিন আগে নিজ নিজ গৃহে বর ও কণেকে 'থুবড়া খাওয়ান' হয়। বর বা কণের মা নিজনিজ সমাজের প্রত্যেকটি বাড়ীতে থুবড়া খাওয়ানোর দাওয়াত দিয়ে আসে। অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে বরের বাড়ীতে বরের এবং কণের বাড়ীতে কণের আত্মীয়া এবং এয়োগণ ধান ভেনে আতব চাল তৈরী করে এবং এই আতবচাল দিয়েই মূলতঃ 'থুবড়া' তৈরী হয়। রাজশাহীসহ উত্তরবংগের প্রায় সর্বত্রই থুবড়াকে 'খেরেশা' বলে। আতবচাল, দুধ ও চিনি বা গুড় দিয়ে এই 'খেরেশা' বানানো হয়। একে 'খির'ও বলে। এই 'থুবড়া' বা 'খেরেশা' রান্নার সময় এয়োগণ গাইতে থাকে,

> *"মায়ে রান্ধিলো খির / মায়ে বাড়িল খির / বাপে আস্যা ঢাল্যা দিলো দুধরে আনন্দের বাঁশি।"*[৫]

অতপর থুবড়া খাওয়ানোর জায়গায় বর বা কণেকে আনতে আনতে এয়োগণ গাইতে থাকে,

> *"উঠো উঠো উঠো 'কমেলা' লাশবাড়ী পরবে/ কমেলা যুবত নাই মুরকে / লাল শাড়ী পর্যা কমেলা সোন্দার সপে বসরে / কমেলা যুবত নাই মুরকে / সোন্দার সপে বস্যা কমেলা দুধের খেরেশা খাওরে / কমেলা যুবত নাইমুরকে'।*

কণেকে লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়ে থুবড়া খাওয়ানোর জায়গায় আনা হয়। এবং বামদিক থেকে ডাক দিকে তিনবার ঘুরানোর পর পশ্চিম দিকে মুখ করে বসানো হয়। এবার বর বা কণের বড় বোন অথবা ভাবী তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং নিজের শাড়ীর আঁচলটি বর বা কণের মাথার উপর তুলে দিয়ে পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে থাকে। উল্লেখ্য, পাখার সাথে একটি বা দুটি আমের কচি পাতাও থাকে। বর বা কণের কোন বর্ষীয়ান নিকট আত্মীয় বা আত্মীয়া বর বা কণের মুখে এই 'খেরেশা' প্রথমে তুলে দিয়ে 'থুবড়া খাওয়ান' অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। সাথে সাথে এয়োগন গেয়ে ওঠে,

> *"মায়ে ডাকে উঠরে বানেরা / উঠিয়্যা খেরেশা খাও / খেরেশা খাউয়্যা গেরেদা লাগুয়্যা কতই নিদ্রা যাও"।*

এইভাবে এয়োগন একের পর এক গীত গাইতে থাকে এবং আত্মীয় স্বজন একে একে বর বা কণেকে খেরেশা খাওয়াতে থাকে। এ সময় আত্মীয় স্বজন সাধ্যমত বর বা কণেকে নগদ অর্থ দান করে।

আগের দিনে এই খির খাওয়ানো অনুষ্ঠানটি সাতদিন পর্যন্ত চলতো। এখনো এই অনুষ্ঠানটি তিনদিন পর্যন্ত চলতে দেখা যায়। রাজশাহী অঞ্চলে এই খির খাওয়ানো অনুষ্ঠানে 'খঞ্চা'[৭] দেয়ার প্রথা এখনো চালু রয়েছে।

রাজশাহীর গ্রামাঞ্চলে আগের দিনে থুবড়া খাওয়ানোর পর হতে বিয়ের দিন পর্যন্ত বিয়ে বাড়ী গীত-নৃত্যে সব সময় জমজমাট হয়ে থাকতো। পূর্বে বিবাহ উপলক্ষে গোটা সমাজকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর প্রথা চালু ছিল। এখনো আছে তবে তা আগের মত নয়। সাধারণতঃ 'পানচিনি' বা 'পাকা দেখা' বা 'বায়নামার' দিনই কণের বাবা বা কণেপক্ষ সমাজ ডাকতো। এই দিনই সমাজের মাতবর ও বরপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে 'ওলিমা'[৮]র পরিমাণ নির্ধারণ করা হতো। তাছাড়া এই দিনই কণেপক্ষ সমাজের লোকজন এবং বরযাত্রীকে কীভাবে আপ্যায়িত করবে তা নির্ধারণ করা হতো।

বিবাহ অনুষ্ঠানে বরপক্ষও সমাজের লোকজনকে আপ্যায়িত করে এবং এ ব্যাপারে সমাজপতিদের নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

গ. গায়ে হলুদঃ 'বাংলার কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গ্রাম ও শহরের ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল পরিবারে বিবাহোৎসবে গাত্র-হলুদ একটি অনিবার্য অনুষ্ঠান।[৯] বিয়ের সাতদিন অথবা তিনদিন আগে বর ও কণের স্ব স্ব গৃহে গায়ে হলুদ আচারটি পালিত বা অনুষ্ঠিত হয়। গায়ে হলুদ মাখানোর সময় কণেকে লাল পেড়ে হলুদ রংঙের শাড়ী পরান হয়। এই শাড়ী 'হলুদ মাখা' বা 'তিলানী' কাপড় নামে পরিচিত। হলুদ বাটার সময় এয়োগণ গাইতে থাকে,

'ইপার উপার কুসুমের আড়া মধ্যে ব্যাজো পাড়া/ এতো রাইতে বাজনা গো বাজে/ হলুদ বাটে কারা।[১০]

হলুদ বাটা ও মাখানোর সময় এয়োগণ দল বেঁধে নৃত্য-গীতে এই অনুষ্ঠানটি মুখরিত করে রাখে।

ঘ. মেহেদী তোলাঃ গায়ে-হলুদ ও মেহেদী তোলা অনুষ্ঠানটি মোটামুটি একই রকম। এয়োগণ দল বেঁধে মেহেদী তুলতে যায় এবং গাইতে থাকে,

"মেন্দি তুলো ভালাই কর/ ডাল য্যান ভাংগেনারে। মেন্দি তুলে কে"।

মেহেদি তুলে আনার পর এয়োগণ সবাই মিলে গীত গায় এবং তা সুন্দর করে বাটে ও বর বা কণের হাতে সুন্দর নক্সা করে লাগিয়ে দেয়। গায়ে-হলুদ ও মেহেদী তোলা অনুষ্ঠানটি বর ও কণের বাড়ীতে আলাদা আলাদা ভাবে হয়।

ঙ. আদা-গুড় খাওয়ানঃ এই অনুষ্ঠানটি বিয়ের পূর্বে বর ও কণের স্ব স্ব গৃহে পালিত হয়। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আমোদপূর্ণ। এয়োগণ দল বেঁধে গীত গাইতে গাইতে প্রথমে পুকুর বা নদী থেকে কলসীতে করে পানি ভরে আনে। এবার বর বা কণেকে গোসল করানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় একটি ছোট জলচোকির উপর বসানো হয়। বর বা কণের হাতে দুইটি বড় আকারের পান দেয়া হয়। বর বা কণে দুই হাতে দুইটি পান নিয়ে একটি দিয়ে নিজের চোখ ঢাকে এবং অপরটি হাতে করে মাথায় রাখে। মাথায় রাখা পানের নিচে একটি সুপারীও রাখা হয়। অতঃপর মাথায় রাখা পানের উপর "আদা-গুড়"[১১] তুলে দেয়া হয়। এবার একে একে সবাই এই আদা-গুড় তুলে নেয় এবং খেতে থাকে। এ সময় সবাই মিলে সবার গায়ে পানি ছিটিয়ে এবং রং মাখিয়ে আমোদ করে। এই রং মাখানো থেকে ছোট বড় কেউই রেহাই পায় না। এই আচারটি রাজশাহী অঞ্চলের সর্বত্র এখনও প্রচলিত। এরপর বর বা কণেকে ভালোভাবে সাবান দিয়ে গোসল করানো হয়। এই অনুষ্ঠানটিও এয়োগণ নাচে-গানে মুখরিত করে রাখে।

চ. বর সাজানঃ গোসল করানোর পর বরকে ঘরের মধ্যে এনে বরের ভগ্নীপতি, ভগিনী এবং এয়োগন বিয়ের সাজে সাজায়। এ সময় এয়োগন সমঃস্বরে গাইতে থাকে, '

দামাদ'[১২] তুমি গরু চরান্যা ছাড়নি/ তাইতো তোমার বিহ্যার ছিরি উঠেনি'।

এরপর একে একে জামা, পাজামা, টুপি, জুতা ইত্যাদি পরান হয় এবং এয়োগণ গাইতে থাকে,

"যখনি 'আসগর'[১৩] আলী জামা পরিব্যার লাগে/ সাদের মাল্যানরে আসিয়্যা জামা কাড়িয়্যা রাখে/ এ্যাড়গো-ছ্যাড়গোরে মাইল্যান বিহ্যার সাজন সাজি।

এই ভাবে বরকে সাজান হয় এবং এয়োগণ গীত গায়। উল্লেখ্য, আদা গুড় খাওয়ানোর পর কণেকে কিন্তু এভাবে সাজান হয় না- কণেকে সাজানো হয়- কলেমার পরে।

ছ. বর বিদায়ঃ সাজানোর পর বিবাহ উপলক্ষে-কণের বাড়ী যাত্রার জন্য এবার বর বিদায়ের পালা। যাত্রার পূর্বে বরবেশে ছেলে মা-বাবার কদমবুচি করে বিদায় চায়। মা ছেলের কপালে চুমু দিয়ে মিষ্টি ও এক গ্লাস দুধ খাইয়ে দোয়া করে ছেলেকে বিদায় দেয়। এরপর বরযাত্রী কণের বাড়ী যাত্রার পূর্বে আগমনী সংকেত হিসেবে বরের বাড়ী থেকে কণের বাড়ীতে 'মাছ-পান' পাঠান হয়। উল্লেখ্য, আগের দিনে মাছ-পানের সাথে থাকতো মিষ্টি, বড় আকারের দু'টি মাছ, দুই তিন বিড়া পান, সুপারী ও এক বোতল সরিষার তেল। মাছ-পান এখনো পাঠান হয় তবে এর সাথে সাধারণতঃ থাকে মাছ, পান ও মিষ্টি।

২. বিবাহকালীন অনুষ্ঠানঃ

ক. বর বরণঃ রাজশাহীতে বিবাহ অনুষ্ঠানে কণের বাড়ীতে বর বরণ অনুষ্ঠানটি অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আলাদা। বর বরণ করার জন্য কণের বাড়ীর দরজায় সুন্দরভাবে সাজানো গেট তৈরী করে একটা লাল ফিতা বেঁধে রাখা হয়। এবং এই গেটের সামনে একটি টেবিলের আশে পাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টেবিরের উপর পেয়ালায় মিষ্টি, চিনি, ফিতে কাটার জন্য কাঁচি

ইত্যাদি থাকে। তবে বর আসার সাথে সাথেই তাদেরকে ফিতা কেটে ভেতরে যেতে দেয়া হয় না। এর জন্য অপেক্ষমান ছেলেমেয়েরা বরের কাছে কিছু টাকা বখশিস হিসেবে দাবি করে। এই দাবি মেটানোর পর বরকে ফিতা কাটার অনুমতি দেয়া হয়। বর কাঁচি দ্বারা ফিতা কাটার সাথে সাথে বরের মুখে মিষ্টি, চিনি বা সরবত দিয়ে তাকে বরণ করে নেয়া হয় এবং বরযাত্রী বসার নির্দিষ্ট জায়গায় বর এবং বরযাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় এয়োগন গাইতে থাকে,

'উত্তর হতে আ'লো বাক্সরাজা/ বাক্স ঘাড়ে কর‍্যা/ কি কি জিনিস আন্যাছো বাক্স রাজা। বাক্স খুলো দেখি।'..... এবং *'বর আইলো বৈর‍্যাভি আলো হায়রে এরফান আ'লো/এরফান আ'লো লিতে কিনা'।.....*

খ. বৌ-লুকানঃ কণের বাড়ীতে বর-যাত্রীদের সাথে আসা মহিলাদের রাজশাহী অঞ্চলে "ডুলির বিবি" বা "ডুলার বিবি" বলা হয়। এয়োগণ কণেকে লুকিয়ে রাখে। এবং কিছু টাকা বখসিশ দেবার পর তারা কণেকে ডুলার বিবিদের কাছে দেয়। ডুলারবিবিরা তাদের সাথে পানের বাটাতে করে প্রচুর পরিমাণ পান-সুপারী নিয়ে আসে। বিয়ে বাড়ীর আত্মীয়-এয়োগণকে ডুলারবিবিরা পান দিয়ে আপ্যায়ন করে। এই সময় এয়োগণ বিভিন্ন রকম গীত গায়। যেমন-

'নদীর ধারে গো রসবালা ফুল ফুটে গো ডালে ডালে/ এই ফুল যাবে গো কার কার বাড়ী/ এই ফুল যাবে কণ্যার বাপের বাড়ী/ কণ্যার বাপের গো চুরুক দাড়ী/ মাইরবো গো ধামার বাড়ী/ ধামার কুলেগো আয়না ঝিলমিল করে। সাধের কমেলা বিবি বিহ্যারে করে।' অথবা *'সুনার খুন্তি রূপ্যাররে ডাঠি। কমেলা আখারে খুঁড়ে। ভিজ্যা আখা ভিজ্যারে খড়ি/ কমেলা রান্ধনরে রাঁন্ধে।'*

এই ভাবে গীতে নৃত্যে বিয়ে বাড়ী একেবারে মুখরিত হয়ে ওঠে।

বরযাত্রী তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসার পরপরই তাদেরকে এবং ডুলার বিবিদের পান-সরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। এরপর বিয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 'কবুল' বা 'কলেমা' পড়ানো। এর মাধ্যমেই বর ও কণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

গ. বৌ-সিংরানঃ রাজশাহী তথা উত্তরাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় বৌ-সিংরান অনুষ্ঠানটি কলেমার আগে-আবার কোন কোন এলাকায় কলেমার পরে হয়। তবে রাজশাহী শহরের আশে পাশে সাধারণতঃ কলেমার পরেই বৌ-সাজানো বা সিংরানো হয়। কলেমার সময় কণে সাধারণতঃ তার বাবার দেয়া জামা-কাপড় পরেই কবুল করে। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উকিল, সাক্ষীসহ কণেকে কবুল করানোর পর বরকে কবুল করায়। অতঃপর একগ্লাস সরবত বরকে দিয়ে তার অর্ধেক খেতে বলা হয়। গ্লাসের বাঁকী অর্ধেক সরবত তখনি কণের কাছে নিয়ে খাওয়া হয় এবং তাকে খেতে বলা হয়। ঠিক এই সময়ে কণে বুঝতে পারে যে বর তাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করেছে। এরপর বিয়ের মজলিসে উপস্থিত সকলের মধ্যে 'ওলিমা' বিতরণ করা হয়।

বিয়ের দিন বর সাথে করে যে *'ডালা'* নিয়ে আসে তার সামগ্রী দিয়েই অন্তঃপুরে কণে সিংরান হয়। এটি পুরোপুরি স্ত্রী-আচার। এতে সাধারণভাবে কতকগুলি বিধিনিষেধ পালন করা হয়। এ সময় কণের পরণে বাপের দেওয়া কোন কাপড় চোপড় থাকে না।[১৪] কনেকে বর কর্তৃক আনীত বিভিন্ন অলংকারাদি ও প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। হিন্দু আচারের অনুরূপ এখনও এ অঞ্চলে চন্দন-গুঁড়া অথবা স্নো-জাতীয় প্রসাধন সামগ্রী দিয়ে কণের কপাল ও কপোল চিত্রিত করা হয়। কণে সিংরানোর সময় এয়োগণ গীত গাইতে থাকে,

'শাড়ী আন্যাছো জোড়া জোড়া। বেলুয়াজ না হলে পইরবোনা। আমের ডালা ডালা ঘুরিয়্যা ক্যানে দেখ্ল্যানা।'

কণে সিংরান অনুষ্ঠানে এই রকম অসংখ্য গীত গাওয়া হয়। গীত গাওয়ার সময় এয়োগণ নৃত্যও করে থাকে।

ঘ. পাঁচ-গেলাসীঃ পাঁচ-গেলাসী অনুষ্ঠানটি ঠাট্টা-তামাসা যুক্ত। কণেকে খির বা থুবড়া খাওয়ানোর জন্য বাড়ীর উঠোনে একটি চোকি পেতে তার চার কোনায় কলাগাছ পুঁতা হয় এবং সুন্দরভাবে রংগিন কাগজ দিয়ে সাজান হয়। এখানেই পাঁচ গেলাসী অনুষ্ঠান হয়। বর এবং তার 'কোল-ধরণী'দের[১৫] এখানে এনে প্রথমে বসতে দেয়া হয়-এবং পরে একটি বড় আকারের থালায় করে মিষ্টি জাতীয় বিভিন্ন রকম খাদ্যদ্রব্য তাদের খেতে দেয়া হয়। আজকাল মিষ্টান্ন দ্রব্যের সাথে পোলাও, কোর্মা, মাংস, ইত্যাদিও খেতে দেয়া হয়। এ সময় বরের শালা, শালী বা ভাবী সর্ম্পকীয় আত্মীয়েরা নানান অজুহাতে বরের কাছ থেকে নগদ টাকা বখশিস হিসেবে আদায় করে। এই অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আনন্দময়।

ঙ. মুখ দেখানীঃ উঠোনের মাঝখানে একটি নতুন *সোন্দার* পাটি বিছিয়ে তার উপর বর ও কণেকে পাশাপাশি দাঁড় করানো হয়। এরপর তাদের মাথার উপর ছোট্ট একটি চাঁদোয়া ধরে বর ও কণেকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দু'জনের সামনে ঠিক বুক বরাবর একটি আয়না ধরে বর ও কণেকে তাকাতে বলা হয়। বিয়ের পর এই প্রথম বর-কণে দু'জনে দু'জনার মুখ দেখে আয়নার মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশের সর্বত্রই প্রচলিত। অঞ্চল ভেদে আচারটির নাম ও আনুষ্ঠানিকতা বিভিন্ন রকমের। উত্তরাঞ্চলের কোথাও কোথাও আচারটিকে 'শা'নজর' আবার কোথাও কোথাও 'মধুচন্দ্রিমা' নামেও আখ্যাত। রাজশাহী অঞ্চলের কোন কোন এলাকায় 'আয়না মুখ' নামেও অনুষ্ঠানটি পরিচিত। ঢাকা জেলায় এই অনুষ্ঠানটির নাম 'ক্ষীরবুজনী'[১৬]। সদ্য বিবাহিত দম্পতি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একে অন্যকে সরাসরি দেখা, বিশেষ করে বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত অসংখ্য আত্মীয় স্বজনদের সামনে, বড়ই লজ্জাজনক ব্যাপার। তাই এয়োগণ একখানা আয়নাতে পরস্পরের প্রতিবিম্ব দেখায়।

চ. কণে বিদায়ঃ বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে বড়ই বেদনাবিধুর অনুষ্ঠান হলো 'কণে বিদায়'। বিয়ের গীতের শ্রেষ্ঠ অংশও কণে বিদায়ের গীত। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিয়ের গীতের সংখ্যাও সব অঞ্চলেই বেশী। এই সমস্ত গানের কথা ও সুরে পল্লীর অশিক্ষিত রমনীরা অতি চমৎকারভাবে

প্রাণের বেদনাটি ব্যক্ত করে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সংগীতে সাদৃশ্যও সুস্পষ্ট। অধিকাংশ অঞ্চলেই কণ্যার আদরের ডাকনাম 'ময়না'[১৭]।

যে স্থানে বর কণেকে মুখ দেখানো হয়, কণে বিদায় অনুষ্ঠানটিও সেখানেই অনুষ্ঠিত হয়। কণের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন এবং বরের বয়স্ক আত্মীয়গন এখানে উপস্থিত হয়ে বরের হাতে কণেকে সপে দেয়। রাজশাহীর কোন কোন এলাকায় 'কণে বিদায়' অনুষ্ঠানটি '*সঁপে দেয়া*' অনুষ্ঠান নামেও পরিচিত। সাধারণতঃ কণের বাবাই বরের হাতে কণেকে সঁপে দেয়। প্রথমে বরের ডান হাতের উপর কণের বাম হাত রাখা হয়। অতঃপর বরের বাবা অথবা বরের নিকটস্থ কোন বয়স্ক আত্মীয়ের হাতের উপর বর ও কণের মিলিত হাত রেখে কণের বাবা বলতে থাকে, "*আমার অনেক আদরের ময়নাকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম।*" এসময় কণের বাবা, কণে এবং আত্মীয়-স্বজন সবার চোখেই পানি আসে। এয়োগণ কান্নার সুরে গাইতে থাকে,

"আগে যদি জানতাম ময়না তোরে নিবে পরে রে সুন্দর মতি ময়নারে।"

এই রকম অসংখ্য করুণ রসের গীত গেয়ে এয়োগণ কণেকে বিদায় জানায়। কণে কাঁদতে কাঁদতে বরের হাত ধরে বিদায় হয়। আর কণে বিদায়ের সাথে সাথে কণের বাড়ীতে বিবাহকালীন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

৩. বিবাহোত্তর অনুষ্ঠানঃ

ক. বধুবরণঃ কণের বাড়ীতে যেমন বর বরণ, বরের বাড়ীতে তেমনি বধুবরণ। বিয়ে করে বর স্বপৃহে ফিরে এলে প্রথমে বর-বধুকে বরণ করে নিতে হয়।[১৮] বর-কণে বরের বাড়ীতে এসে পৌছার পর, বর-কণে যে ঘরে বাস করবে সে ঘরের দরজা পর্যন্ত একটা লাল বা সাদা কাপড় বিছিয়ে দেয়া হয়। তারপর তার উপর সুপারী পান ও ছোট মাটির সরা ছড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর বরের একজন বয়স্ক আত্মীয়া বর ও কণের মুখে সামান্য চিনি দিয়ে নামিয়ে আনেন। তারপর বর ও কণেকে নিয়ে ঐ বিছানো কাপড়ের উপর দিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রসর হওয়ার সময় বরকে নীচু হয়ে পান, সুপারী ও মাটির সরা তুলে নিতে হয়। এর অর্থ হলো বর যেন কণ্যাকে নিয়ে ভবিষ্যত জীবনে সমস্ত বিপদ-আপদ অতিক্রম করতে পারে।..... মা তারপর দুই হাতের ফাঁক দিয়ে বর ও কণেকে ঘরের মধ্যে ঢুকান এবং নিজের দুই উরুর উপর দু'জনকে নিয়ে দুই গ্লাস দুধ পান করান। মা ঘরের কোণায় রক্ষিত একটি ডোল দেখিয়ে ছেলের বৌকে জিজ্ঞেস করেন, *'বলতো মা ডোলের মধ্যে কি?'* কণে ডোল দেখে এসে বলে, *'ধান'*। মা বলে ওঠেন, *"তোমার ঘরে হোক ধানের বান।"* শাহ্ আনিসুর রহমান এটাকে বগুড়া জেলার আচার বলে উল্লেখ করেছেন।[১৯] তবে এই আচারটি রাজশাহী অঞ্চলেও প্রচলিত।

রাজশাহীর কোন কোন অঞ্চলে এই আচারটি অন্যভাবেও অনুষ্ঠিত হয়। যেমন-বর ও বধু-বাড়ীর দরজায় আসার সাথে সাথে বরের মা একটি বাটিতে করে চিনি নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়ায়। অতঃপর ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, *"বাবা তুমি কোথায় গেছিলে?'* ছেলে উত্তর দেয়, *"বাণিজ্যে"* মা জিজ্ঞেস করে, *"কি আনলে?"* ছেলে উত্তর দেয়, *"সোনার ময়না"* মা বলে, *"বাবা সোনার ময়না তুমি কাকে দিলে?"* ছেলে উত্তর দেয়, "*তোমাকে*" মা এবার খুশী হয়ে বলে,

"তোমার ময়না নিয়ে তুমি সুখে থাক বাবা।" অতঃপর ছেলে ও বধুর মুখে চিনি দিয়ে তাদের বরণ করে নেয়। কোন কোন অঞ্চলে এ সময় বর ও বধুর পা ধুইয়ে দেয়া হয়। যাইহোক রাজশাহী অঞ্চলেরই বিভিন্ন স্থানে এই বধুবরণ আচারটি বিভিন্ন রকম।

খ. বাসর ঘরঃ বিয়ের পর বরের বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী একসংগে প্রথম রাত্রি যাপনকে *'বাসর জাগা'* বা *'বাসরঘর'* বলা হয়। বাসর রাত যে কোন দম্পতির জীবনে অত্যন্ত স্মরণীয়। কারণ এখান থেকেই দাম্পত্য জীবনের শুরু।

গ. বাসী গোসলঃ বাসী গোসল আচারটি বরের বাড়ীতে বাসর জাগার পরদিন সকালে সম্পন্ন হয়। রাজশাহীসহ উত্তরাঞ্চলের সবখানেই এই আচারটি প্রায় একই রকম। এ সম্পর্কে খোদেজা খাতুন লিখেছেন, *"অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালে বর ও কণেকে এক সংগেই বড় একখানি পিঁড়িতে পাশাপাশি বসিয়ে গোসল করানো হতো। এখন শুধু কণেকে ঘর থেকে পান চোখে দিয়ে উঠানে বের করে এনে পিঁড়িতে বসানো হয়। তারপর গোসল হয়ে গেলে আবার পান চোখে দিয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়। গোসলের পিঁড়ির সামনে একটা মাটির নতুন সরা রাখা হয়। ঘরে চলে যাবার সময় কণেকে ঐ সরাটি পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যেতে হয়। সরাটি ভেঙ্গে যে কয় টুকরা হবে, নব দম্পতির ছেলে মেয়েও ততজন হবে বলে মনে করা হয়। এয়োরা মিলে তখন ঐ টুকরোগুলো হাতে নিয়ে উপস্থিত প্রত্যেকের কাছে যায় এবং নবজাত সন্তানের ক্রন্দনের অভিনয় করে গীত গায়।*[২০]

রাজশাহী অঞ্চলে বাসী গোসল করানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এনে বর ও কণেকে দু'টি পিঁড়িতে বসানো হয়। অতঃপর তাদের সামনে একটি ছোট্ট গর্ত করে তার মধ্যে পানি, পয়সা ও আংটি রাখে। বর ও কণে দু'জনেই এর মধ্যে হাত দিয়ে আংটি ও পয়সা খুঁজে তা নিজ হাতে মুষ্টি বদ্ধ করে রাখে। অতঃপর একে অপরের মুষ্টিবদ্ধ হাত খুলে তা আবার পানির মধ্যে ফেলে দেয়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ খেলা চলে। এ আচারটি *'পাশাখেলা'* নামে পরিচিত।

এরপর বর-কণে দু'জনকে দাঁড় করিয়ে একটি বড় আকারের গামছা তাদের মাথায় ভালভাবে বিছিয়ে দু'জন এয়ো ধরে থাকে এবং অন্যরা তার উপর পানি ঢালতে থাকে। তারপর বর ও কণেকে আলাদাভাবে গোসল করানো হয়। *'বাসী গোসল'* আচারটি অঞ্চলভেদে *'বাসী বিয়ে'* নামেও পরিচিত।

ঘ. বৌ-ভাতঃ সব সমাজের বিয়েতেই বরের বাড়ীতে বৌ-ভাতের প্রচলন আছে।[২১] এই অনুষ্ঠানটি সাধারণতঃ বিয়ের পরদিন হয়ে থাকে। এটি মূলতঃ খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান। বরপক্ষ নিজের এবং কণের আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খাবার আয়োজন করে। এই দিনই আত্মীয় স্বজনরা ক্ষমতা অনুযায়ী উপহার সামগ্রীসহ নতুন বধুর মুখ দেখে এবং ভুরিভোজন করে।

ঙ. ফিরোনীঃ বৌ-ভাত শেষে কণের বাবা মা, মেয়ে-জামাইকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যায়। এ সময় জামাইয়ের ভগ্নীপতিরাও জামাইয়ের সংগী হয়। এদের বলা হয় *'কোল ধরনী'*। তারা সকলে সেখানে তিনদিন পাঁচদিন বা সাতদিন থাকার পর আবার ফিরে যায় নিজ বাড়ীতে। এ অঞ্চলে আচারটি *'ফিরোনী'* নামে পরিচিত। এরপর আটদিন পরে আবার কণেকে বাবার বাড়ী

নিয়ে যাওয়া হয়। এর নাম '*আটমঙ্গা*'। এরপরই বিবাহ সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি মোটামুটি শেষ হয়ে যায়।

উপসংহারঃ

রাজশাহী অঞ্চলের বিবাহ অনুষ্ঠানের আলোচনায় যে সব লোকাচার ও মেয়েলী গীতের উপস্থাপনা করা হয়েছে তার উৎসমূল দুটিঃ সংস্কারবোধ এবং আমোদপ্রিয়তা। বিবাহ একটি শুভ অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানের আচারগুলো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মেয়েলী গীতে। বর্তমান আলোচনায় সচরাচর অনুষ্ঠিত আচারগুলোই স্থান পেয়েছে। এগুলো ছাড়াও রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকম আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তাছাড়া এলাকাভেদে অনেক আচারের আনুষ্ঠানিক রীতিও আলাদা। সবচেয়ে বড় কথা হলো– বিবাহের আনুষ্ঠানিক গীত। মেয়েলী গীতে যে কথা ও সুরের ব্যঞ্জনা, তা সত্যিই স্মরণযোগ্য। তথাকথিত আধুনিকতা ও বহিরাগত সংস্কৃতির অগ্রাসনের ফলে বাংলার আবহমান কালের এই লোকাচার এখন প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে।

পাদটীকাঃ

১. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক–সংস্কৃতি*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃঃ ১৭২।
২. খোদেজা খাতুন, *বগুড়ার লোক–সাহিত্য*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭০), পৃঃ ১৪৯।
৩. খোদেজা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৫১।
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বংগীয় লোক–সংগীত রত্নাকর*, ৩য় খন্ড, (কলিকাতাঃ এ মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী ২১৯৭৭) পৃঃ ১৩৭০।
৫. এই গানটি বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলেই গীত হয়।
৬. *"কমেলা"* কণের কাল্পনিক নাম। বরের বাড়ীর অনুষ্ঠানে এখানে বরের নাম করা হয়।
৭. আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবরা একটি বড় আকারের (যা *খঞ্চা* নামে পরিচিত) কাঠের বা কোন ধাতব থালায় বিভিন্ন রকমের মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি সাজিয়ে বর ও কণেকে খাইয়ে যায়। সাধারণতঃ বিয়ের পূর্বরাতে বর ও কণেপক্ষ একে অপরের বাড়ীতে *খঞ্চা* প্রেরণ করে থাকে।
৮. বিয়েতে *"কবুল"* বা *"কলেমা'র* পর বরপক্ষ আনীত মিষ্টি (খাগড়াই, বাতাসা, মুড়কি ইত্যাদি) বিয়ে বাড়ীতে উপস্থিত সকলের মাঝে বিতরণ করে। রাজশাহী অঞ্চলে একে *'ওলিমা'* বলা হয়।
৯. ওয়াকিম আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৭৯।
১০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৩৯৮।
১১. আতব চাল ভিজিয়ে রেখে তার সাথে কুচিকুচি করে কাটা আদা ও কুশোরের গুড় মিশিয়ে '*আদাগুড়*' তৈরি করা হয়।
১২. '*দামাদ*' অর্থ বর।
১৩. *'আসগর আলী'* বরের কাল্পনিক নাম।
১৪. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৩।
১৫. সাধারণতঃ বরের ভগ্নীপতিগণকে *'কোলধরণী'* বলা হয়। *'কোলধরণী'* বরের সাহায্যকারী।
১৬. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৪।
১৭. খোদেজা খাতুন, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ১৬৩।
১৮. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৬।
১৯। শাহ আনিসুর রহমান, "বগুড়া জেলার বিয়ের লোকাচার ও মেয়েলীগীত", *পল্লব*, (জয়পুরহাট কলেজ বার্ষিকী), ১৯৬৪–৬৫, পৃঃ ৯।
২০. খোদেজা খাতুন, "পূর্ব পাকিস্তানের বিয়ের গান" *পরিক্রমা*, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬, পৃঃ ৪৫৩।
২১. ওয়াকিল আহমদ, *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২০৯।

চট্টগ্রামে দেওবন্দ আন্দোলন

আলী আহমদ

এক কালের হিন্দু প্রধান দেশ ভারতের ন্যায় হিন্দু-বৌদ্ধ অধ্যুষিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেও আরবীয় আড়ম্বরহীন ও সাদাসিধে ইসলামে যে অসংখ্য পরিবর্তনই সাধিত হয়েছে তা নয় বরং তাতে এক বৈচিত্রপূর্ণ রূপের ও সংযোজন ঘটেছে।[১] এতদঅঞ্চলের স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ দীর্ঘদিন ধরে আপোষহীন একত্ববাদী ইসলামের পরিপন্থী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাদের আদি পুরুষের বহু জনপ্রিয় ও অদ্ভুত রীতিনীতি, আচারানুষ্ঠান, বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দৈনন্দিন সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে পুনর্জীবিত করে তা নানাভাবে পালন করে আসছে।[২] এসব মনগড়া রীতিনীতি (রসম) ও আচারাদির অনুপ্রবেশের ফলে ইসলামের আসল রূপ অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গেছে। ইসলামী পরিভাষায় এগুলোকে বেদ'আত বলা হয়।৩ কুরআন ও হাদিসে এ সবের কোন সমর্থন মেলে না। পীর পূজা, মাজার পূজা, মহরমের জাঁকজমকপূর্ণ উল্লাস, মোল্লা-মিয়াজী কর্তৃক ফাতেহাদান, হিন্দু-বৌদ্ধ দেব-দেবীতে বিশ্বাস এবং জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অমুসলিম রীতিনীতি প্রভাবিত আচারানুষ্ঠানের পালন এ পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত এসব অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও আচারানুষ্ঠান দূরীকরণের লক্ষ্যে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংস্কারপন্থী আলেম ও তাঁদের সমর্থকগণ (সাধারণভাবে যারা 'ওহাবী' নামে পরিচিত) একটি সংস্কারধর্মী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।[৪] এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে কুসংস্কার ও বেদ'আত মুক্ত করা। চট্টগ্রামের এ শ্রেণীর সমাজ সংস্কারকগণ ও তাঁদের সমর্থকদের কর্মতৎপরতা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে তথ্যাদি উদঘাটিত হলে তা চট্টগ্রাম তথা এ অঞ্চলের সামাজিক ও বিংশ শতাব্দীয় বাংলার ইসলামী পুনর্জাগরনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ত বলে মনে করি। এই নিবন্ধে কিছু সংখ্যক স্থানীয় সংস্কারপন্থী আলেমের সাক্ষাৎকার এবং প্রাপ্ত অন্যান্য উৎসের আলোকে চট্টগ্রামের দেওবন্দী সংস্কারান্দোলনের উৎপত্তি, উদ্দেশ্য, বিকাশ এবং সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে তার প্রভাব তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

চট্টগ্রাম জেলার এই সংস্কারান্দোলনটিকে এখনো তার পূর্বের দু'টি সমধর্মী[৫] (আরবের নীতিনিষ্ঠ ও ভারতের ত্বরীকা-ই-মুহম্মদীয়া) আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে মূল্যায়ন করা হয়। তাছাড়া এই তিনটি আন্দোলনকেই 'ওহাবী আন্দোলন' এবং এদের অনুসারীদের 'ওহাবী' নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৬] তুর্কী ও বৃটিশ কর্মকর্তাগণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে আরবের নাজদ প্রদেশের শেখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের (১৭০৩-১৭৯২) সংস্কারান্দোলন কর্মসূচীকে 'ওহাবী মতবাদ' ও তাঁর অনুসারীদের 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭] যদিও এদের নিজ দেশে তারা কখনো এ

নামে অভিহিত হয়নি। শেখ হাফিজ ওহবা এ প্রসংঙ্গে তাঁর "What Actually is Wahhabism?" নিবন্ধে এ মর্মে উল্লেখ করেন যে, "বিরোধী প্রতিপক্ষ বরাবরই তাঁর সংস্কার কর্মসূচীকে মহানবী (সঃ) প্রবর্তিত পবিত্র ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী একটি নতুন ধর্মীয় মতবাদ বলে অপপ্রচার করে আসছে। অথচ এটি মানবজাতিকে অকৃত্রিম ও সাবলীল ইসলামের দিকেই আহ্বান করে এবং এর অনুসারীদের একমাত্র করণীয় কাজ হল ইসলামকে তার মহান প্রবর্তক ও বিখ্যাত খলিফাদের সময়কার সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা"। ওহবা আরো উল্লেখ করেন যে, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব কোন নবী ছিলেন না, বরং একজন সংস্কারক হিসেবে ইসলামের মূল আদর্শের দিকে তিনি জনগনকে আহ্বান জানিয়েছেন। আদর্শ প্রচারে ও মানুষের সাথে মেলামেশায় 'ওহাবীরা' অন্যান্য মুসলমানদের থেকে আলাদা কিছু নয়। মতাদর্শের বিচারে তারা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদেরই অনুসারী এবং পরবর্তীকালে প্রচলিত নয়া সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচারনুষ্ঠান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আদর্শগত ও সামাজিক রীতিনীতির দিক থেকে অধিকাংশ মুসলমানই ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।[৮] সম্ভবতঃ আরবের নাজদী 'ওহাবীদের' সাথে ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) ত্বরীকা-ই-মুহম্মদীয়া[৯] আন্দোলনের কিছু কিছু রাজনৈতিক[১০] ও সামাজিক মতাদর্শগত সাদৃষ্যের[১১] কারণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাঁদের লেখকগন, যেমন ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার এই বৃটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনকেও 'ভারতীয় ওহাবীবাদ' বলে আখ্যায়িত করে তার অনুসারীদের 'ওহাবী' বলে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অথচ আরবীয় নাজদী সংস্কারকগণ তাঁদেরকে মুয়াহিদুন[১২] ও ভারতীয়রা নিজেদেরকে মুহাম্মদী[১৩] (মুহম্মদের অনুসারী) বলেই পরিচয় দিতো। বৃটিশ ও তুর্কীদের অনুকরণে চট্টগ্রাম জেলার সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষিত এখানকার উদারপন্থী আলেম শ্রেণী[১৪] ও তাদের সুন্নী দাবিদার অনুসারীরাও জেলার বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকদেরকেও পূর্বেকার দু'টি অনুরূপ সংস্কারবাদী আন্দোলনের সমর্থকদের ন্যায় চট্টগ্রামী ওহাবী[১৫] নামে অপবাদ দিয়ে থাকে। চট্টগ্রামী সংস্কারপন্থীরা অবশ্য তাদেরকে দেওবন্দ ত্বরীকার সমর্থক ঘোষণা করে নিজেদেরকে দেওবন্দী বলেই পরিচয় দিয়ে আসছে।[১৬]

চট্টগ্রাম তথা সমগ্র পূর্ব বাংলার সাধারণ মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে একমাত্র প্রভাব বিস্তারকারী এই দেওবন্দ সংস্কারান্দোলনটির প্রধান উদ্যোক্তা হলেন চট্টগ্রাম জেলার হাট হাজারী থানার চারিয়া গ্রাম নিবাসী হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ (১৮৬৫-১৯৪৩) ওরফে বড় মৌলভী সাহেবের নেতৃত্বে কয়েকজন খ্যাতনামা আলেম।[১৭] এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল হাটহাজারী এবং এখানকার বিখ্যাত দার আল উলুম মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা (১৯০১) এর প্রারম্ভিক কর্মক্ষেত্র বিধায় তা হাটহাজারী কওমী সংস্কারান্দোলন'[১৮] নামেও পরিচিত। চট্টগ্রামের এই দেওবন্দ সংস্কারান্দোলনটির প্রতিষ্ঠাতাগণ শুধু যে ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ অবস্থিত বিশ্ববিশ্রুত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দার-আল-উলুম হতে শিক্ষা প্রাপ্ত

ছিলেন তা নয়, বরং তাঁরা তার নিষ্ঠাবান অনুসারীও ছিলেন।[১৯] এছাড়া তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর সেনানী হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবীর (রহঃ) (১৮৩২-১৮৮০) সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং দান আল-উলুম-দেওবন্দ মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্মিলিত কর্মতৎপরতার ফলে যে সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারান্দোলন[২০] গড়ে উঠে তার সরাসরি প্রভাবে প্রভাবিত। বাহ্যত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হলেও দার আল-উলুম দেওবন্দ ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রধান কেন্দ্র। 'আযহার-ই-হিন্দ'[২১] নামে পরিচিত ও অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই বৃহত্তম বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রত্যেক সংগঠক, পরিচালক, শিক্ষক ও ছাত্র গড়ে উঠেছেন এ অঞ্চলের মুসলমানদের শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক নবজাগরনের এক একজন সফল নিশান বরদার হিসাবে। দেওবন্দ প্রকৃতপক্ষে কোন নতুন আন্দোলন নয়। এটি মুঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) ইসলাস বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সারহিন্দির (১৫৬৩-১৬২৪) তীব্র প্রতিবাদ ও জিহাদী অনুপ্রেরণা, মুসলিম সমাজে শিরক, বেদ'আত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইমাম আল হিন্দ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর (১৭০৩-১৭৬২) ইসলাহী আন্দোলন এবং তদ্বীয় পুত্র হযরত শাহ আবদুল আজীজ মুহাদ্দিম দেহলবী (১৭৪৬-১৮২৪) ও তাঁর শিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের সংগ্রামের ফলশ্রুতি এবং এগুলি সফল করার এক মহান প্রচেষ্টা মাত্র।[২২]

দেওবন্দ ত্বরীকার সত্যিকার অনুসারী হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ ও তাঁর সমসাময়িক অভিজ্ঞ আলেম বর্গের দ্বারা পরিচালিত চট্টগ্রাম জেলার এই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারান্দোলন চট্টগ্রাম শহরের ১২ মাইল উত্তরে হাটহাজারীতে অবস্থিত বাংলার সর্বপ্রথম ও এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দার আল-উলুম মুঈনুল ইসলামকে (১৯০১) ইহার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিলেও জেলার নানাস্থানে তার আরো আনেকগুলো শাখা কেন্দ্র ও বিদ্যমান রয়েছে।[২৩] মাষ্টার আশরাফ আলী (১৮৭১-১৯৬১) প্রতিষ্ঠিত পটিয়া থানার কৈয়গ্রামে অবস্থিত মাদ্রাসা হেমায়েতুল ইসলাম (১৯০৭) দক্ষিণ চট্টগ্রামের সর্বপ্রথম বেসরকারী কওমী[২৪] শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হলেও পরবর্তীকালের বিখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আহমদ হাসান (১৮৮১-১৯৬৯) সাহেবের জিরির আল জামেয়াতুল আরবীয়াতুল ইসলামিয়া (১৯৩৭) মাদ্রাসা দু'টি বিভিন্নধর্মী উৎকর্ষতার দিক থেকে প্রথমটিকে অতিক্রম করে গেছে অনেকদূর।[২৫] প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারকারী বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতির এক বিরাট উৎসমূল বলে খ্যাত পটিয়া আল জামেয়াতুল ইসলামিয়া 'জমিরীয় কাসেম আল-উলুম কওমী মাদ্রাসাটি' নিছক কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় বরং ইসলামী জ্ঞানের একটি মিশ্র ভান্ডারও। বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত আরো অনেকগুলি বেসরকারী কওমী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাওলানা সুফী আজীজুর রহমান প্রতিষ্ঠিত নাজিরহাট আল জামেয়া আরাবীয়া নাছেরুল ইসলাম মাদ্রাসা (১৯১২); মাওলানা আবদুল হামিদ প্রতিষ্ঠিত ফতেপুর আল জামেয়া হামিদিয়া নাছেরুল্ল ইসলাম মাদ্রাসা (১৯১৭); মাওলানা শাহ মুহম্মদ হারুন প্রতিষ্ঠিত বাবুনগর আল জামেয়া ইসলামিয়া আজিজুল উলুম মাদ্রাসা (১৯২৪), মাওলানা সাঈদ আহমদ (১৮৮২-১৯৫৫) প্রতিষ্ঠিত চারিয়া কাসেম আল-উলুম মাদ্রাসা (১৯৪৫); মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা ফয়জুল্লাহ (১৮৯২-১৯৭৬) সাহেবের পূর্ব (মখল মাদ্রাসা-ই-হামি-উস-সুন্নাহ (১৯৪৮) এবং খতীবে আযম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেবের বরইতলী (চকরিয়া) মাদ্রাসা-ই-ফযজুল উলুম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেওবন্দ সংস্কারান্দোলনের কেন্দ্ররূপে পরিচালিত এসব কওমী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ[২৬] নিম্নরূপঃ-

১। এমন এক দল লোক তৈরি করা যাঁরা তাঁদের লেখা ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ইসলামের ব্যাপক প্রচার, প্রসার ও মহানবী (সঃ) নির্দেশিত পথ ও প্রথাকে নিজেদের জীবনে সফলভাবে বাস্তবায়িত করবে;

২। কুর'আন, হাদিস, ইসলামিক ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া, প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের কাছে ইসলামের নানাবিধ তথ্য পৌঁছে দেওয়া এবং আত্মিক আদেশ, উপদেশ এবং প্রচারের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা;

৩। ইসলাম ধর্মের মূল কাজ এবং তার রীতিনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এর চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট করানো;

৪। সরকারী প্রভাবমুক্ত থেকে জ্ঞানের স্বাতন্ত্র বজায় রাখা এবং

৫। আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের ত্বরীকা, হানাফী মাযহাব, হযরত মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর আদর্শ এবং দার আল-উলুম দেওবন্দের মূলনীতি[২৭] সমূহ বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিভিন্নস্থানে ব্যাপক হারে কওমী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং শেষোক্তটির (দার আল-উলুম) সাথে সম্পৃক্ততা বজায় রাখা।

মুসলিম সমাজকে বেদ'আত ও শিরক মুক্ত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের দেওবন্দী সংস্কারকগণ বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে জেলায় এক ব্যাপক সংস্কারন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা যে শুধু সমাজে প্রচলিত অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ক করেছেন তা নয়, উপরন্তু তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত অপ্রয়োজনীয় ও অপব্যয়ী সকল প্রকার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির বিরোধিতাও করে আসছেন। রসুলকে (সঃ) নিয়ে যে কোন প্রকার অভিনব রীতি বা প্রথা যেমন, মীলাদ শরীফে কিয়াম[২৮] করা, তাঁকে গায়েবী ইলমের

মালিক বলে বিশ্বাস করা, মীলাদ মাহ্‌ফিলে দলবদ্ধভাবে উচ্চশব্দে সুর মিলিয়ে গজল সহযোগে দরুদ শরীফ পাঠ করা, আযানের পূর্বে ছালাতু-ছালাম[২৯] ও উচ্চস্বরে ছালাতুন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) ..... আলাইকুম[৩০] পড়ার তাঁরা বরাবরই বিরোধী। এছাড়া তাদের মতে ইবাদত-ই-মকছুদা[৩১] (পরকাল সম্পর্কিত ও সাওয়ারের উদ্দেশ্যে) যেমন জানাযা, যিয়ারত, তারাবীহ, ঘরে বা কবর পাড়ে কুরআন পাঠের বিনিময়ে টাকা পয়সা বা উপহার দেওয়া-নেওয়ার রীতি বেদ'আতী কাজ। প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর ইমামের সাথে হাত উঠিয়ে 'আমীন আমীন' বলে মুনাজাত (স্থানীয় মতে আখেরী মুনাজাত) করাকে তাঁরা আল্লাহর হুকুম বা রসুলের (সঃ) সুন্নত কোনটাই মনে করেন না, কারণ পবিত্র কুরআনের বিরাশি জায়গায় আল্লাহর পক্ষ হতে নামায কায়েমের তাগিদ এসেছে অথচ কোথাও মুনাজাতের কথা বলা হয়নি।[৩২]

দেওবন্দী সংস্কারপন্থীদের সংস্কারমূলক কর্মতৎপরতা 'সুন্নী'বলে পরিচিত মুসলিম সমাজের উদারপন্থী শ্রেণী কর্তৃক বরাবরই সমালোচিত হয়ে আসছে। নানা জাতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যাবলীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি উদারপন্থীদের সবচেয়ে বেশি আপত্তির উদ্রেক করেঃ-

ক) আরবী, ফার্সী, উর্দু বা বাংলা গজল সহকারে মীলাদে কিয়াম ও উচ্চস্বরে একত্রে সুর মিলিয়ে দরুদ শরীফ না পড়া;

খ) রসুলকে (সঃ) গায়েবী ইলমের মালিক মনে না করা;

গ) পীরবাদ ও পীরের মাজারে ওরস-মানতে সংস্কারপন্থীদের নিরুৎসাহ;

ঘ) ঐতিহ্যগত কায়দায় ফাতেহা দেওয়ার রীতি, নতুন কবর তলকীন করা এবং মুসলমানদের মরনোত্তর আচারানুষ্ঠানের প্রতি তাদের অনীহা;

ঙ) ইবাদতে মকছুদার বিনিময়ে নগদ বা উপহার হিসাবে কোন কিছু দেওয়া নেওয়ার রীতিতে তাদের বিরোধিতা;

চ) নামায ও জামায়াতের অংগ এবং আল্লাহর হুকুম মনে করে নামাযের ভেতর ও নামাযান্তে আবশ্যিক মনে করে একত্রে দু'হাত উত্তোলন করে মুনাজাত না করা এবং

ছ) রসুলের (সঃ) জন্মবার্ষিকী ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানদিতে ঘটা করে মীলাদের আয়োজন না করা।

দেওবন্দী সংস্কারপন্থীদের কর্মতৎপরতা শুরু পর থেকে জেলার নানাস্থানে তাদের সাথে উদারপন্থীদের মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা ও রীতিনীতি নিয়ে অসংখ্য বাদানুবাদ, উত্তেজনা এমনকি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটে যায়।[৩৩] এসব বিষয় নিয়ে দু'পক্ষের মুখপত্রের নেতৃত্বাধীনে তাদের মধ্যে বেশ কিছু উত্তেজনাপূর্ণ তর্কসভা (বহস)[৩৪] সংঘটিত হওয়ার কাহিনী লোকমুখে অদ্যাবধি শুনা যায়। দু'পক্ষের এই মতবিরোধ এখনো এ এলাকার একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে টিকে আছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি অনুসারে, চট্টগ্রামের দেওবন্দী সংস্কারকগণ মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন। দেওবন্দী ত্বরীকা

তথা তার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত তাঁদের এই নীতিনিষ্ঠ সংস্কারান্দোলনের মতাদর্শগুলি এখানকার মুসলিম সমাজকে শুধু যে তার যুগ যুগ ব্যাপী প্রচলিত অনৈসলামিক কার্যকলাপ থেকে মুক্তই করেছে তা নয়, বরং অসংখ্য অপব্যয়ী ও আড়ম্বরপ্রিয় সামাজিক রীতিনীতি ও বাহ্যিক লৌকিকতার বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষাও করেছে। শিরক ও বেদ'আতের পাপে অবগাহিত আচারনিষ্ঠ এ এলাকার মুসলমানদের এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সংস্কারপন্থীদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের সাদাসিধে ও পবিত্র জীবনের আস্বাদ লাভে সমর্থ হয়েছে। জেলার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী কওমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই আন্দোলনের বৈপ্লবিক প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। সমাজে এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধর্মীয় ও নৈতিক অবদান যেমনি মূল্যায়িত হয়েছে, ইসলামী সমাজের পুনগঠনে ও ইসলামী মূল্যবোধের উত্তোরনে এসবের উদ্যোক্তাদের ভূমিকাও তেমনি প্রশংসিত হয়েছে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। A. H. Dani, "Evolution of the Bengali Muslim Society" in *Bengali Literary Review*, Karachi, 1958, pp.7-10.

২। Jagadish Narayan Sarkar. *Islam in Bengal* (Calcutta. Patna Prakashani, 1972), p. 28

৩। কাজী ওবায়দুল রহমান, *দেওবন্দীগনের আকিদা* (চট্টগ্রামঃ আঞ্জুমানে এহইয়াউছুন্নাহ, ১৯৫৮), পৃঃ২৫।

৪। আবদুল হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি* (চট্টগ্রামঃ জোবাইদা বানু চৌধুরী, ১৯৮০), পৃঃ ২২।

৫। Muin-ud-Din Ahmed Khan, "Research in the Islamic Revivalism of the 19th Century and its effect on the Muslim Society of Bangal" in Pierre Bessaignet, ed. *Social Research in East Pakistan Dhaka*: Asiatic Society of Pakistan, 1960, pp. 44-47.

৬। আবদুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন* (ঢাকা; আহমদ পাবলিকেশন হাউস, ১৯৬৯), পৃঃ ১১৬।

৭। A. R. Mallik, *British Policy and the Muslims in Bengal*, 1757-1856 (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 107;
Muhammad Abdul Bari, "The Early Wahhabism and the Sharifs of Mahkah," *JPHS*, vol. 3, pt. 11, 1955, p. 91.

৮। Sir Sheikh Hafiz *Wahbs*, "What Actually is wahhabism"?
The Islamic Review, vol. xxxvii, December-1949, p.15.

৯। Qeyamuddin Ahmad, *The wahabi Movement in India* (Calcutta: FIRMA K. L. Mukhopadhyay, 1966), pp. 9-18;
Muin- ud- Din Ahmad Khan, *Selections from Bengal Government Records on wahhabi Trials* (1863-1870) (Dhaka: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p.3.

১০। আরব 'ওহাবীগন' দূর্নীতিবাজ তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং মক্কা অবরোধের পর সেখানকার জনগনকে তাদের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহনে বাধ্য করেছে, অন্যদিকে ভারতীয় 'ওহাবীরাও' একইভাবে শিখদের বিরুদ্ধে অস্ত্রহাতে নিয়েছে এবং পেশোয়ার দখলের পর সেখানে

তাদের পছন্দমত একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পরিকল্পনা করেছে। উভয় আন্দোলন শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের এই অস্ত্র ধারণকে জিহাদ বলে ঘোষণাও দিয়েছে। দ্রষ্টব্যঃ A. R. Mallik, *op. cit.*, p.107

১১। দুটি আন্দোলনের কিছু মতাদর্শগত সাদৃশ্যের সার সংক্ষেপ নিম্নে দেখানো হলঃ-

ক) উভয় আন্দোলনই হাম্বলী মাযহারের বিখ্যাত ইমাম হযরত তকী-উদ-দীন ইবনে তাইমিয়ার (১২৬৩-১৩২৮) নীতিনিষ্ঠ ইসলামী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত;

খ) উভয় মতাদর্শই কোন পীর বর্তার মাজারে নজরানা দেওয়া, ইহা আলোকিত করা বা পূজা করাকে নিঃসন্দেহেই ইসলাম বিরুদ্ধে কাজ মনে করে;

গ) নামাযের ভেতর কোন নবী, ওয়ালী বা ফেরেস্তার নামোচ্ছারন উভয় মতাদর্শের কাছেই অত্যন্ত গর্হিত (শিরক) কাজ;

ঘ) উভয় মতাদর্শই শুধু ঈদুল ফেতর, ঈদুল আযহা, আশুরা ও লাইলাতুল কদর উদযাপন করে থাকে। তবে যে কোন ধর্মীয় উৎসবে মিলাদ ও কেয়াম পড়ার তারা বিরোধী;

ঙ) উভয় মতাবাদ ই এ বিষয়ে একমত যে, শুধুমত্র হযরত মুহম্মদ (সঃ) ই একমাত্র শেষ বিচারের দিনে তাঁর উম্মতের সুপারিশের জন্য আল্লাহর অনুমতি পাবেন;

চ) উভয় মতবাদই আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই নাম আংগুলের দাগে গোনার পক্ষপাতি (তজবীহতে নহে), দেখুন, Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Selhi: Cosmo, 1977), p. 661; M. A. Khan, "The Islamic Reform Movements in Bengal in the 19th Century: Meaning and Significance" Refiuddin Ahmad (ed), *Islam in Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh Itihas Samity, 1984), p. 100.

১২। Thomas Patrick Hughes, *op. cit.*, p. 661.

১৩। M. A. Khan, *Selections*, *op. cit.*, p. 3.

১৪। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে মাওলানা আজিজুল হক, ওরফে 'শেরে বাংলা', মাওলানা নুরুল ইসলাম হাশেমী, মাওলানা ওবায়দুল হব নঈমী ও মাওলানা জালাল উদ্দিন আহমদ, পেশ ইমাম জামিয়াতুল ফালাহ, চট্টগ্রাম।

১৫। সংস্কারপন্থীদের প্রতি নিন্দাবাদ জ্ঞাপনার্থে ব্যবহৃত এই 'ওহাবী' শব্দটির বহুল অপ-প্রচার পাক আমলের প্রথম দিক হতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। দ্রষ্টব্যঃ Ali Ahmad, *The Muslims of Chittagong. 1858-1931: A Socio-Cultural study* (Chittagong University: Unpub. ph. D. Thesis, 1987), p. 106; মাওলানা নজীর আহমদ, ওহাবীর ইতিহাস (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, ১৯৫০), পৃঃ ৬-১১; ফজলুল করিম '*ওহাবী কাহারা*'? (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, হাটহাজারী, ১৯৩৫), পৃঃ ১৮ এবং কাজী ওবায়দুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩।

১৬। কাজী ওবায়দুল রহমান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪।

১৭। আলেমগণ হলেনঃ (ক) হাটহাজারী উপজেলার মাদার্শা নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল হামিদ (১৮৬৯-১৯২০); (খ) খরণদ্বীপের হাওলা নিবাসী হযরত মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ (১৮৫০-১৯০৫), (গ) ফটিকছড়ি উপজেলার বাবুনগরের হযরত মাওলানা সুফী আজীজুর রহমান (১৮৬২-১৯২০) এবং (ঘ) একই উপজেলার সোয়াবিল এলাকার হযরত মাওলানা জমির উদ্দিন (১৮৭৮-১৯৪০)। দ্রষ্টব্যঃ বাণী-ই-দার-আল উলুম মঈনুল ইসলাম (পান্ডুলিপি)ঃ মাওলানা ফয়েজ

আহমদ, তযকেরায়ে জমীর (চট্টগ্রাম; আঞ্জুমানে এসলাহুজ্জমীর, ১৯৫৬), পৃঃ ৫ এবং আবদুর রহমান হামী, *জীবন চরিত্র কবিতা* (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৯৮০), পৃঃ ১৫।

১৮। শাহ আহমদ হাছান (হাফেজ আহম্মদ উল্লাহ সম্পাদিত), *মশায়েখে চাটগ্রাম* (চট্টগ্রামঃ জিরি ইসলামিয়া মাদ্রাসা, ১৯৮৮), পৃঃ ৭; মুহম্মদ এনামুল হক, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম* (ঢাকাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৪৮), পৃঃ ১৫০, আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে* (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৯৭৭), পৃঃ ২৬-২৯, আবদুল হক চৌধুরী চট্টগ্রামের সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২২ এবং *BDG-Chittagong* (1975), পৃঃ 133.

১৯। Sayyid Mahboob Rizvi: *History of Dar al-Ulum*, vol.1 (Eng. tr. by Murtaza Hasain F. Quraishi), India (Daral Ulum, Deoband); Idara-e-Ihtemam, 1980),p.118;
ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), পৃঃ ১৫, মহি উদ্দিন খান ও মুহম্মদ শফিউল্লাহ, *হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী* (ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৬২), পৃঃ ৩১ এবং আবদুল জলিল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ* (ঢাকাঃ ইসলামী গবেষনা কেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃঃ ১২১।

২০। ভারতীয় মুসলমানদের একটি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন যা মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত দার-আল-উলুম দেওবন্দকে ইহার কর্মতৎপরতার প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসাবে বেছে নেয়, স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় হচ্ছে অনুরূপ আর একটি প্রতিষ্ঠান যা তাদের (মুসলমানদের) সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। প্রথম দলটি বৃটিশ জাতিকে চিরশত্রু মনে করে তাদের সাথে অসহযোগিতার পথ বেছে নিয়ে দার আল-উলুম দেওবন্দকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে একটি বৃটিশ বিরোধী চক্র। অপরপক্ষে দ্বিতীয় মঞ্চটি ভারতীয় হিন্দুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষনের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারন করে স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় মোহামেডান অ্যাংগ্লো ইন্ডিয়ান স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে একটি বৃটিশ সহযোগী চক্র। বৃটিশদের সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলমানগণ হয়ে পড়ে এভাবে দ্বিধা বিভক্ত। দ্রষ্টব্যঃ আবদুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ ২২১।

২১। Sayyid Mahboob Rizvi: *op. cit.*, p.118.

২২। A. K. Nizami (S. T. Lakhanwalla ed), *Socio-religious Movements in Indian Islam* (1763-1898) Simla: Indian Institate of Advanced Study, 1971), pp. 107-8.

২৩। বৃহত্তর চট্টগ্রামের কওমী মাদ্রাসা সমূহের নামের একটি তালিকা বর্তমান প্রবন্ধকারের নিকট সংরক্ষিত আছে।

২৪। সরকারী প্রভাব ও সাহায্যমুক্ত এবং শুধুমাত্র মুসলিম কওমের (সম্প্রদায়ের) অর্থানুকুল্যে ও সহযোগিতায় পরিচালিত হয় বিধায় এগুলি কওমী মাদ্রাসা নামে পরিচিত।

২৫। "Al- Jameatul Islamia and its Malti-Lateral Activities", Patiya, Chittagong. *বিদায় স্মরনিকা*, আল জামেয়াতুল আরাবীয়াতুল ইসলামিয়া জিরি, চট্টগ্রাম, ১৯৮৬ এবং প্রাচীনতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা হেমায়েতুল ইসলাম, কৈয়গ্রাম, পটিয়া চট্টগ্রাম, ১৪০৬ হিজরী।

২৬। Sayyid Mahboob Rizvi: *op. cit.*, p.108; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫; আবদুল জলীল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪৫ এবং আল বিদা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৪-৮৫, পৃঃ ১-৮।

২৭। দার আল-উলুম দেওবন্দের মূলনীতিসমূহ (উসুল-ই-হাশতগানা) নিম্নরূপঃ-

(১) কওমী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীদিগকে ইহার চাঁদা ও সঞ্চিত অর্থের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে;

(২) মাদ্রাসার ছাত্রদের খাদ্য যোগানের ব্যাপারেও শুভানুধ্যায়ীদের যথাসম্ভব চেষ্টা করতে হবে;

(৩) মাদ্রাসার পরামর্শদাতাগণকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ইহার উৎকর্ষতা ও সমৃদ্ধির বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বিমতের অবকাশ থাকতে পারবে না;

(৪) মাদ্রাসার শিক্ষক ও পরিচালকমন্ডলীর সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব অপরিহার্য। এখানে কেউ নিজকে যেমন নিম্নতর মনে করা ঠিক নয় তেমনি আবার উৎকৃষ্টতর ভাবারও কোন অবকাশ নেই। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আল্লাহ না করুন ইহার ধ্বংস অনিবার্য;

(৫) পূর্ব নির্ধারিত পাঠক্রম অবশ্যই শেষ করতে হবে;

(৬) এসব প্রতিষ্ঠানের কোন নিয়মিত আয়ের উৎস না থাকলেও আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসের ফলে আল্লাহই তার ব্যবস্থা করে দেবেন;

(৭) সরকার বা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হবে এবং

(৮) শর্তহীন দানই হচ্ছে এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উন্নতিও টিকে থাকার প্রধান সহায়। দেখুন, Sayyid Mahboob Rizvi: *op. cit.*, p.108; এবং *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, পৃঃ ১৫।

২৮। শাহ আবদুল হাই চৌধুরী, ছহীহ মীলাদে মোস্তফা (চট্টগ্রাম; ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৩৯৭ হিঃ), পৃঃ ৮-১১৮ এবং Muin- ud- Din Ahmad Khan,"*The Islamic Reform*", *op. cit*, p. 109.

২৯। ফরীদ আহমদ আনসারী, *আযানের পূর্বে ছালাতুচ্ছালাম* (চট্টগ্রামঃ পটিয়া, ১৯৮৬), পৃঃ ১২-১৩।

৩০। "ছালাতুন ইয়া রাসুলুল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবিবুল্লাহ আলাইকুম",
(পটিয়ার শিকলাবাহার সুফী আহছানউল্লাহ সাহেব ১৯৩০ সনের দিকে দুই পক্তির এই রসুল (সঃ) প্রশস্তিটি রচনা করেছেন বলে প্রকাশ।)

৩১। হাবিবুল্লাহ (সম্পাদিত), *তোহফাতুল মোমেনীন* (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৯৮০), পৃঃ ৭-১০।

৩২। মোহাম্মদ ইউসুফ ইসলামবাদী (সম্পাদিত), *মুনাজাত সম্বন্ধে অভিমত* (চট্টগ্রামঃ ফয়জিয়া কুতুবখানা, ১৯৭৮), পৃঃ ৯ এবং আবু সালেহ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদিত), *মুনাজাতের স্বরূপ* (চট্টগ্রামঃ আঞ্জুমানে এহইয়াছুন্নাহ), পৃঃ ১২।

৩৩। উদাহরণস্বরূপ ১৯৫৬ সালে 'মুন্নী' বলে কথিত একদল দুস্কৃতিকারী কর্তৃক পটিয়া আল জামেয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আগুন লাগানো এবং ইহার অসংখ্য বই, দলিল ও আসবাবপত্রাদি পুড়ে ছাই করে ফেলা এবং ১৯৮০ সালে জিরি ইসলামিয়া মাদ্রাসায় আক্রমণ চালানোর ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সম্ভবতঃ উল্লেখিত ঘটনার জের হিসাবেই ১৯৮৫ সালে হাটহাজারীর মেখল গ্রামে মাওলানা নুরুল ইসলাম হাসেমীর ওয়াজি মাহফিলে ও এমনি ধরণের এক আক্রমণ চালানো হয়। এসব

ঘটনায় জেবাল হোসেন ও রফিক আহমদ নামের দু'জন তরুণকে অকালে প্রান দিতে হয়। দ্রষ্টব্যঃ *Al- Jameatul Islamia, op. cit.*, p-5.

৩৪। নতুনত্ববাদী ও ঐতিহ্যবাদী (সংস্কারপন্থী) পক্ষের বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ আলেমের সৌজন্যে প্রাপ্ত কয়েকটি তর্ক--সভার (বহস) পক্ষ, স্থান, কাল, ও আলোচ্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল–

নতুনত্ববাদী	ঐতিহ্যবাদী (সংস্কারপন্থী)	স্থান	কাল	আলোচ্যে বিষয়
মাওলানা সৈয়দ আবদুল হামিদ বাগদাদী, পেশ ইমাম, চট্টগ্রাম জামে মসজিদ	মাওলানা আবদুল হামিদ	মুর আলী মিরার হাট	১৯৩৪	শিরক-বেদআত মিলাদ, কেয়াম, ওরস, মানত, ফাতেহা, তলকীন ইত্যাদি প্রশ্নে
মাওলানা আজিজুল হক (১৯০৪-১৯৬৯) প্রকাশ 'শের-ই-বাংলা'	মাওলানা জমির উদ-দীন	কাঞ্চনের হাট	১৯৩৮	ঐ
ঐ	মাওলানা মুহম্মদ ইসমাইল	ইসলামিয়া হাট	১৯৪৫	ঐ
ঐ	মাওলানা সিদ্দিক আহমদ	বন্দরন বাজার	১৯৩১	ঐ
ঐ	ঐ	ফতেয়াবাদ হাইস্কুল মাঠ	১৯৪০	ঐ
ঐ	ঐ	নানুপুর	১৯৪৬	ঐ
ঐ	ঐ	বাঁশখালী	১৯৪৮	ঐ
ঐ	মাওলানা মেহেরুজ্জামান	নিশ্চিন্তপুর	১৯৪৭	ঐ
ঐ	মাওলানা কবির আহমদ	রাজানগর	১৯৪৭	ঐ
ঐ	মাওলানা মুফতি আজিজুল হক	বটতলী	১৯৫৩	ঐ
ভারত হইতে আগত একজন মাওলানা পীর সাহেব	মাওলানা আবদুল হামিদ	খন্দকিয়া	-	ঐ
ঐ	ঐ	জিরি	-	ঐ
ঐ	ঐ	কাটিখালি	-	ঐ
মাওলানা মহিউদ্দিন বোখারী পেশ ইমাম, চট্টগ্রাম জামে মসজিদ	ঐ	মুরাদপার	-	ঐ
মাওলানা রাগেবুল্লাহ	মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ	বৈলতলী	-	ঐ
মাওলানা আনছারুল্লাহ	ঐ	ধরদ্বীপ	-	ঐ

দ্রষ্টব্যঃ Ali Ahmad, *The Muslims of Chittagong*, op. cit., pp. 104-5.

বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থার নিয়ম ও অনিয়মঃ ১৯৯২ সালের গণ-পদোন্নতির একটি পর্যালোচনা

নাজনীন ইসলাম

ভূমিকা

আমলাতন্ত্র হচ্ছে ব্যাপক আলোচিত, সমালোচিত এবং বহু বিতর্কিত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে আমরা এর বিরুদ্ধে যা-ই বলি না কেন এর উপযোগিতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এটা বিশেষ করে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য সত্যি। এখানে আমলাতন্ত্র অনেক সময় জনগণের মা-বাপ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশে আমলাতন্ত্রকে এবং লোক প্রশাসনকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। এখানে সরকারের পরিধি ব্যাপক, জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের জীবনের প্রতিটি দিককে (নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি) স্পর্শ করে। এইসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রশাসনকে নিশ্চিত করতে হয় দক্ষতা, কার্যকারিতা ও মিতব্যয়িতা, যার জন্য প্রয়োজন হয় আবার দক্ষ লোক নিয়োগ এবং এমনভাবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রন যাতে সংগঠনের উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তির চাহিদা উভয়ই অর্জন করা সম্ভব হয়, অনুসরণ করতে হয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, জনগণ ও কর্মীদের মানসিকতা উপলব্ধি, রাজনীতি ও বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান। তার অর্থ হচ্ছে দক্ষ প্রশাসক হওয়ার জন্য প্রয়োজন অসাধারণ মেধা, আন্তরিকতা ও সততা। আমলাতন্ত্র ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। যদিও বলা হয় যে, নীতি প্রণয়নে আমলাতন্ত্রের কোন ভূমিকা নেই, তাদের প্রধান কাজ হচ্ছে সাফল্যজনকভাবে লোকনীতি বাস্তবায়ন করা কিন্তু বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তৃতীয় বিশ্বে, শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাব, দক্ষ আমলাতন্ত্র, স্বার্থ গোষ্ঠীর জন্ম, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা, দান নির্ভরশীলতা প্রভৃতি কারণে আমলাতন্ত্র অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজের সর্বস্তরে তাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে আমলাতন্ত্র ছাড়া সরকারী প্রশাসন চালানো অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাই আমলাতন্ত্র যাতে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন রকম উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে, পদোন্নতি এদের অন্যতম। এই আলোচনার উদ্দেশ্য বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখানে পদোন্নতি কি, এর প্রয়োজনীয়তা, ভিত্তি, বাংলাদেশের পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রকৃতি আলোচনা করা হবে। বি.এন.পি. সরকার কর্তৃক ১৯৯২ সালে প্রদত্ত গণ-পদোন্নতির বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে পদোন্নতি ব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে সম্পূর্ণ আলোচনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে তাত্বিক আলোচনা,

দ্বিতীয় অংশে ১৯৯২ সালের গণ–পদোন্নতি এবং তৃতীয় অংশে পদোন্নতির সমস্যা এবং এর জন্য সুপারিশ।

ক) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাধারণভাবে বলা যায় যে, পদোন্নতি হচ্ছে চাকুরীর একটি ধাপ থেকে অন্য একটি ধাপে উত্তরণ। মূলতঃ সততা, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার পুরষ্কার হিসাবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সরকারী ও বেসরকারী সকল শ্রেণীর কর্সচারীকে এক পদ থেকে অন্য পদে উত্তরণ ও অধিকতর ক্ষমতা, দায়িত্ব ও বেতনের পদে উন্নীত করার নামই পদোন্নতি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, শুধু বেতন বৃদ্ধিই নয়, এর সাথে কর্মীর দায়িত্ব, সাংগঠনিক ও সামাজিক পদমর্যদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বাড়ে।[১] সুতরাং পদোন্নতি হচ্ছে কর্মীর–

১। পদমর্যাদা বৃদ্ধি, ২। দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি, এবং ৩। পারিশ্রমিক ও সুবিধা বৃদ্ধি।

পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তাঃ

কর্মচারী প্রশাসনে পদোন্নতির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দীর্ঘদিন চাকুরীর একটি স্তরে নিয়োজিত থাকলে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা, একঘেয়েমীর সৃষ্টি হয়। ফলে কর্মীদের দক্ষতা হ্রাস পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পদোন্নতি কর্মীদের কর্মে উৎসাহী ও উদ্যোগী করে। প্রশাসনের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পন্ন যোগ্য কর্মী যা পদোন্নতির মূল ভিত্তি। পদোন্নতির মাধ্যমে যেহেতু প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে যোগ্য, দক্ষ ও উপযুক্তকর্মী পাওয়া যায় সেহেতু নির্বাচন ও নিয়োগ সহজতর হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ দানের কাজও অনেক সহজতর হয়। পদোন্নতি উপযুক্ত ক্ষেত্রে যোগ্য, মেধাবী ও বুদ্ধিমান কর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করে। প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকলে কর্মীরা নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে পারে, ফলে তাদের কর্মদক্ষতা, নৈপুন্য ও প্রেষণা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নিজেদের প্রতিভার যথার্থ বিকাশ ঘটাতে পারে।

পদোন্নতির ভিত্তি

পদোন্নতির ক্ষেত্রে তিনটি মানদন্ড/ ভিত্তি অনুসরণ করা হয়।

১। জ্যেষ্ঠত্বঃ এই নীতি অনুযায়ী যোগ্যতা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠত্বের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানে কর্মীর স্থিতিকাল। এর সাহায্যে সংগঠনের অভ্যন্তর থেকে সবচেয়ে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

২। মেধাঃ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই মেধা ও গুণের প্রাধান্য রয়েছে। তাই কর্মচারীদের পদোন্নতি ক্ষেত্রে এই নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতিতে পদোন্নতি মূলতঃ নির্ধারণ করা হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিশেষ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা, দৈহিক ও মানসিক উন্নত অবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে।

৩। মেধা ও জ্যেষ্ঠত্বঃ পদোন্নতির জন্য জ্যেষ্ঠত্ব ও মেধা উভয় নীতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। তাই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পদোন্নতির জন্য যে কোন একটিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না। সর্বাপেক্ষা বেশী ফলপ্রসু পদ্ধতি হচ্ছে কর্মীদের জ্যেষ্ঠত্ব ও মেধা দু'টি দিককেই বিবেচনা করে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা যাতে উভয় নীতি অনুসারে সর্বাপেক্ষা যোগ্য প্রার্থী বাছাই করা যায়।

বাংলাদেশের লোক প্রশাসনে পদোন্নতি বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে–

১। একই ক্যাডারের নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদ;

২। ক্যাডার বহির্ভূত চাকুরীর নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদে;

৩। নিম্ন শ্রেণীর চাকুরী থেকে উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীতে;

৪। একই শ্রেণীর চাকুরীর নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদে;

কর্মচারী ও সংস্থাপন ম্যানুয়াল অনুযায়ী বাংলাদেশে পদোন্নতির ভিত্তি হবে নিম্নরূপ–

১। নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদে, যেমন–দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ থেকে প্রথম শ্রেণীর পদে অথবা তৃতীয় শ্রেণীর পদ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে পদোন্নতির জন্য মেধা ও জ্যেষ্ঠত্ব হবে ভিত্তি। কিন্তু মেধার উপর বেশী জোর দেওয়া হবে।

২। একই শ্রেণীর চাকুরীতে পদোন্নতির জন্য বিভাগ 'পদোন্নতি পদ' ও সিলেকশন পদ' এর মধ্যে পার্থক্য করবে। 'পদোন্নতি পদের' জন্য ভিত্তি হবে জ্যেষ্ঠত্ব সহ উপযুক্ততা এবং 'সিলেকশন পদের' ভিত্তি হবে মেধা। কিন্তু জ্যেষ্ঠত্বকেও বিবেচনা করা হবে।

৩। পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকুরীর তথ্য (Service Record), যেমন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, ক্রম বিন্যাস তালিকা ইত্যাদি বিবেচনা করা হবে। কারো যদি অসন্তোষজনক তথ্য (Record) থাকে তবে সে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

৪। নন–গেজেটেড থেকে গেজেটেড পদে এবং নিম্ন শ্রেণীর পদ থেকে উচ্চ শ্রেণীর পদে পদোন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা অধিদপ্তরকে বাংলাদেশ কর্ম কমিশনের সাথে আলোচনা করতে হবে।

৫। যে সমস্ত পদোন্নতি ও নিয়োগের ব্যাপারে অধিদপ্তরকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে সমস্ত ব্যাপারে অধিদপ্তর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি কর্ম কমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তবে কর্ম কমিশনের সাথে যদি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত না হয়, তবে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের জন্য অধিদপ্তর সরকার প্রধানের নিকট পাঠাতে পারবে।

৬। অদক্ষ প্রমাণিত হলেই কেবল জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা দ্বারা অতিক্রম করা যাবে।

৭। বিভাগীয় মামলা থাকলে কাউকে পদোন্নতি দেয়া যাবে না।

৮। উপ-সচিব ও যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতি দেয়ার ব্যাপারে একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই হবে চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

৯। মেধা যাচাই করা হবে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

১০। যোগ্যতা ও মেধার উপর ভিত্তি করে সকলকে পদোন্নতির সমান সুযোগ প্রদান করা হবে।

১১। পদোন্নতির পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/মন্ত্রণালয়/অফিসকে বিদ্যমান কমিটি/বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহঃ

আমাদের দেশে পদোন্নতির জন্য কোন নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব নেই। এক একটি ক্যাডারের জন্য এক একটি কর্তৃত্ব কাজ করে। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ লাভের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কমিটি বা বোর্ড সমূহের সুপারিশ অপরিহার্য। পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কর্ম কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যে সকল ক্ষেত্রে কর্ম কমিশনের পরামর্শই দরকার সেখানে যে পদোন্নতি পাবে তার নাম, গোপনীয় প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য কমিশনের বিবেচনা, নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। অতঃপর কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পর প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় আদেশ দান করে। পুনঃ বিবেচনার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

পদোন্নতি সংক্রান্ত যে সমস্ত কাজ কমিশন করে তা হলোঃ-

১। কমিশন নীতিমালার আওতাধীন থেকে সরকারী কর্মীদের এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে পদোন্নতির বিষয়টি পরিচালনা করে।

২। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও কাগজপত্র, গোপনীয় প্রতিবেদন, ক্রমবিন্যাস তালিকা ইত্যাদি পরীক্ষা করে।

৩। প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই ও উপযুক্ততা যাচাই করে।

৪। একই শ্রেণীভুক্ত কোন খালি পদ পূরণের জন্য পদোন্নতির ব্যবস্থা করে।

কমিশনের আওতা বহির্ভূত বিষয়গুলি নিম্ন লিখিত বোর্ড/কমিটি সমূহ দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা হয়।[৩]

১। উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরী কাঠামো বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদ কমিটি (Council Committee On Senior Appointment, Promotion and Service Structure): যুগ্ম সচিব ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের পদে এবং বিভাগ/স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থা, কর্পোরেশন এর প্রধানের পদে পদোন্নতির বিষয়টি এই কমিটি বিবেচনা করে। তবে এই কমিটির নিকট বিষয়টি উর্ধ্বতন নিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন

করতে হয়। এই কমিটি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে ইহার সুপারিশ রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করে।

২। ক) উর্ধ্বতন নিয়োগ বোর্ড (Superior Selection Board)ঃ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল ক্যাডারভুক্ত ও ক্যাডার বহির্ভূত সরকারী কর্মকর্তার এবং স্ব-শাসিত সংস্থায় স্থায়ীভাবে বদলীকৃত/প্রেষণে নিয়োজিত সরকারী কর্মকর্তার এম. এন. এস. ১ম, ২য়, ও ৩য় গ্রেডের পদে পদোন্নতি/উচ্চতর টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান সম্পর্কে এবং স্ব-শাসিত সংস্থার পরিচালনা পরিষদের সার্বক্ষণিক প্রধানের (চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক) পদে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সর্ম্পকিত বিষয়ে তাদের সুপারিশ, উর্ধ্বতন নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকুরি কাঠামো বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদ কমিটির কাছে পেশ করে। মন্ত্রী পরিষদ কমিটি উক্ত সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক তাদের সুপারিশ বিবেচনাপূর্বক তাদের সুপারিশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে।

খ) বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ড (Departmental Promotion/ Selection Board)ঃ প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের বিভাগে একটি বিভাগীয় পদোন্নতি/নিয়োগ বোর্ড থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব উক্ত বোর্ডের সভাপতি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত/যুগ্ম সচিব এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার প্রধান ইহার সদস্য। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৩। বিশেষ পদোন্নতি কমিটি (Special Promotion Committee)ঃ এই কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ক্যাডারভুক্ত বি.সি.এস কর্মকর্তাদের ৪,৮০০/-৭,২৫০/- টাকার বেতনক্রমের পদে পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করে।

৪। বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি (Departmental Promotion Committee)ঃ এই কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২য় শ্রেণীর পদে পদোন্নতি এবং ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর পদে পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করে।

৫। বিভাগীয় নিয়োগ বোর্ড (Divisional Selection Board)ঃ এই বোর্ড বিভাগীয় অফিসের নিজস্ব নন গেজেটেড পদে এবং জেলা ও অধঃস্তন অফিসের নিজস্ব পদে পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করে।

খ) গণ-পদোন্নতি, ১৯৯২ঃ

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সালে ৬৫৪ জন পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের পদোন্নতির খবর এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রী পর্যায়ের একটি কমিটি এবং সংস্থাপন প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে অপর একটি কমিটি পদোন্নতির জন্য কর্মকর্তাদের নির্বাচন করে। যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব পদে পদোন্নতির জন্য সম্পূর্ণভাবে মেধা ও যোগ্যতাকে

বিচার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এর জন্য ৬০% এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য ৪০% নম্বর রাখা হয়। দু'টি মিলিয়ে যারা ৭০% (সর্বনিম্ন) নম্বর পান তাদেরকেই পদোন্নতির জন্য নির্বাচন করা হয়। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব একটি ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কতজনকে পদোন্নতিতে ডাকা হয়েছে, কতজন উপস্থিত হয়েছেন এবং কতজন নির্বাচিত হয়েছেন সে সম্পর্কে আমরা যে তথ্য পাই তা সারণী-১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী -১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্যাডারের নাম ও মোট ক্যাডার	পদের নাম	সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়েছে	সাক্ষাৎকার দিয়েছেন	নির্বাচিত হয়েছেন	প্রক্রিয়া শুরু	পদোন্নতি প্রাপ্তদের ক্যাডারের নাম
প্রশাসন (প্রশাসন + সচিবালয়)	সচিব	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	৪ জন	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি
খাদ্য (প্রশাসনিক)	অতিরিক্তসচিব	পাওয়া যায়নি	পাওয়া যায়নি	৩২ জন	পাওয়া যায়নি	প্রশাসন-৭
কৃষি (কৃষি)						বাকীদের ক্যাডার জানা যায়নি
বন (কৃষি)	যুগ্ম সচিব	৪২৮ জন	৩৮৪ জন	১৯১ জন	৪ঠা ডিসেম্বর	প্রশাসন-১১৫
মৎস্য (কৃষি)						সচিবালয়-২৫
পশু সম্পদ (কৃষি)						হিসাব ও নিরীক্ষা-৫
সাধারণ শিক্ষা (শিক্ষা)						পরিবার পরিকল্পনা-২
কারিগরি শিক্ষা (শিক্ষা)						স্বাস্থ্য-৪
অর্থনৈতিক (অর্থ ও বাণিজ্য)						পুলিশ-২
বাণিজ্য (অর্থ ও বাণিজ্য)						ডাক-৫
পরিসংখ্যান (অর্থনৈতিক বাণিজ্য)						টেরিযোগাযোগ-২
গণপূর্ত (প্রকৌশল)						বাণিজ্য -২
জনস্বাস্থ্য (প্রকৌশল)						গণপূর্ত-১
সড়ক ও জনপথ (প্রকৌশল)						রেলওয়ে (প্রকৌশল)-২
টেলিযোগাযোগ (প্রকৌশল)						রেলওয়ে (বাণিজ্য)-২
নিরীক্ষা ও হিসাব (অর্থ)						সাধারণ শিক্ষা -৬
শুল্ক ও আবগারী (অর্থ)						তথ্য (সাধারণ)-৩
কর (অর্থ)						বন-১
স্বাস্থ্য						শুল্ক ও আবগারী-৩
পররাষ্ট্র						খাদ্য-২
তথ্য						অর্থনৈতিক-৩
বিচার						কর-২
ডাক	উপ সচিব	৮৬৬ জন	৮২৪ জন	৪২৭ জন	১২ই ডিসেম্বর	প্রশাসন-২৭৬

পুলিশ (আইন শৃংখলা)						সচিবালয়- ৬৬
আনসার (আইন শৃংখলা)						ডাক-১
রেলওয়ে (পরিবহন ও বাণিজ্য)						তথ্য (সাধারণ)-৮
রেলওয়ে প্রকৌশল)						রেলওয়ে (প্রকৌশল)-১
পরিবার পরিকল্পনা						অর্থনৈতিক-৭
সমবায়[৪]						পুলিশ-৫
						বাণিজ্য-৫
						হিসাব ও নিরীক্ষা-৪
						খাদ্য-৩
						গণপূর্ত-৩
						টেলিযোগাযোগ-৩
						তথ্য (বেতার)-২
						পরিসংখ্যান-২
						কারিগরী শিক্ষা-২
২৯				৬৫৪	৩ মাস	(বাকীদের ক্যাডার আনা যায়নি)

* বি.সি.এস (প্রশাসন) ও বি. সি. এস. (সচিবালয়) মার্ডিসকে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একত্র করা হয়েছে (ইনকিলাব, ডিসেম্বর ৮, ১৯৯১)

স্বাধীনতার পর পরই বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে কয়েকটি ব্যাচে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। এসব কর্মকর্তা ৮০ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই উচ্চ পদে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করে কিন্তু ১৯৮৫ সাল থেকে যুগ্ম-সচিব ও উপ-সচিব পদে পদোন্নতি প্রায় বন্ধ ছিল। ফলে সরকারী কাজে স্থবিরতা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে নিম্ন পর্যায়ে পদোন্নতি যোগ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা ও কর্ম বিমুখতার সৃষ্টি হয়। প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি ও স্থবিরতা দূরীকরণে কর্মকর্তাদের মধ্যে বিরাজমান দীর্ঘদিনের হতাশা দূর করে একটি গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। সকল ক্যাডারেই দক্ষ, মেধাবী কর্মকর্তা রয়েছে, যারা প্রশাসনের উর্ধ্বতন পদে গেলে বা উচ্চতর পর্যায়ের দায়িত্ব পেলে বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসংহতকরণ ও জনগণের সেবায় নিবেদিত একটি সত্যিকার গতিশীল, দক্ষ ও কল্যাণমুখী প্রশাসন গড়ে তোলায় কার্যকরী অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। এই পদোন্নতির ফলে উচ্চতর পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম হবেন। সরকার আশা করেন যে, দীর্ঘদিনের আকাংখীত পদোন্নতি প্রাপ্তির পর কর্মকর্তাগণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজে নব উদ্যোমে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

নিঃসন্দেহে বি.এন.পি. সরকারের এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ বাংলাদেশের প্রশাসনে একটি মাইল ফলক হিসাবে বিবেচিত হবে। কিন্তু এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপের পেছনে লুকিয়ে ছিল অসংখ্য ত্রুটি। তাই পদোন্নতি ঘোষণার পর বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যা প্রশাসনিক সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।[৫] তারা পত্রিকার মাধ্যমে এই পদোন্নতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। যারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে কৃষিবিদ ইনষ্টিটিউশন সিভিল সার্ভিস সমন্বয় কমিটি, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন, বি.সি.এস (কর) সমিতি, বি.সি.এস (অর্থনৈতিক) অফিসার্স সমিতি, সড়ক ও জনপথ ও প্রকৌশল সমিতি, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা বি.সি.এস. কল্যান সমিতি, বি.সি.এস (আনসার) ও বি.সি.এস (বাণিজ্য)। প্রতিবাদ করার জন্য প্রতিবাদ নয়। আমরা যদি একটু খতিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব আসলেই এই পদ্ধতির ভিতর অনেক অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। যে বৈধ ভিত্তির কথা আমরা জেনেছি তার সাথে এর রয়েছে এক বিরাট ব্যবধান। নীচের আলোচনা থেকেই তা প্রমাণিত হবে।

প্রথমতঃ মেধা যাচাই এর সন্তোষজনক মাপকাঠি নির্ধারণ ও প্রকাশ করা হয়নি। শুধু জানা গেছে যে, চাকুরী তথ্যতে (Service Record) ৬০% এবং মৌখিক পরীক্ষায় ৪০% নম্বর রাখা হয়েছিল।[৬] চাকুরী তথ্য (Service Record) গঠনে গত ১০ বৎসরের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন-এ প্রদত্ত নম্বর যোগ করা হয়েছে। তবে চাকুরী তথ্য (Service Record) ৬০% এবং ১০% উর্ধ্বতন বাছাই বোর্ড (S.S.B) কর্তৃক উক্ত গোপনীয় প্রতিবেদন সমূহে অংকিত রেখা চিত্রের ভিত্তি করে দেয়া হয়েছে। এই ১০% নম্বর দেয়ার কোন মাপকাঠি নির্ধারণ ও প্রকাশ করা হয়নি। কোন চাকুরী তথ্যতে (Service Record) কত নম্বর দেয়া হয়েছে তাও বুঝার উপায় নেই। কেউ হয়ত গোপণীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকা সত্বেও পাশ করে গিয়েছেন। কারো গোপনীয় প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য বাতিল করা সত্ত্বেও তিনি ফেল করে গেছেন। একই ক্যাডারভূক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকে। তাই সকলের বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদনের মান অভিন্ন হবে এটা আশা করা যায় না। কোন কোন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা যেখানে একজন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিবেদনাধীন কর্মকর্তাকে ৭০-৮০ নম্বর দিয়েছেন সেখানে অন্য বিভাগে/সংস্থায় একই যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা ন্যুনতম ৯০-৯৫ নম্বর পেয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ জ্যেষ্ঠতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলেও মনে হয়নি। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ১৯৮৯ সালের ১৭ই জুলাই গেজেট বিজ্ঞপ্তি মারফত একটি বিজ্ঞাপন জারী করে এবং সিভিল সার্ভিস পুল বিলোপ করে। ১৮ই জুলাই সংস্থাপন মন্ত্রণালয় আরও একটি বিজ্ঞাপন জারী করে। এতে বলা হয় বর্তমান পুলভূক্ত কর্মকর্তাগণ জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী তাদের মূল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠত্ব তালিকায় স্থান পাবে এবং বর্তমান পদে বহাল থাকলেও তারা সচিবালয় ও নিজস্ব ক্যাডারের

উচ্চতর পদে পদোন্নতি পেতে পারেন। কিন্তু পদোন্নতির ক্ষেত্রে এবার সে নিয়ম মেনে চলা হয়েছে বলে মনে হয়নি। এই পদোন্নতিতে জ্যেষ্ঠতার নিয়মকে যে স্পষ্টতই লংঘন করা হয়েছে, একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে। ১৯৮৭ সালে উপ-সচিব স্কেলে পদোন্নতি প্রাপ্ত ৪০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি না দিয়ে ১৬ বছরের কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।[৭]

তৃতীয়তঃ বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিয়োগ বা পদে লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। সংবিধানের ১৯ (১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেতন হবে। কিন্তু সাম্প্রতিক গণ-পদোন্নতিতে এই সাংবিধানিক সমতা রক্ষা করা হয়নি। যেমন-সাক্ষাৎকারে ডাকার ব্যাপারে কাউন্সিল কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল একজন কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য তিনজন যোগ্য কর্মকর্তাকে ডাকা হবে।[৮] এক্ষেত্রে ১৯১ জন যুগ্ম-সচিবের জন্য ৫৭৩ জন এবং ৪২৭ জন উপ-সচিবের জন্য ১২৮১ জন কর্মকর্তাকে সাক্ষাৎকারে ডাকার কথা। তা না করে বিভিন্ন ক্যাডার থেকে যুগ্ম সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৪৮৪ জন এবং উপ-সচিব পদে পদোন্নতির জন্য ৮৬৮ জনকে সাক্ষাৎকারে ডাকা হয়েছে।

চতুর্থতঃ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ৮৫-এর উপ বিধি ৩ (ক) এর সংজ্ঞা লংঘন করা হয়েছে। কারণ এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, কেবল অক্ষম প্রমাণিত হলেই জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে কনিষ্ঠ কর্মকর্তা দ্বারা পদোন্নতির ক্ষেত্রে অতিক্রম করা যাবে। অনেক দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তাকে লংঘন করে কনিষ্ঠ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

পঞ্চমতঃ জাতীয় পার্টির শাসনামলে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পদোন্নতির একটি নিয়ম চালু করা হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সঠিক মেধা যাচাই-এর সুযোগ থাকে না বলে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন-এর অস্থায়ী সরকারের আমলে একটি বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনরূপ সাক্ষাৎকার বা পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না কিন্তু বি.এন.পি সরকার এ বিজ্ঞপ্তি বাতিল কিংবা পদোন্নতি নির্ধারণে নতুন কোন বিধি জারী না করে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় কেবল উপ-সচিব পদ থেকে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতির জন্য। সাক্ষাৎকারের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় ঊর্ধ্বতন নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি।[৯] সচিব পর্যায়ে নিয়োগ ও পদোন্নতি এই কমিটি করে থাকে। কিন্তু এর চেয়ারম্যান ছিলেন একজন প্রতিমন্ত্রী। কমিটির সাত জনের মধ্যে একজন (চেয়ারম্যান) কেবল উত্তর বঙ্গের, একজন দক্ষিণ বঙ্গের এবং চারজন পূর্ব বঙ্গের, এর মধ্যে তিনজনই কুমিল্লার। দক্ষিণ বঙ্গের মন্ত্রী মহোদয় ঘন ঘন বিদেশে থাকার ফলে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত থাকারই সুযোগ পাননি। অবশ্য ঢাকায় থেকেও অনেকে মিটিং-এ উপস্থিত থাকেননি। ফলে বোর্ড মিটিং খুবই কমই হয়েছে।

ষষ্ঠতঃ পদোন্নতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে কমিটির সকল সদস্য সব সময় থাকতেন না। সকলকে একই প্রশ্ন (নাম, পিতার নাম, কত দিনের চাকুরী ইত্যাদি) জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কিন্তু নম্বর দেয়া হয়েছে কাউকে কম কাউকে বেশী।[১০] সকলের সাক্ষাৎকার শেষ হবার পরেও বহু দিন ধরে তারা নম্বর নিয়ে গরিমসি করেছেন। হাজার বার কাটা ছেড়া করা, সম্পূর্ণ নম্বরপত্র ছিড়ে ফেলে নতুন নম্বরপত্র তৈরি করা, পাশ করা কর্মকর্তাদের নম্বর কেটে তাকে ফেল করিয়ে দেয়া, ফেল করা কর্মকর্তাদের নম্বর বাড়িয়ে তাকে পাশ করিয়ে দেয়া ইত্যাদি করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারের পর কেউ নম্বর জমা দিয়েছেন পরের দিন, কেউ দিয়েছেন দুই সপ্তাহ বা তারও পরে, এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা বা নিয়ম ছিল না।

সপ্তমতঃ নিয়ম আছে যে, বিভাগীয় মামলা থাকলে কাউকে পদোন্নতি দেয়া যাবে না। কিন্তু বিভাগীয় মামলা থাকা সত্ত্বেও টেলিকমিউনিকেশন এর একজন কর্মকর্তাকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে।

অষ্টমতঃ আরেকটি বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য, সকল ক্যাডারে পদোন্নতির সুষম সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় পার্টি সরকার মতিন কমিটির সুপারিশক্রমে বিভিন্ন ক্যাডারে যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতির কোটা করে একটি আদেশ জারী করে। সে আদেশ সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে চাকুরী বিধি অনুযায়ী এটি বাতিল করার আগে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি, সুতরাং মতিন কমিটির কোটা ভেঙ্গে বিভিন্ন ক্যাডারে যে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তা বৈধ হয়নি।

উপরের আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, সবক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রেই যে সব নিয়ম কানুনের উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি দেয়ার কথা ছিল তা লংঘন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আরো পরিষ্কার ধারণা লাভ করার জন্য আমি, পদোন্নতি পেয়েছেন এবং পাননি এরূপ দু'জন ব্যক্তির সাথে আলাপ করেছি। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

কেস নং-১ঃ কর ক্যাডারের একজন যুগ্ম-সচিব, যিনি এই পদোন্নতি বলে অতিরিক্ত সচিব হয়েছেন। তিনি ১৯৬১ সালে চাকুরীতে যোগদান করেন। তার প্রথম পদোন্নতি হবার কথা ছিল ১৯৬৮ সালে। কিন্তু হয়েছিল আরো কয়েক বছর পর। এরপর কয়েকটি পদোন্নতি পেয়ে ১৯৮৩ সালে যুগ্ম-সচিব পদে উন্নীত হন। কিন্তু প্রত্যেকটি ধাপেই যে পদোন্নতির সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্য তিনি স্বীকার করেননি। যখন উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পান তখন তার মতে মোটামুটি সব মানদন্ডকে অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু যখন যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি হয় তখন জ্যেষ্ঠতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শুরু করলেও তিনি তা শেষ করেননি।

কেস নং-২ঃ কৃষি ক্যাডারের একজন উপ-সচিব, সাম্প্রতিক গণ পদোন্নতিতে তারও পদোন্নতি হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। আমি গিয়েছিলাম তার বেইলী রোডের বাসায়, তার সাথে কথা বলতে কিন্তু আলোচনার প্রসঙ্গ শুনেই তিনি রেগে উঠলেন, এ ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে নারাজ। যদিও সে কিছু বলতে চাননি তথাপি তাঁর সঙ্গে কথা বলে বিচ্ছিন্নভাবে যা জানতে পারলাম তার

সারমর্ম এরূপঃ এই পদোন্নতিতে যথেষ্ট অনিয়ম করা হয়েছে। কমিটিতে যারা ছিলেন অধিকাংশই পূর্ব বঙ্গের, ফলে এ'সব এলাকার প্রার্থীরাই বেশি পদোন্নতি পেয়েছেন। সাক্ষাৎকার পদ্ধতিকে তিনি অবৈধ মনে করেন, আর এটা মেধা যাচাই এর কোন পদ্ধতি নয় বলে তার ধারণা। তিনি বলেন, অনেক কনিষ্ঠকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে জ্যেষ্ঠকে ডিঙ্গিয়ে। এমন অনেককে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে যার হয়ত গোপনীয় প্রতিবেদনই নেই। আরেকজন ভদ্রলোক যিনি উক্ত ব্যক্তির নীচের তলায় থাকেন তাকে সাক্ষাৎকারে কোন নম্বর দেয়া হয়নি। কিন্তু সে ছিল অনেক জ্যেষ্ঠ পদে। পরে তাকে নম্বর দিয়ে পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হয়। যোগ্যতা নয়, ব্যক্তিগত পরিচিতি পদোন্নতির ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে বলে তার ধারণা।

পদোন্নতির এইসব অনিয়ম, অসামঞ্জস্যতা সরাসরি কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেয়া হ'ল।

অন্ততঃপক্ষে শতাধিক ঊর্ধ্বতন সহকারী সচিবকে বেতন স্কেল ৩,৭৪০/ টাকার স্কেলে চলতি দায়িত্বে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এখানেই কাজ করছিলেন।[১১] তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, কমিটির মাধ্যমে সাক্ষাৎকারের পর তাদের পদোন্নতি নিয়মিত করা হবে। কিন্তু এদের অধিকাংশকেই কমিটি পদোন্নতি দেয়নি। ফলে তাদের উপ-সচিব এর স্কেলের সমান স্কেল না থাকায় মাঠ পর্যায়েও যেতে পারছিলেন না এবং সচিবালয়ও থাকতে পারছিলেন না।

পদোন্নতি প্রাপ্ত সকলকে সহজে পদ অধিষ্ঠান (Posting) দেয়া হয়নি। সকলকে পদ-অধিষ্ঠান (Posting) দিতে ৪/৫ মাস সময় লেগে গিয়েছিল। যতদিন পদ-অধিষ্ঠান (Posting) পাওয়া যায়নি ততদিন বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা (O.S.D) হয়ে থাকতে হয়েছে। চাকুরী জীবনে বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা হওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত।

পদোন্নতি প্রাপ্ত অনেক কর্মকর্তা নতুন পদমর্যাদার বেতন পাবেন কিনা সে নিয়েও কথা উঠেছিল। উপ-সচিব ও যুগ্ম-সচিব পদে যত জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এত পদ খালি ছিল না। সামনে পদ শূন্য হবে সে হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল। শূন্য পদের অভাবে বেতন ভাতা কোন পদের বিপরীতে তোলা হবে সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পদ-অধিষ্ঠান (Posting) সমস্যা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসন থেকে পদোন্নতি প্রাপ্তদের তাদের স্থান ত্যাগ না করতে বলা হয়েছিল।[১২] মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের প্রায় ৭০ জন

অফিসারকে উপ-সচিব ও যুগ্ম-সচিব পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছিল উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধঃস্তন এর দায়িত্ব পালন করতে নারাজ ছিলেন। যেমন জেলা প্রশাসক পদটি উপ-সচিব স্তরের। যে সব জেলা প্রশাসক উপ-সচিব হয়েছিলেন তারা অসুবিধাজনক অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন।

যারা পদোন্নতি পেয়েছেন তারা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন পদ-অধিষ্ঠান (Posting) আর সৌজন্য সাক্ষাৎ নিয়ে। এই অবস্থায় কাজের চাপ বেড়ে গিয়েছিল যাদের পদোন্নতি ঘটেনি তাদের। এরকম একজন সহকারী সচিবকে দেখতে হয়েছিল দু'জন উপ-সচিব ও দু'জন উর্ধ্বতন সচিবের নথি।

যার পদোন্নতি পেয়েছেন তারা সকলেই বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা (O.S.D) হিসেবে সংস্থাপন যন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছিলেন। ফলে পূর্ব পদের লোক শূণ্যতা দেখা দিয়েছিল এবং সেখানে স্বাভাবিক কর্ম পরিবেশ উপস্থিত হতে যথেষ্ট সময় নিয়েছিল।

এই পদোন্নতির ফলে ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহু গুণ বেড়ে গেছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে কাজের উপর।

এই পদোন্নতি একদিকে যেমন এক শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে অন্যদিকে আর একটি শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে হতাশা, ক্ষোভ ও হীনমন্যতার সৃষ্টি করেছে। এর প্রভাব খুবই খারাপ হবে। কারণ পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রশাসনে যে গতি সঞ্চার-এ সমর্থ হবেন, কনিষ্ঠদের দ্বারা অতিক্রান্ত প্রশাসন তার চেয়ে অনেক বেশী বন্ধাত্ব সৃষ্টি করবেন।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে এই জাতীয় অনিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধমহল প্রতিবাদ জানিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ ১৯৯২ এর গণ পদোন্নতি বাতিলের প্রস্তাব রাখে, সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে। পরবর্তীতে হাই কোর্টের তিনজন মাননীয় বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর বেঞ্চ কর্তৃক ১৯৯২ এর পদোন্নতিকে অবৈধ, বেআইনী, অনিয়মতান্ত্রিক ও অকার্যকর বলে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখে রায় প্রদান করা হয়। এরপর আশা করা হয়েছিল গণ-পদোন্নতি সংক্রান্ত ভূলত্রুটি শুধরিয়ে অন্যায়ভাবে অতিক্রান্ত শত শত সরকারী কর্মকর্তার পদোন্নতির ঘটনাগুলো বিধিমোতাবেক অর্থাৎ জ্যেষ্ঠতা ও কর্মসম্পাদন তথ্যের (Performance Record) ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে যথাযথ ক্ষেত্রে পদোন্নতি প্রদানের বিষয়ে ত্বরিত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হবে। কিন্তু এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্বেও গণ-পদোন্নতির এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

গ) ত্রুটি ও সুপারিশঃ

প্রকৃতপক্ষে এই পদোন্নতি এক বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কেন? এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের পদোন্নতি ব্যবস্থার কতগুলি ত্রুটিপূর্ণ দিক।

প্রথমতঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সময়ে সময়ে পদোন্নতি পদ্ধতির পরিবর্তন। যেমন- ১৯৭৩ সালে বিপুলসংখ্যক যুবকদের উচ্চতর পদে বিশেষ করে প্রশাসনে নিয়োগ করা হয়। তাদের জন্য যোগ্যতাও শিথিল করা হয়, এই বিবেচনায় যে তারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু সরকার তাদেরকে প্রশাসনে না ঢুকিয়ে অন্যভাবে তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। প্রশাসনে তারা স্থান করে নিয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই কর্মকর্তা বিভিন্ন চাকুরীতে আরও উচ্চ পদে উঠে এসেছে মেধার বিচারে নয় চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা দেখিয়ে। অন্যদিকে অমুক্তিযোদ্ধাদের অপর একটি ব্যাচকে প্রশাসনের দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠত্ব দেয়া হয় আরও কয়েক বছর আগে থেকে।

বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী সরকার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদোন্নতির বিষয়ে কোন মন্ত্রীর বা কাউন্সিল কমিটির হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা রাখেন নি।[১৩] বিচারপতি শাহাবুদ্দিন জাতীয় পার্টি সরকারের আমলে সৃষ্ট উর্ধ্বতন নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কাউন্সিল কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে শুধুমাত্র উর্ধ্বতন নিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পদোন্নতির বিষয় বিবেচনার জন্য সরকারী আদেশ জারী করেছিলেন। এই আদেশে বলা হয়েছিল যে, জ্যেষ্ঠতা ও চাকুরী তথ্যের (Service Receord) ভিত্তিতে সকল কর্মকর্তার পদোন্নতি দেওয়া হবে। এতে কাউকে কোন কমিটি কর্তৃক সাক্ষাৎকার ডাকার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কিন্তু বি.এন.পি. সরকার এই পদ্ধতি বাতিল করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পদোন্নতি দেয়ার ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয়তঃ সময়ের কাজ সময়ে না করার প্রবণতা। প্রায় ১০ বৎসর পদোন্নতি বন্ধ ছিল অর্থাৎ যারা অনেক আগেই পদোন্নতি পেতে পারত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে পারত তাদেরকে সেই সুযোগ দেয়া হয়নি। তাদের জীবনের মূল্যবান সময় ব্যর্থতার গ্লানিতে ঢাকা ছিল। তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়নি। দেশ ও জাতি তাদের কাছ থেকে যা পেতে পারতো তাও পায়নি যেমন- শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক তার ছাত্র এবং তার ছাত্র বহু বছর পরে একসঙ্গে পদোন্নতি পেয়েছেন। সকলকে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে।

তৃতীয়তঃ আন্তঃ ক্যাডার বৈষম্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর একটি সমস্যা। সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ক্যাডার এবং একই ক্যাডারভুক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা প্রয়োজন কিন্তু এদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা ও সম্পর্কের বিকাশ গড়ে ওঠেনি। আন্তঃ ক্যাডার ও একই

ক্যাডারের মধ্যে বৈষম্য বরং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই অবস্থার একটি ন্যায়সংগত বিধান না করতে পারলে কর্মী প্রশাসনসহ সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা অন্তসার শূন্যতায় ভেঙ্গে পড়বে।

চতুর্থতঃ সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাব আরেকটি সমস্যা। কোন ক্যাডার থেকে কতজনকে পদোন্নতি দেয়া হবে, তাদেরকে কোথায় পদ-অধিষ্ঠান (Posting) দেয়া হবে, অর্পিত দায়িত্ব পালনের দক্ষতা তাদের আছে কিনা, সে সবের নিরিখে কাজটা হয় না। এমনকি অনেক সময় পর্যাপ্ত পদের ব্যবস্থা না করেও পদোন্নতি দিয়ে থাকে। যেমন-সম্প্রতি যে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাতে কদিন চলে যাবার পরও পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নতুন পদ-অধিষ্ঠান (Posting) এর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি ফলে প্রশাসন এ স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছিল।

পঞ্চমতঃ কোন সমরূপ মানদণ্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়না। যেমন-এই পদোন্নতিতে একমাত্র উপ-সচিব ও যুগ্ম-সচিব ছাড়া অন্য কোন পদে পদোন্নতি দেয়ার জন্য সাক্ষাৎকার নেয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যাদেরকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাদের সিংহভাগই হচ্ছে প্রশাসন ও সচিবালয় ক্যাডারের কর্মকর্তা। আবার চাকুরী তথ্য (Service Receord) ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির নিয়ম রয়েছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় কারো ক্ষেত্রে হয়ত জ্যেষ্ঠতার উপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে কারো ক্ষেত্রে আবার চাকুরী তথ্যের (Service Receord) উপর জোর দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক গণ পদোন্নতি এর বড় উদাহরণ।

ষষ্ঠতঃ স্বজনপ্রীতি আমাদের প্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বজনপ্রীতির জন্যই আমলাতন্ত্রের যে বড় বৈশিষ্ট্য নিরপেক্ষতা তাই বজায় রাখা সম্ভব হয় না। স্বজনপ্রীতির একটি নমুনা দেয়া যেতে পারে। এই গণ-পদোন্নতির কাউন্সিল কমিটিতে কেবলমাত্র বি.এন.পি'র সদস্যরা ছিলেন। তারা সব কিছুই বি.এন.পি'র আদর্শ ও দৃষ্টিভংগিতে বিচার করবেন তাই স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক ভাবেই তারা তাদের আদর্শে বিশ্বাসী এবং তাদের অনুগত ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবেন। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা দেখতে পাই প্রায় প্রত্যেকটি মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবরা পদোন্নতি পেয়েছেন।

সপ্তমতঃ যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন। কিন্তু গোপনীয় প্রতিবেদনগুলো সময় মতো লেখা হয় না এবং যথাযথভাবে পূরণ বা সংরক্ষণ করা হয় না। যে সব কর্মকর্তা প্রতিবেদন লেখেন এবং প্রতিবেদন প্রতিস্বাক্ষর করেন, প্রতিবেদন লেখার বিষয়ে তাদের সর্বদা সঠিক জ্ঞান না থাকায় প্রতিবেদনের মন্তব্যগুলি অনেক সময় পরস্পর বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ফলে এগুলো বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করে। কোন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তা জ্ঞাত করানোর জন্য সরকারী নিয়ম থাকা সত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিরূপ মন্তব্যগুলো যথা সময়ে জানানো হয় না। বহু ক্ষেত্রে কয়েক বছরের প্রতিবেদন বাদ দিয়ে কেবলমাত্র এক বছরের ভাল কিংবা মন্দ প্রতিবেদন সুবিধা মত

প্রেরণা করা হয়। তাছাড়া সরকারী কর্মকর্তাদের শ্রেণী ভিত্তিক একই ধরনের প্রতিবেদন ফর্ম হওয়াতে কোন কোন বিশেষ পদের উপর মন্তব্য করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

অষ্টমতঃ সর্বাপেক্ষা বড় যে সমস্যা তা হলো সর্বস্তরে জবাবদিহিতার অভাব। এবার পদোন্নতির ক্ষেত্রে কেউ কেউ ব্যাপারটা আগে ভাগেই জেনে গিয়েছিলেন যে তারা পদোন্নতি পাচ্ছেন। বিজ্ঞপ্তি জারী হওয়ার আগের দিন তারা পাশের তালিকায় তাদের নামও দেখে এসেছেন। কিন্তু পাশের তালিকা প্রকাশিত হলে দেখেন তারা পদোন্নতি পাননি। পরে দেখা গেল যে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরের পূর্ব মুহূর্তেও অনেক নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। জবাবদিহিতার অভাবের এর থেকে বড় উদাহরণ কি হতে পারে।

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পদোন্নতি ব্যবস্থার এ সকল সমস্যার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। আর এ জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে যার কাজ হবে গত কয়েক বছরের পদোন্নতির ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করে পদোন্নতি ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো বের করা এবং এমন পদ্ধতি সুপারিশ করা যেখানে এসব ত্রুটি ঘটা সম্ভব হবে না।

দ্বিতীয়তঃ একসাথে সবার পদোন্নতি না দিয়ে যখন সময় হবে তখন তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত।

তৃতীয়তঃ মৌখিক পরীক্ষার পদ্ধতি তুলে দিয়ে লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরীক্ষার বিষয়বস্তু অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ যাদের পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে দেয়া হলো, কোনটায় কত নম্বর পেল, চাকুরীর বয়স কত ইত্যাদি সবকিছু অন্যান্য কর্মচারী কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের নৈতিকতার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন কারণ যে সকল সমস্যার কথা আমরা জেনেছি তার অধিকাংশই নৈতিকতার অবক্ষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উপসংহার

এই প্রবন্ধটি পাঠ করার পর নিঃসন্দেহে অনেকের মনে হতাশার জন্ম নিবে কারণ এখানে পদোন্নতি ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনার ধারাকে ঐদিকে প্রবাহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এর সমস্যা, ত্রুটি, অসামঞ্জস্যতা ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। যদি ঐসব সমস্যা সঠিক উপায়ে সমাধান করা সম্ভব হয় তবে কাংখিত ফল, উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা আশা করব সরকার এসব সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে পদোন্নতি ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করে গড়ে তুলবেন।

তথ্য নির্দেশঃ

১। Bhagwan and Bhushan, *Public Administration* S. Chand and Company Ltd. New Delhi, 1968.

২। *Personnel Manual*, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, *চাকরির বিধানাবলী* (ষষ্ঠ সংস্করণ), ১৯৯৪।

৪। ডঃ এম. শামসুর রহমান, *আধুনিক লোক প্রশাসন*, অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃঃ ৫২৪–৫২৫।

৫। *আজকের কাগজ*, ঢাকা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৬। *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৯২।

৭। *সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৮। *সংগ্রাম*, ঢাকা, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

৯। *সংবাদ*, ঢাকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

১০। *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৯২।

১১। *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

১২। *দৈনিক জনতা*, ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

১৩। *বাংলার বাণী*, ঢাকা, ৩রা মার্চ, ১৯৯২।

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যঃ রাজশাহী টেকসটাইল মিলের উপর একটি সমীক্ষা

মোঃ ওমর আলী

সারসংক্ষেপ

রাজশাহী টেকসটাইল মিল সুতা উৎপাদনকারী একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই মিল সুতা উৎপাদন ও বিক্রয় কার্যকরভাবে সম্পাদন করতে না পারায় এর প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য লাভের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। মিলের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য মূলতঃ কাঁচামাল সংগ্রহের জটিলতা, উৎপাদনের জটিলতা ও বিক্রয়ের জটিলতা দ্বারা দীর্ঘ দিন যাবৎ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে আসছে যার ফলশ্রুতিতে মিলের ক্রমপুঞ্জিভূত লোকসান বর্তমানে ২২ কোটি টাকার উর্ধ্বে। এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (তুলা) যথাসময়ে সরবরাহ, উৎপাদনের সুবিধার্থে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও উৎপাদিত সুতা যথাযথ বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন। বিটিএমসি কর্তৃপক্ষ ও মিলের কর্মকর্তাদের সমবেত আন্তরিক প্রচেষ্টায় মিলটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে সক্ষম হবে।

ভূমিকা

প্রতিষ্ঠানের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারাই হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠান যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট মুনাফা, নির্দিষ্ট বিক্রয়, নির্দিষ্ট বাজার অংশ স্থির করে তাহলে এগুলো অর্জন করতে পারাই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য। একটি প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হয়। তাই পরিবেশগত উপাদান প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবেশের উপাদান সমূহকে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক– এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। আভ্যন্তরীণ উপাদান সমূহ হচ্ছে ডাইরেকটরস মন্ডলী/ ব্যবস্থাপনা, কর্মচারী এবং কৃষ্টি। বাহ্যিক উপাদানসমূহ হচ্ছে– প্রতিযোগী, খরিদ্দার, সরবরাহকারী, আইন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী, মালিক, শ্রমিক এবং সমাজ বা সম্প্রদায়। একটি প্রতিষ্ঠান কিভাবে তার পরিবেশকে ব্যবহার করছে তার ওপর নির্ভর করে এর সাফল্য। পরিবেশের উপাদান সমূহকে বুঝতে হবে, এদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবনপূর্বক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, প্রভাবিত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবেশের সকল সুযোগ সুবিধাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোই সাফল্যের চাবিকাঠি। প্রাতিষ্ঠানিক সফলতা অর্জনের জন্য যা আবশ্যক তা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে সম্পদ সংগ্রহ, যথাযথভাবে এদের কাজে লাগানো, লক্ষ্য অর্জন এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলের সন্তুষ্টি বিধান। এজন্য ব্যাপক ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা দরকার।

বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনাবিদ গ্রীফিন প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের চারটি মৌলিক এ্যাপ্রোচের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হচ্ছে সম্পদ সংগ্রহ এ্যাপ্রোচ, লক্ষ্য অর্জন এ্যাপ্রোচ, আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া

এ্যাপ্রোচ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ এ্যাপ্রোচ। তিনি এই এ্যাপ্রোচগুলোকে নিম্নোক্ত মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন।

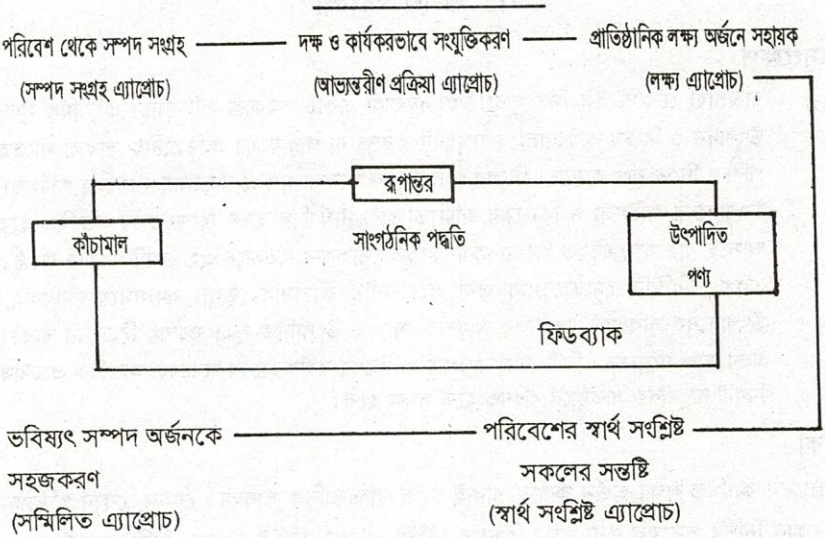

উৎসঃ রিকি ডব্লিউ গ্রীফিন, ব্যবস্থাপনা, ১৯৯২ পৃষ্ঠা–৮৪

এই মডেলের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রতিষ্ঠানটির ফলদায়ক কাজের জন্য প্রথমে পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ যথাসময়ে ও উপযুক্ত দামে সংগ্রহ করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগুলোকে দক্ষ ও কার্যকরভাবে সংযুক্ত করতে হবে যা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। অতঃপর অর্জিত ফলাফল প্রতিষ্ঠানে সাথে যাদের স্বার্থ আছে– তাদের সন্তুষ্টি বিধান করবে। প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সন্তুষ্ট হলে ভবিষ্যতে সম্পদ সংগ্রহের পথে তা সহায়ক হবে। এই মডেলের কেন্দ্র স্থলে সাংগঠনিক পদ্ধতি উপস্থাপন করে এর উৎপাদন কার্যক্রম দেখান হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে "রাজশাহী টেকসটাইল মিলের সাফল্য" এই প্রবন্ধে যাচাই করা হয়েছে। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

(১) রাজশাহী টেকসটাইল মিলের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের প্রকৃতি ও পরিমাণ চিহ্নিতকরণ।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য বিগত দিনে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ।

(৩) প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের পথে বাধা সমূহ চিহ্নিতকরণ।

(৪) অনুসন্ধান লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রাজশাহী টেকসটাইল মিলের সাফল্য অর্জনের সুপারিশকরণ।

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বস্ত্র রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতিতে বস্ত্র শিল্পের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজশাহী টেকসটাইল মিল সেই বস্ত্রের কাঁচামাল সুতা উৎপাদনে নিয়োজিত। অথচ বিগত ১৮ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই মিলটি আর্থিক লোকসানের মধ্যে নিমজ্জিত। মাত্র দুই বছর অর্থাৎ ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালে সে যথাক্রমে ৫৭.৯৬ এবং ৬.৫৮ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। ১৯৯৬ সালের ৩০শে জুন এর পুঞ্জিভুত লোকসানের পরিমাণ দাড়ায় ২২ কোটি টাকার অধিক। এহেন পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের পথে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেয়। কোন প্রতিষ্ঠানই দীর্ঘ দিন লোকসান দিতে পারে না, বিশেষতঃ যদি তা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান না হয়। রাজশাহী টেকসটাইল মিল সূতা উৎপাদনকারী একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। মিলটির ক্রমাগত লোকসান একদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে- অন্যদিকে মিলটির অস্তিত্বের প্রতি বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ অবস্থায় মিলটির কার্যক্রমের ওপর একটি ব্যাপক অনুসন্ধান চালান উচিত বলে গবেষক মনে করে। ইতিপূর্বে এই মিলের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের উপর কোন গবেষণা কাজ পরিচালনা করা হয় নাই বলে ধারনা করা হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের পথে অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত এবং এর সমাধান সুপারিশ করার লক্ষ্যে গবেষক বর্তমান প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। আশা করা যায় যে এই গবেষণার ফলাফল ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষক সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালা নিয়ে রাজশাহী টেকসটাইল মিলের উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, হিসাব ও অর্থ, জনশক্তি, প্রশাসনিক ও প্রকৌশলী বিভাগের কর্মকর্তা এবং শ্রমিক সংঘের সভাপতি ও সচিবের সাথে আলাপ করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে। তাত্বিক দিক সমূহ লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে নেয়া হয়েছে। বিটিএমসি ও মিল কর্তৃক প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাসঙ্গিক মাধ্যমিক তথ্য সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যাদি ও আলোচনা

রাজশাহী টেকসটাইল মিল সুতা উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান। এর কাঁচামাল তুলা। এই তুলার প্রায় সবটায় (৯৫%) আমদানী করা হয় আমেরিকা, রাশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, কলম্বিয়া, মিশর ও সুদান থেকে। বাকী ৫% তুলা দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়। রাজশাহী টেকসটাইল মিল সব কাউন্টের সুতা তৈরী করে না। তুলার অভাবে কেবল ২০/১, ৪০/১ ও ৬০/১

কাউন্টের সুতা তৈরী করা হয়। কাঁচামাল থেকে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুতা উৎপাদন করা হয়ঃ

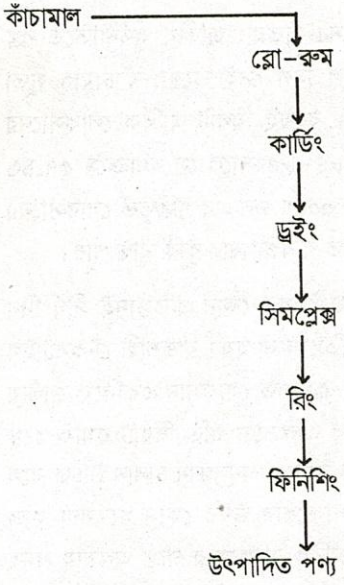

উৎপাদনের প্রতিটা স্তরেই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উৎপাদিত সুতার মান চূড়ান্তভাবে পরীক্ষার জন্য বিটিএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে প্রতিমাসে কিছু নমুনা পাঠান হয়। এই মিলের সুতার মান সন্তোষজনক। নীচের ১নং সারণী থেকে সুতার মান সম্পর্কে ধারণা নেয়া যেতে পারে।

১নং সারণীঃ সুতার নাম

বছর	কাউন্ট	ষ্ট্যাণ্ডার্ড মান	প্রকৃত মান		
			সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়
১৯৯১-৯২	৬০'স	১৯০০	১৯২০	১৯৭০	১৯৪৫
১৯৯২-৯৩	"	"	১৯১০	১৯৫০	১৯৩০
১৯৯৩-৯৪	"	"	১৮৪৫	১৯৪০	১৮৯৩
১৯৯৪-৯৫	"	"	১৯১০	১৯২০	১৮৬৫
১৯৯৫-৯৬	"	"	১৮১৫	১৮৯০	১৮৫৩

উৎসঃ মিলের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ

৪০ ও ২০ কাউন্টের সুতার মানও ভাল। ৪০ কাউন্টের সুতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড মান ১৮৫০ এর বিপরীতে প্রকৃত মান ১৮১৮ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ওঠানামা করে। ২০ কাউন্টের সুতার ষ্ট্যান্ডার্ড মান ১৭০০ এবং এর প্রকৃত মান ১৬৭০-১৭৪৮ এর মধ্যে দেখা যায়। রাজশাহী টেকসটাইল মিলের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য মোটেই সন্তোষজনক নয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ব্যাতিক্রম ২ বছর ছাড়া মিলটি প্রতিবছর লোকসান গুণে আসছে। ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত মেয়াদকালে মিলটি কোন বছরই লাভ করতে পারেনি। লোকসানের বিস্তার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভেরজ জন্য গত পাঁচ বছরের লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী নীচের ২নং সারণীতে দেখানো হলোঃ

২নং সারণীঃ উৎপাদন ও লাভ-ক্ষতি সংক্রান্ত তথ্যাবলী (বাৎসরিক ৩২'স কাউন্টের গড়ে লক্ষ কেজি)

বছর	উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন	শতকরা হার	মুনাফা বাজেট (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত লাভ / লোকসান (লক্ষটাকা)
১৯৯১-৯২	১৫.৯০	১১.৫১	৭২.৩৮	১০৮.২৫	(৯২.৯৩)
১৯৯২-৯৩	১৬.০০	১০.০১	৬২.৫৬	৭৭.৭৪	(২০২.৯২)
১৯৯৩-৯৪	১৫.৬৫	৭.৯৯	৫১.০৫	৬২.৩২	(৩৩১.৭৮)
১৯৯৪-৯৫	১৫.৬৫	৮.৬২	৫৫.০৭	(১৫২.৯১)	(২১১.০৮)
১৯৯৫-৯৬	১৫.৬৫	৮.০৯	৫১.৬৯	২১.৮০	(২৫৫.৭৮)

উৎসঃ মিলের হিসাব বই

২ নং সারণীতে প্রদর্শীত তথ্যে দেখা যায় যে, বিগত ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতি বছরই লোকসান হয়েছে। গড় লোকসানের পরিমাণ ২১৮.৮৯ লক্ষ টাকা। অথচ ১৯৯৪-৯৫ সাল বাদে উক্ত সময়ে প্রতি বছর বাজেটে মুনাফা ধরা হয়েছে। এ অবস্থার কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মিলটির প্রকৃত উৎপাদন কোন সময় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। বাৎসরিক গড় উৎপাদন টার্গেট যদিও ১৫.৭৭ লক্ষ কেজি কিন্তু প্রকৃত সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত কম-গড়ে ৯,২৪ লক্ষ কেজি। এ পরিস্থিতিতে গড় উৎপাদন অর্জন ছিল শতকরা ৫৮.৫৯ যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়। কোন কোন বছর গড় উৎপাদন হার ৫১-৫৫ ভাগ পর্যন্ত লক্ষণীয়। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদনের স্বল্পতার এই নিয়মিত ধারা-যার ফলশ্রুতিতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতে হচ্ছে-ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনারই ইঙ্গিত বহন করে।

মিলের দ্বিতীয় প্রধান কাজ সূতা বিক্রয়। সুতা বিক্রয়ের দিকে তাকালে দেখা যায় গড় বাৎসরিক বিক্রয়, ৫.৫৩ লক্ষ কেজি অথচ গড় প্রকৃত বার্ষিক উৎপাদন ৩২ 'স কাউন্টের গড়ে ৯.২৪ লক্ষ কেজি যা সকল কাউন্টের সমষ্টিতে রূপান্তর করলে প্রায় ৬.০০ লক্ষ কেজি হয়। সে দৃষ্টিতে বিক্রয়ের সাফল্যও আশাব্যাঞ্জক নয়। বিক্রয় সংক্রান্ত গত পাঁচ বছরের তথ্যাবলী ৩নং সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

৩নং সারণীঃ সুতা বিক্রি ও মজুদের পরিমাণ (সকল কাউন্টের সমষ্টি লক্ষ কেজি)

বছর	বিক্রির পরিমাণ	মোট মূল্য (লক্ষটাকা)	মজুদের পরিমাণ	মোট মূল্য (লক্ষটাকা)
১৯৯১-৯২	৪.৩৮	৬৮০.৩০	২.০৩	২৭৬.৯৫
১৯৯২-৯৩	৪.৮১	৭২৪.৯৯	২.৫৫	৩৩৫.২৪
১৯৯৩-৯৪	৫.৭৭	৬৮৫.০৫	১.৬১	২৬১.৬১
১৯৯৪-৯৫	৭.১৯	১০৬৪.০৪	.২০	৩০.৯০
১৯৯৫-৯৬	৪.৫৪	৭৭২.৬৯	.৯৩	১৪৩.২৩

উৎসঃ মিলের হিসাব বই।

৩নং সারণীতে প্রদর্শিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, মিলটি উৎপাদিত সুতা আশানুরূপ বিক্রি করতে পারছে না। কেবলমাত্র ১৯৯৪-৯৯৫ সলের বিক্রির পরিমাণ মোটামুটি সন্তোষজনক। এ বছর সব থেকে বেশী সুতা বিক্রি হয়েছে। ফলে মজুদ সুতার পরিমাণ সর্বাপেক্ষা কম। এতদসত্ত্বেও এ বছরে লোকসান খুব একটা কমেনি। পূর্ববর্তী বছরের লোকসানের সাথে এ বছরের লোকাসান সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অনুসন্ধান করলে এর কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য বছরের বিক্রিও আশানুরূপ নয়। সারণীতে প্রতি বছর মজুদের যে পরিমাণ দেখান হয়েছে সেটাও কম নয়। এই হিসাব মোতাবেক বছরে মজুদ সুতার পরিমাণ গড়ে ১.৪৬ লক্ষ কেজি যার মূল্য প্রায় ২০৯.৫৮ লক্ষ টাকা।

উৎপাদন এবং বিক্রয় তথ্য থেকে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শুরু থেকেই মিলটি প্রায় প্রতি বছর লোকসান দিয়ে আসছে। কেবল মাত্র ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালে সামান্য লাভ হয়েছে। লোকসানের এই ধারাবাহিকতা মিলটির টিকে থাকার পথে ভয়ংকর হুমকি স্বরূপ। রাজশাহী টেকসটাইল মিল কোন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নয়। তাই লাভ করতে না পারলেও ক্রমাগত লোকসান দিয়ে কতদিন একে টিকিয়ে রাখা যাবে তা এক বিরাট প্রশ্ন। অথচ মিলটির বর্তমান কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে মিলটি উৎপাদন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে আগামীতেও মুনাফা তো দূরের কথা, না-লাভ, না-

লোকসান স্তরেও পৌছতে পারবে না। উদাহরণ হিসাবে ১৯৯৬-৯৭ সালের বাজেটকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

বাজেটকৃত মাসিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা= ১.৩০ লক্ষ কেজি (৩২ 'স কাউন্টের গড়ে)। বাজেটকৃত এই লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করা হলেও নিম্নোক্ত হিসাব অনুযায়ী প্রতিমাসে লোকসান হবে ১৪.৭১ লক্ষ টাকা।

৪নং সারণীঃ কাউন্ট ভিত্তিক মাসিক উৎপাদন খরচ বনাম লাভ/লোকসানঃ

কাউন্ট	সম্ভাব্য প্রকৃত উৎপাদন	উৎপাদন খরচ (প্রতিবেল টাকায়)	বিক্রয় মূল্য (প্রতিবেল টাকায়)	লাভ/ক্ষতি (প্রতিবেল টাকায়)	মোট লাভ/ক্ষতি (লক্ষ টাকায়)
২০/১	৭৫ বেল	১৩৪৪৫.০০	১৯৭২৭.৮৪	৬২৮২.৮৪	৪.৭১
৪০/১	৩৮৮ বেল	৩২০৮৭.০০	২৭৫২৭.৮৪	(৪৫৫৯.১৬)	(১৭.৬৯)
৬০/১	৭১ বেল	৩৯১৬৬.০০	৩৬৭২৭.৮৪	(৩৪৩৮.১৬)	(১.৭৩)

১০০% অর্জিত হারে সম্ভাব্য মাসিক লোকসান = (১৪.৭১ লক্ষ টাকা)।

উৎসঃ মিলের হিসাব বই।

না-লাভ, না-লোকসান স্তরঃ নিম্নোক্ত হিসাব থেকে পরিলক্ষিত হয় যে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার অর্জিত হার ১৬৮.৫৭% হলে মিল না-লাভ, না-লোকসান স্তরে উন্নীত হতে পারেঃ

১। মাসিক প্রকৃত উৎপাদন (৫৩৪ বেল x ১৮১.৪৪ কেজি) = ৯৬৮৮৮ কেজি।

২। মাসিক পরিবর্তনশীল খরচ = ১২৬.২৪ লক্ষ টাকা

৩। মাসিক স্থায়ী খরচ = ৩৬.১৬ লক্ষ টাকা

মোট উৎপাদন খরচ = ১৬২.৪০ লক্ষ টাকা
(হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে)

মোট মাসিক আয় (সুতা বিক্রয় থেকে) = ১৪৭.৬৯ লক্ষ টাকা
(হিসাব বই থেকে নেয়া হয়েছে)

৪নং সরণীতে উপস্থাপিত তিন কাউন্ট সুতা অর্থাৎ ৭৫ বেল, ৩৮৮ বেল এবং ৭১ বেল ৩২ 'স কাউন্টের গড়ে রূপান্তর করলে এর পরিমাণ হয় ১.৩০ লক্ষ কেজি।

বিশ্লেষণঃ

উপাত্ত আয়। কন্ট্রিবিউশন মার্জিনঃ

মোট আয়- পরিবর্তনশীল খরচ (১৪৭.৬৯-১২৬.২৪)= ২১.৪৫ লক্ষ টাকা

শূন্য মুনাফা উৎপাদন স্তর (স্থায়ী খরচ ÷ উপাত্ত আয়)ঃ $\frac{৩৬.১৬}{২১.৪৫}$ x ১৬৮.৫৭%

শূন্য মুনাফা স্তরে উৎপাদনের পরিমাণঃ $\frac{(৯৬৮৮৮x১৬৮.৫৭)}{১০০}$ = ১.৬৩ কেজি

শূন্য মুনাফা স্তরে বিক্রয়ের পরিমাণঃ ($\frac{১৪৭.৬৯x১৬৮.৫৭}{১০০}$) = ২৪৮.৯৬ লক্ষটাকা

শূন্য মুনাফা স্তরে উৎপাদন খরচঃ

পরিবর্তনশীল খরচ	= ২১২.৮০
স্থায়ী খরচ	= ৩৬.১৬
	= ২৪৮.৯৬ লক্ষ টাকা

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌছা যায় যে, উৎপাদনের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ১.৩০ লক্ষ কেজির পরিবর্তে ১.৬৩ লক্ষ কেজি স্থির করলে মিলটির লাভ বা লোকসান কিছুই হবে না। লাভ করতে হলে মাসে ১.৬৩ লক্ষ কেজির বেশী সুতা উৎপাদন করা দরকার।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে মিলটি উৎপাদনের এই লক্ষ্য মাত্রা স্থির করল কেন? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী পর্যালোচনা করতে হবেঃ

১। উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলী- (১৯৯৫-৯৬ ইং সালের বাজেট অনুযায়ী)

টাকু	সংখ্যা	ক্ষমতা
ক) স্থাপিত টাকু	২৫০৫৬	১৭.৩৬ লক্ষ কেজি
খ) চালু টাকু	১৩৭২০	৯.৫১ লক্ষ কেজি
গ) বাজেটকৃত টাকু	২২৩০০	১৫.৬৫ লক্ষ কেজি
ঘ) বাৎসরিক উৎপাদন লক্ষমাত্রা	১৫.৬৫ লক্ষ কেজি	
ঙ) বাৎসরিক অর্জিত হার (ফিনিসড)-	৫১.৬৯%	

২। কাঁচা তুলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী (মিলের হিসাব বই অনুযায়ী)

সুতার কাউন্ট	তুলার আঁশের দৈর্ঘ	তুলার বাৎসরিক চাহিদা	তুলার বাৎসরিক প্রাপ্তি
২০/১	১″		
৪০/১	১ ১/১৬″	৪৮৮৪ বেল	২৮২০ বেল
৬০/১	১ ১/৮″		

উল্লেখিত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে অবাক হতে হয় যে, বাজেটকৃত টাক্‌র সংখ্যা ও এর উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ২২৩০০ এবং ১৫.৬৫ লক্ষ কেজি হওয়া সত্ত্বেও চালু টাক্‌র গড় সংখ্যা ১৩৭২০ যার উৎপাদন ক্ষমতা ৯.৫১ লক্ষ কেজি। প্রকৃত উৎপাদন আরও কম (৮.০৯ লক্ষ কেজি)। অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদন বাজেটকৃত ক্ষমতার ৫১.৬৯ ভাগ অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, মিলটি লক্ষ্য অর্জনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই চরম ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, মিলে কাঁচা তুলার সরবরাহ আশংকাজনক হারে কম। বার্ষিক কাঁচা তুলার চাহিদা ৪৮৮৪ বেলের বিপরীতে প্রাপ্তি ঘটেছে ২৮২০ বেল মাত্র। প্রয়োজনীয় কাঁচা তুলার অভাবেই মিলটির কর্মরত জনবল (৮১৩ জন) এবং যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় অর্ধেকই অব্যবহৃত রয়ে গেছে। ফলে মিলটিকে লোকসান দিতে হচ্ছে এবং বিস্ময়কর হলেও ইহা সত্য যে ১৯৯৬ সালের ৩০ শে জুন পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে– ২২৭৯.০৬ লক্ষ টাকা। উৎপাদনের এই গতিধারা ঘাতক ব্যাধির মতই মিলটিকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে ফেলছে।

মিলটির কাঁচা তুলার ঘাটতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে রাজশাহী টেকসটাইল মিলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তুলা খরিদ করার কোন ক্ষমতা নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিটিএমসি তুলা খরিদ করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে বেসরকারী মিলগুলো তুলা উঠানোর মৌসুমে তুলনামূলক সস্তা দামে যখন তুলা খরিদ করে বিটিএমসি তখন তুলা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতার কাজে ব্যস্ত থাকে, ফলে পরবর্তীতে চড়া দামে তুলা খরিদ করতে হয়। বিটিএমসি খরিদ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিলতার কারণে মিলটি প্রয়োজনীয় তুলা নির্দিষ্ট সময় পায় না।

উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ হিসাবে মেশিনের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাঁচা তুলার অপচয় রোধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সুতার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও স্থানীয় প্রশাসনের কোন ভূমিকা নেই। বিটিএমসি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। ফলে জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সুতার দাম প্রয়োজনবোধে হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতা মজুদ থাকার এটা একটা অন্যতম কারণ। অনুরূপভাবে বন্টন প্রণালীও বিটিএমসি কর্তৃপক্ষ স্থির করেন। টেন্ডারের মাধ্যমে ৭০ ভাগ সুতা

ডিলারদের নিকট বিক্রয় করা হয়। বাকী ৩০ ভাগ তাঁত বোর্ডের নির্ধারিত ব্যক্তিদের নিকট বিক্রয় করার নিয়ম আছে। এরা খরিদ না করলে তা ডিলারদের নিকট বিক্রয় করা যেতে পারে। সামান্য কিছু সুতা জেলখানায় বিক্রয় করা হয়। তুলা ক্রয় এবং সুতা বিক্রয়ের এই অদ্ভুত নিয়ম কাউকে হাত পা বেঁধে "দৌড় প্রতিযোগিতায়" অংশ গ্রহণ করতে বলারই সামিল। এই ব্যবস্থাও মিলের সাফল্যের পথে আর একটি অন্তরায় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

সাফল্যের সাথে কার্যক্রম চালানোর পথে অন্যান্য অন্তরায়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

ক) মিলের নিজস্ব কোন জেনারেটর না থাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হয়।

খ) সংশ্লিষ্ট বিভাগের অভিমত যে যন্ত্রপাতি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় উৎপাদন চলার সময় মাঝে মাঝে যন্ত্রপাতির গোলযোগ দেখা দেয়। এগুলোর আধুনিকীকরণ দরকার। কিন্তু এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন তৎপরতা নেই।

গ) চলতি মূলধন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

ঘ) প্রচুর পরিমাণ সুতার চোরাই পথে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ।

এছাড়াও আছে পরিবহণ সমস্যা, আবাসিক সমস্যা ইত্যাদি। উপরোক্ত নানাবিধ ত্রুটির কারণে উৎপাদন থেকে বিক্রয় পর্যন্ত কোন স্তরেই মিলটি লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। ফলে প্রবন্ধের শুরুতে প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের যে মডেল দেয়া হয়েছে– রাজশাহী টেকসটাইল মিলের কার্যক্রম তার সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ বলা যায় না।

উপসংহার ও সুপারিশমালা

রাজশাহী টেকসটাইল মিল কেবল টার্গেট উৎপাদন অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে তা নয়, উৎপাদিত সুতাও বিক্রি করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে সুতার মান সন্তোষজনক এবং প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ টার্গেট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সুতা মজুদ থাকছে। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের দিক থেকে রাজশাহী টেকসটাইলকে মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না। মিলটি দীর্ঘদিন যাবৎ লোকসানের সম্মুখীন হওয়ায় এর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে এসেছে। উৎপাদনের জটিলতা, লক্ষ্য উৎপাদন লাভ না হওয়া, লক্ষ্য বিক্রয় অর্জিত না হওয়া ইত্যাদি কারণে মিলের এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মিলটির টার্গেট উৎপাদন সমচ্ছেদ বিন্দুর অনেক নীচে; অথচ প্রায় অর্ধেক টাকুই অব্যবহৃত থাকছে। বিপুল পরিমাণে তুলা ঘাটতি এর প্রধানতম কারণ। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং যান্ত্রিক ত্রুটিও উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধকারী উপাদান হিসাবে কাজ করছে। কারবারের নীট সম্পদ, নীট চলতি মূলধন এবং বিনিয়োজিত মুলধনও সন্তোষজনক নয়। এমতাবস্থায় মিলটির টিকে থাকার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা আশু প্রয়োজনঃ

১। অলস টাকু ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

২। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে চলতি মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ ও কাঁচামাল খরিদ করার পূর্ণ ক্ষমতা স্থানীয় প্রশাসনকে দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৩। উৎপাদন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মিল কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করা যেতে পারে।

৪। মিলের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত নিম্নমানের হওয়ায় উৎপাদন প্রায়ই বিঘ্নিত হয়। সে কারণে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৫। উৎপাদিত সুতা ন্যায়সঙ্গত দামে বিক্রির যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে মিল প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দিতে হবে।

৬। নিজস্ব জেনারেটর স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দূর করতে হবে।

৭। চোরাই পথে সুতার আগমন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মোট কথা মিলটির প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। উপরোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের সাথে সাথে সুতা উৎপাদন ও বিক্রির সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলে যদি আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হন, তাহলে মিলটি বর্তমান হতাশাপূর্ণ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্য নির্দেশঃ

Books

1. Bobbit, H. R. Jr. Breinholt, R. H. Doktor, R. H. & McNaul, J.P., *Organisational Behavior:* Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall. 1978.
2. Dessler, C., *Organisation Theory:* Englewood Cliffs, N. J. Prentice-Hall. 1980.
3. Gloss, R. E., Steade, R. D., Lowry, J. R., *Business:* Cincinnati, Ohio, South Western Publishing Co. 1980.
4. Griffin, R. W., *Management:* Boston, Houghton Mifflin Co., 1993.

প্রতিবেদন

১। বাংলাদেশ টেকস্‌টাইল মিল্‌স কর্পোরেশন, *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ১৯৯২-৯৩।

মালিক ও ভাড়াটিয়াঃ বাড়ী ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রসঙ্গ

খবির উদ্দীন আহম্মদ

১. ভূমিকাঃ

ভাড়াটিয়া চুক্তির স্থায়ীত্বের প্রধানতঃ মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ। কারণ আইন অনুসারে যতক্ষণ ভাড়া পরিশোধ করতে থাকবে ভাড়াটিয়া ততক্ষণ উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবে।[১] এ থেকে, উচ্ছেদ লক্ষ্যে ভাড়া পরিশোধ হতে না পারে এরূপ ঘটনার অবতারণা প্রায়ই হয়ে থাকে। একাধিক ঘটনাবলীর মধ্যে মালিক কর্তৃক ভাড়া গ্রহণের অস্বীকৃতি এর অন্যতম। ভাড়া চুক্তির মেয়াদ মধ্যে মালিক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। মেয়াদী চুক্তির ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ও অনুরূপভাবে ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে মালিক ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে।

২. চুক্তির মেয়াদ মধ্যে অস্বীকৃতিঃ

ভাড়া চুক্তির মেয়াদ মধ্যে বাড়ী-মালিক বাড়ী ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়া যায়। এজন্য বাড়ী-মালিকের নামে ভাড়ার টাকা চালানে জমা দেয়া হয়। ভাড়া নিয়ন্ত্রকের নিকট উক্ত প্রকারে ভাড়া জমা দেয়ার মাধ্যমে ভাড়াটিয়া ভাড়া খেলাপী হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। ভাড়াটিয়া ভাড়া খেলাপী হলে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তাই হয়। উচ্ছেদের মাধ্যমে ভাড়া বাড়ী থেকে ভাড়াটিয়াকে অপসারণপূর্বক বাড়ীর দখল উদ্ধারের মামলায় ভাড়া প্রদান করা হতে থাকলে উচ্ছেদের ডিক্রী বা আদেশ হয় না। সেজন্য ভাড়াটিয়ার প্রধান করণীয়ই হয় নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করা। মালিকের হাতে হাতে বা চুক্তির শর্তমতে ভাড়া দিতে না পারলে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়ার নিয়ম করা হয়েছে। ভাড়া পরিশোধ থাকলে উচ্ছেদ মামলায় ডিক্রী হবে না প্রসঙ্গে ১৯৯১ সালের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে বলা হয়েছেঃ

অনুমোদনযোগ্য ভাড়া প্রদান করা হলে সাধারণতঃ উচ্ছেদের আদেশ দেয়া হবে না-

(১) *Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882)* অথবা *Contract Act, 1872 (IX of 1872)* এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ভাড়াটিয়া এ আইনের অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাড়া যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রাই আদায় করবেন এবং ভাড়ার শর্তাদী পূরণ করবেন ততদিন পর্যন্ত বাড়ী-মালিকের অনুকূলে বাড়ীর দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন আদেশ বা ডিক্রী প্রদান করা হবে না।[২]

৩. ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের কারণঃ

অবশ্য ভাড়া জমা দেয়া নিয়মিত চলতে থাকলেও বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে নির্দিষ্ট কারণে মালিকের অনুকূলে বাড়ীর দখল পুনরুদ্ধারের ডিক্রী হতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মাধ্যমে বাড়ীর দখল পুনরুদ্ধারের ডিক্রী হয়ে থাকেঃ

১। ভাড়া খেলাপ ও চুক্তি ভঙ্গঃ ভাড়াটিয়া যদি অনুমোদনযোগ্য ভাড়া পূর্ণমাত্রায় আদায় না করে এবং ভাড়ার শর্ত ভঙ্গ করে;[৩]

২। *Transfer of Property Act এর Section 104 Clause (m), (o)* এবং (p) পরিপন্থী কাজ করাঃ ভাড়াটিয়া *Transfer of Property Act, 1882 (IV of 1882)* এর *Section 108* এর *(Clause) (m), Clause (o)* বা *(Clause) (p)* বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ করে;[৪]

৩। উপ-ভাড়া প্রদানঃ ভিন্নরূপ চুক্তির অবর্তমানে, ভাড়াটিয়া, বাড়ীর-মালিকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে বাড়ী বা বাড়ীর কোন অংশ উপ-ভাড়া দেয়;[৫]

৪। উৎপাত বা বিরক্তিকর আচরণঃ ভাড়াটিয়া এমন আচরণের জন্য দোষী যা সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী বাড়ীর দখলকারীগণের নিকট উৎপাত বা বিরক্তিস্বরূপ;[৬]

৫। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে বাড়ী ব্যবহারঃ ভাড়াটিয়া বাড়ীর কোন অংশ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বা ব্যবহার করতে অনুমতি দেয়;[৭]

৬। নির্মাণ বা পুণঃনির্মাণঃ মালিকের বাড়ীর নির্মাণ বা পুণঃনির্মাণের জন্য বাড়ীর প্রয়োজনে।[৮]

৭। নিজ দখলঃ বাড়ী-মালিকের নিজ দখলের জন্য বাড়ীর প্রয়োজনে;[৯]

৮। যার উপকারে বাড়ী তার প্রয়োজনঃ যার উপকারের জন্য বাড়ীটি রাখা হয়েছে তার দখলের জন্য বাড়ীটি বাড়ীর মালিকের প্রকৃতই যখন প্রয়োজন;[১০]

৯। উচ্ছেদের সন্তোষজনক কোন কারণঃ বাড়ী মালিক এমন কোন কারণ দর্শাতে পারে যা আদালতের নিকট সন্তোষজনক বলে গণ্য হয়।[১১]

৪. ভাড়ানিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়াঃ

প্রধানতঃ ভাড়াটিয়া যতদিন পূর্ণমাত্রায় ভাড়া আদায় করবেন ততদিন উচ্ছেদ করা যাবে না। একারণে এশর্ত যাতে পূরণ করা যায় তার জন্য ভাড়াটিয়া তৎপর থাকে। পক্ষান্তরে উচ্ছেদ প্রত্যাশী মালিক যাতে তা পূরণ হতে না পারে তার জন্য সচেষ্ট থাকে।

ভাড়াটিয়া চুক্তি অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রকের নিকট ভাড়া জমা দেয়ার মাধ্যমে ভাড়া খেলাপী হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারে। ১৯৯১ সালের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ ধারায় ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়া বিষয়ে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করেছেঃ

১। ভাড়াটিয়া কর্তৃক ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ভাড়া বাড়ী মালিক কর্তৃক গ্রহণে অস্বীকৃতি,
২। বাড়ী মালিক প্রসঙ্গে সন্দেহ বা মালিকানায় বিবাদ,
৩। বাড়ী মালিকের খোঁজ না থাকা; এবং
৪। বাড়ী মালিককে টাকা দেয়া নিষিদ্ধ।

৪.১. ভাড়াটিয়া কর্তৃক ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ভাড়া বাড়ী-মালিক কর্তৃক গ্রহণে অস্বীকৃতিঃ

যে ক্ষেত্রে কোন বাড়ীর মালিক ভাড়াটিয়া কর্তৃক ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ধারা ১৮ এ উল্লিখিত কোন ভাড়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রে–

(ক) ডাক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবিলিকৃত বলে উক্ত ভাড়া যে তারিখে ভাড়াটিয়ার নিকট ফেরৎ দেয়া হয় সে তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া তা জমা দিতে পারে; এবং

(খ) বাড়ীর পরবর্তী সময়ের প্রাপ্য ভাড়া গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বাড়ী–মালিক লিখিত নোটিশ দিয়ে তাকে অবহিত না করলে, ভাড়াটিয়া পরবর্তী মাসের ভাড়াও তা প্রদেয় হওয়ার তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে বা ধারা ১৮ (৫) এর অধীন যে তারিখে তা প্রদেয় হয় সে তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে, ডাক মনি অর্ডার যোগে তার প্রেরণ খরচাসহ জমা দিতে পারে।[১২]

৪.২. বাড়ী-মালিক প্রসঙ্গে সন্দেহ বা মালিকানায় বিবাদঃ

যে ক্ষেত্রে ধারা ১৮ এ উল্লিখিত ভাড়া গ্রহণ করার অধিকারী ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকৃত সন্দেহ বা বিবাদ দেখা দেয় সে ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদেয় হওয়ার তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে বা ১৮ (৫) এর অধীন যে তারিখে তা প্রদেয় হয় সে তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া ভাড়া জমা দিতে পারে। আদালতের সিদ্ধান্ত বা পক্ষদের মধ্যে আপোষে উক্ত সন্দেহ দূর বা বিবাদ মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীর পরবর্তী সময়ের ভাড়াও জমা দেয়া যায়।[১৩]

৪.৩. বাড়ী-মালিকের খোঁজ না থাকাঃ

যে ক্ষেত্রে বাড়ী–মালিক তার সচরাচর বসবাসের স্থান ত্যাগ করেন এবং তার ঠিকানা ও অবস্থান ভাড়াটিয়ার জানা না থাকে এবং ভাড়াটিয়ার জানামতে ধারা ১৮ তে উল্লিখিত ভাড়া গ্রহণ করার জন্য বাড়ী–মালিকের কোন প্রতিনিধি নাই সেক্ষেত্রে উক্ত ভাড়া প্রদেয় হওয়ার তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে বা ধারা ১৮ (৫) এর অধীন যে তারিখে তা প্রদেয় হয় সে তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া ভাড়া জমা দিতে পারে। বাড়ী–মালিকের ঠিকানা ও অবস্থান জানা না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীর পরবর্তী সময়ের ভাড়াও জমা দেওয়া যায়।[১৪]

৪.৪. বাড়ী-মালিককে টাকা দেওয়া নিষিদ্ধঃ

যে ক্ষেত্রে কোন বাড়ী–মালিককে কোন টাকা প্রদান করা বা তার নামে টাকা জমা করা *Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947)* এর বিধান

অনুযায়ী নিষিদ্ধ সেক্ষেত্রে উক্ত ভাড়া প্রদেয় হওয়ার তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে বা ধারা ১৮ (৫) এর অধীনে যে তারিখে তা প্রদেয় হয় সে তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া ভাড়া জমা দিতে পারে এবং পরবর্তী সময়ের ভাড়াও জমা দিতে পারে।[১৫]

৫. মেয়াদ উত্তীর্ণ চুক্তি এবং অস্বীকৃতিঃ

বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী মেয়াদী ভাড়াটিয়া চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়াতেই ভাড়াটিয়া উচ্ছেদযোগ্য হয় না। ভাড়াটিয়াকে কেবল মাত্র ঐ কারণে উচ্ছেদ করা যায় না। কারণ তখনও মালিকের সাথে ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক থাকে। এ প্রসঙ্গে 'ভাড়াটিয়া' সংজ্ঞায় তাকে ভাড়াটিয়া দেখানো হয়েছে। বলা হয়েছে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাড়ী দখলকারী কোন ব্যক্তিও এর (ভাড়াটিয়া) অন্তর্ভূক্ত হবে।[১৬] চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বাড়ী দখলকারী ব্যক্তিকে ভাড়াটিয়া গণ্য করানোর কারণেই মালিকের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে না। ফলে এরূপ ভাড়াটিয়া যদি চুক্তি অবসানের পরও বাড়ীতে থাকতে চায় তবে তাকে নিয়মিত ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মালিক যদি এরূপ ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে ভাড়াটিয়া ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দিয়ে ভাড়া খেলাপী হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। কারণ চুক্তির মেয়াদ অবসানের ফলে ভাড়াটিয়া সম্পর্কের অবসান হয় না। এ অবস্থায় মেয়াদ শেষে ভাড়াটিয়া যদি ঐ স্থানে ভাড়াটিয়া থাকতে চায় তবে তাকে মেয়াদ শেষে মালিক বরাবর ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়া প্রেরণ করতে হবে। মালিক যদি তা গ্রহণে অস্বীকার করে এবং ভাড়াটিয়া তা নির্দিষ্ট সময়মত অর্থাৎ তা ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের নিকট ভাড়া জমা দেয় এবং তা দিতেই থাকে তবে সে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবে।[১৭] এ মামলার রায়ে সময় উত্তীর্ণ হওয়া ভাড়াটিয়া চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিতে মালিকের পরিবর্তে ভাড়াটিয়াকে অধিকার সম্পন্ন করেছে। এ আইনের পূর্বে সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের ১১৬ ধারানুযায়ী ভাড়াটিয়া চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পর চুক্তি নবায়নের বিষয় মালিক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে ভাড়াটিয়া চুক্তির অবসান ঘটাতে পারতো। ফলে মালিক পারতো মেয়াদ বৃদ্ধি করতে। কিন্তু বর্তমানে মালিক নয় বরং মেয়াদোত্তীর্ণ চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ভাড়াটিয়া অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ চুক্তির ক্ষেত্রে মেয়াদ অবসানের পর যদি ভাড়াটিয়া পূর্ণ ভাড়া মালিকের নিকট ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরণ করে এবং মালিকের তা গ্রহণে অস্বীকৃতির জন্য ভাড়া নিয়ন্ত্রকের নিকট তা জমা প্রদান করে এবং তা করতে থাকে তবে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবে।[১৮]

ভাড়া গ্রহণে মালিকের অস্বীকৃতি ভাড়াটিয়ার জন্য অসুবিধার কারণ হলেও তৎপর ভাড়াটিয়ার জন্য তা ক্ষতিকর নয়। কেবল মাত্র ভাড়া খেলাপীই উচ্ছেদের মূল কারণ হওয়ায় মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া তা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দেয়ার মাধ্যমে খেলাপী থেকে রক্ষা পায়।

৬। ভাড়া রশিদঃ

বাড়ী ভাড়া নিয়মিত গ্রহণ করার পরও মালিক তা গ্রহণের বিষয়ে অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারে। তাতে ভাড়াটিয়ার ভাড়া খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য ভাড়া প্রদানের সহজ প্রমাণ হচ্ছে মালিকের কাছ থেকে ভাড়া প্রদানের প্রমাণ স্বরূপ রশিদ নেয়া। বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ এ জন্য রশিদ দেয়া বাধ্যতামূলক করেছে। তাতে বলা হয়েছেঃ

> *ভাড়া আদায়ের রশিদ প্রদানঃ ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া পরিশোধ করা হলে বাড়ীর মালিক তৎক্ষণাত ভাড়া প্রাপ্তির একটি রশিদ বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করে ভাড়াটিয়াকে প্রদান করবেন।*[১৯]

৬.১. রশিদ প্রদানে ব্যর্থতার দণ্ডঃ

ভাড়ার রশিদ প্রদানে মালিকের ব্যর্থতাকে দণ্ডনীয় করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

> *যদি কোন বাড়ী-মালিক ধারা ১৩ এর বিধান অনুসারে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া গ্রহণের লিখিত রশিদ প্রদানে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয় তাহলে সে ভাড়াটিয়াকে অভিযোগের ভিত্তিতে আদায়কৃত টাকার দ্বিগুণঅর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।*[২০]
>
> *মালিক কর্তৃক ভাড়া রশিদ প্রদানে অস্বীকৃতি ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ দায়ের না করলে তা তামাদী হয়ে যায়।*[২১]

৭. ভাড়া জমা দেওয়ার সময়ঃ

ভাড়া পরিশোধ বা জমা বিষয়ে ১৮ (৫) ধারায় নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে। এ ধারায় বলা হয়েছে সে মতে ভাড়া পরিশোধ বা জমা করা না হলে উচ্ছেদের মামলায় ভাড়া পরিশোধ বা জমা দেওয়া না হওয়ার কারণে ভাড়াটিয়া ভাড়া খেলাপী হবে এবং তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের ডিক্রী হবে। এ প্রসঙ্গে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে বলা হয়েছেঃ

> *কোন ভাড়াটিয়াকে কোন বাড়ী সম্পর্কে এ ধারায় কোন সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে না যদিঃ*
>
> (ক) *সে ভাড়া চুক্তিতে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অথবা অনুরূপ চুক্তির অবর্তমানে ভাড়া মাসের পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে এ আইনের অধীনে অনুমোদনযোগ্য তৎকর্তৃক প্রদেয় পূর্ণ ভাড়া পরিশোধ না করে;* অথবা
>
> (খ) *ধারা ১৯ এ বিধৃত ক্ষেত্রে সে উক্ত ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এর বিধান মোতাবেক ভাড়া জমা না করে এবং উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) (খ) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ভাড়া প্রেরণের খরচসহ জমা না করে।*[২২]

ফলে মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির কারণে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়া বিষয়ে ১৯৯১ সালের বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮ (৫) ও ১৯ (১) ধারা একত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়। ১৮ (৫) ধারাকে ১৯ (১) ধারার সাথে যোগ দিলে দেখা যায়, ভাড়াটিয়ার মালিকের চুক্তির

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা ঐ সময় নির্ধারিত না থাকার ক্ষেত্রে যে মাসের ভাড়া তার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। মালিক উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রেরিত ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ডাক বিভাগ কর্তৃক ঐরূপ অবিলিকৃত ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত টাকা ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া তা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিবে।

পরবর্তী সময়ের ভাড়ার ক্ষেত্রে মালিক যদি ভাড়াটিয়াকে পরবর্তী সময়ের ভাড়া গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে লিখিত নোটিশ না দেয় তবে চুক্তির নির্ধারিত সময়ের ১৫ দিনের মধ্যে বা ঐ সময় নির্ধারিত না থাকার ক্ষেত্রে, ভাড়া মাসের পরবর্তী মাসের ১৫ তম দিনের পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে তা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হবে।[২৩] ১৮ ও ১৯ ধারার নিয়ম প্রতিপালিত হলে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাবে। ১ মাস বা তার বেশী বা অভ্যাসগত ভাড়া খেলাপীর মধ্যে আইন কোন পার্থক্য করে না। যখন ১৯ ধারার নিয়মে ভাড়াটিয়া ভাড়া জমা দেয় না তখন সে সময় মত ভাড়া জমা দেয়ার অধিকারী নয় এবং ঐ প্রকার জমা আইন অবৈধ।[২৪]

১৮ (৫) ধারায় বর্ণিত উপরের নিয়ম প্রসঙ্গে *Ramjan Ali Mistry v. Md Hedayetullah*[২৫] মামলায় বলা হয়েছে, চুক্তির শর্তানুসারে বা চুক্তির অবর্তমানে যে মাসের ভাড়া তার পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়াকে ভাড়া দিতে হবে, এবং ভাড়াটিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত ভাড়া যদি মালিক গ্রহণে অস্বীকার করে তবে ভাড়াটিয়াকে উপরে বর্ণিত পরবর্তী মাসের ১৫তম দিনের মধ্যে মনি অর্ডারে ভাড়া পাঠাতে হবে। মনি অর্ডারে ভাড়া প্রত্যাখ্যাত হলে, ডাক বিভাগ কর্তৃক ঐ অবিলিকৃত মনি অর্ডার ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া কর্তৃক ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে তা জমা দিতে হবে। ভাড়াটিয়া কর্তৃক অধ্যাদেশে নির্ধারিত এই শর্তাবলী যখন পূরণ করা হবে, ভাড়া খেলাপীর অভিযোগে উচ্ছেদ থেকে ভাড়াটিয়া তখন রক্ষা পাবে। *President, National Tuberculosis Relief and Rehabilitation Society v. M. Chowdhury* [২৬] মামলায়ও এর সমর্থন দেখা যায়।

ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়ার পূর্ব শর্ত, অবশ্য *A. K. M. Shamsuddin v. Dr. Aftabuddin Ahmed*[২৭] মামলায় উল্লিখিত হয়েছে। এতে ১৯ (১) (খ) ধারায় ভাড়া জমা দেয়ার জন্য ১৮ (৫) ধারার সাথে তার 'ব্যাখ্যা' তথা Explanation উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ১৯ ধারানুযায়ী ভাড়া জমার পূর্ব শর্ত হলো, সময়ের মধ্যে ভাড়াটিয়া কর্তৃক মালিককে প্রথমে ভাড়া প্রদানের প্রস্তাব করতে হবে এবং ভাড়াটিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত ঐ ভাড়া গ্রহণে মালিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে, নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ডাক মনি অর্ডার যোগে মালিক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। মালিকের ঐ ভাড়া গ্রহণের অস্বীকৃতিতে ভাড়াটিয়া তা ১৯ (১) (ক) ধারার অধীনে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিতে পারে। ১৮ (৫) ধারার '*ব্যাখ্যা*' সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে, এ উপ-ধারায় উপরে বর্ণিত সময়ের মধ্যে ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত কোন ভাড়া গ্রহণ করতে মালিক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে মালিক কর্তৃক ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বলে ধরে

নেয়া হবে। অর্থাৎ ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়ার পূর্বে ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়া মালিকের কাছে পাঠাতে হবে, মালিক তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে ডাক বিভাগ কর্তৃক ভাড়াটিয়ার কাছে ঐ টাকা ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে ভাড়া জমা দেয়ার পূর্বে তা মালিকের নামে ডাকে পাঠাতেই হবে। ফেরত এলে জমা।

ভাড়া জমা প্রদান বা পরিশোধ বিষয়ে এখানে চুক্তি বলতে লিখিত চুক্তি বলা হয়েছে।[২৮] এধারায় উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে ভাড়া পরিশোধ বা জমা দেয়া বা পরিশোধের চেষ্টান্তে জমা প্রদান করার মাধ্যমে ভাড়াটিয়া ভাড়া খেলাপী থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে। এ ধারার সময় সীমা কড়াকড়িভাবে অনুসরণের কথা বলা হলেও তার ব্যতিক্রম আছে। ফলে এ ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ভাড়া জমা প্রদানও সঠিক জমা হিসাবে গণ্য হয়।

মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির ফলে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয় যে তা চুক্তির নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যেই মালিককে দিতে হবে এবং তৎকর্তৃক অস্বীকারের কারণে ঐ সময়ের মধ্যে ডাক মনি অর্ডার যোগে তার বরাবরে পাঠাতে হবে। ডাক মনি অর্ডারে প্রেরিত ভাড়া মালিক গ্রহণে অস্বীকার করলে ডাক বিভাগ কর্তৃক ভাড়াটিয়ার কাছে অবিলিকৃত ভাড়া ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়াটিয়া তা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিবে।[২৯] ভাড়া নিয়ন্ত্রক ভাড়া খেলাপ হওয়া না হওয়া বিষয়ে কিছু দেখবেন না। কেবল নিয়ম অনুযায়ী অবিলিকৃত টাকা ডাক মনি অর্ডারের ভাড়া ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে তা জমা দেয়া হচ্ছে কি না এখানে তাই দেখা হবে। ফলে ডাক মনি অর্ডার ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যে তা জমা দেয়া না হলে তা নিয়ম অনুযায়ী জমা হয়নি ধরা হবে এবং এ জমা আইনানুগ জমা ধরা হবে না। ভাড়াটিয়া ভাড়া খেলাপী কিনা তা উচ্ছেদ মামলায় Small Causes Court Judge দেখবেন।[৩০]

১৮(৫) ধারায় নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ভাড়া দেওয়ার জন্য দু'ভাবে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছেঃ প্রথমত মালিককে পরিশোধের ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিতে সময় নির্ধারিত থাকলে সে সময়ের মধ্যে আর না থাকলে ভাড়া মাসের পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে; অথবা দ্বিতীয়ত ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়ার ক্ষেত্রে ১৯ ধারায় বিধৃত ক্ষেত্রে উক্ত ধারায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তার বিধান মোতাবেক।

যদি মালিককে ভাড়া পরিশোধ করা সম্ভব হয় তবে তা অবশ্যই লিখিত চুক্তিতে তারিখ নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকলে সে তারিখের মধ্যে, আর যদি তা না থাকে, তবে যে মাসের ভাড়া তার পরের মাসের ১৫ দিনের মধ্যে মালিককে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। ভাড়াটিয়া যদি এরূপে ভাড়া পরিশোধ করতে পারে তবে সে ভাড়া খেলাপীর অভিযোগে অভিযুক্ত হলেও দোষী হবে না। যদি তার পক্ষে এরূপে ভাড়া পরিশোধ করা সম্ভবপর না হয় তবে তাকে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা দিতে হবে। সে যদি ১৯ ধারায় বিধৃত ক্ষেত্রে ঐ ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তার বিধান মোতাবেক ভাড়া জমা দিতে পারে তবেও সে ভাড়া খেলাপী হতে রেহাই পাবে।

এ অবস্থায় ভাড়াটিয়ার ভাড়া দেয়ার বিষয়ে বিকল্প দু'টি পথ উন্মুক্ত আছে। বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রচলিত পূর্বেকার আইনের উপর আদালতের সিদ্ধান্ত দেখা যায়। ঐ সব সিদ্ধান্তে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়া প্রসঙ্গে ১৮(৫) (ক) ও ১৮ (৫) (খ) এর মধ্যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ ধারায় প্রদত্ত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে। সে অনুযায়ী লিখিত চুক্তিতে সময় নির্ধারিত থাকলে সে সময়ের মধ্যে আর না থাকলে ভাড়া মাসের পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে হয় মালিককে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে আর না হলে উল্লিখিত ঐ সময়ের মধ্যেই ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়া মালিক বরাবর প্রেরণ করতে হবে এবং মালিকের অস্বীকৃতির কারণে ডাক বিভাগ কর্তৃক ফেরৎ প্রদানের ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে তা জমা দিতে হবে। ঐ ব্যাখ্যার কারণে ডাক মনি অর্ডার যোগে ঐ সময় সীমার মধ্যেকার প্রেরিত ভাড়া মালিক গ্রহণে অস্বীকার করলে তা তার অস্বীকৃতি গণ্য হবে। কেননা ১৮(৫) ধারার ব্যাখ্যায় পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে যে ৫ উপধারানুযায়ী প্রেরিত ভাড়া মালিক গ্রহণে অস্বীকৃতি না জানালে 'প্রত্যাখ্যান' হয় না।[৩১]

১৯৯১ সালের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৮(৫) ধারায় উক্তরূপ 'ব্যাখ্যা' সংযুক্ত হয়নি। ফলে মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির প্রশ্ন প্রমাণের জন্য ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরণের বিষয়টি এখান থেকে আসছে না এবং সে কারণে ব্যাখ্যায় প্রদত্ত সময় সীমাটিও সময়ের ব্যাপারে কার্যকর নয় যদিও তা চলে আসছে। ফলে মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির বিষয়টি ঐ সময় সীমার (চুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তারিখ এবং তার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী মাসের ১৫ দিন) মধ্যে ডাক মনি অর্ডার যোগে তার বরাবরে ভাড়া প্রেরণকে আকর্ষণ করে না। বরং ঐ সময় সীমার শেষ দিন পর্যন্ত তার গ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকায়, ঐ সময়ের মধ্যে অন্য কোন বিপরীত প্রমাণ না থাকলে,তার বরাবরে ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়া প্রেরণের কারণ সৃষ্টি হতে পারে না। সুযোগের শেষ দিন মালিককে ভাড়া দিতে না পারলে ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেয়ার প্রশ্ন ওঠে। এ জন্য সেখানে যাওয়ার পূর্বে ভাড়া পরিশোধের শেষ চেষ্টা এবং ভাড়া গ্রহণের শেষ সুযোগ হিসেবে ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়াটিয়া কর্তৃক মালিক বরাবর ভাড়া প্রদান। মালিক তা গ্রহণ করলে ঐ সময়ের ঝামেলা শেষ। না করলে তা ফেরৎ আসার ১৫ দিনের মধ্যেই ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে জমা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। ১৯(১) ধারায় ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ভাড়া ফেরত আসার পর নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ধারায় মালিকের নিকট ভাড়া ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরণের বিষয়ে কোন সময় সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। ১৮ ধারার বিষয় উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে এখানে বলা আছে, যে ক্ষেত্রে কোন বাড়ীর মালিক ভাড়াটিয়া কর্তৃক ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ধারা ১৮ এ উল্লিখিত ভাড়া গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ১৯(১) ধারার উল্লিখিত এ অংশটি ১৮(৫) (খ) ধারানুযায়ী ভাড়া জমাকে আকৃষ্ট করে। ভাড়া জমা প্রদান একযোগে ১৮(৫) (ক), ১৮(৫) (খ) ও ১৯(১) ধারার ফল নয়। তারপরও ১৮(৫) (ক) অথবা ১৮(৫) (খ) নিয়মে ভাড়া দেওয়াকে ভাড়া খেলাপী থেকে রক্ষা করে। এ অবস্থায় ১৯(১) ধারায় ভাড়া জমা দেওয়ার জন্য ১৮(৫) (ক) কে আকৃষ্ট করে না। সে জন্য চুক্তির

সময় সীমায় বা তা না থাকার ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়া ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরণ কাম্য নয়। *Ramjan Ali Mistry* [৩২] মামলায় ভাড়া জমাদান প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার একটি বিষয় উপস্থিত আছে। তা হলো, ভাড়াটিয়া কর্তৃক উপস্থাপিত ভাড়া যদি মালিক গ্রহনে অস্বীকার করে তবে ভাড়াটিয়াকে উপরে বর্ণিত পরবর্তী মাসে ১৫তম দিনের মধ্যে মনি অর্ডারে ভাড়া পাঠাতে হবে। এ মামলায় অবশ্যই ১৮(৫) ধারায় বর্ণিত চুক্তির বর্তমানে চুক্তির নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভাড়া পরিশোধের মত ডাক মনি অর্ডারে ঐ সময়ের মধ্যে ভাড়া পাঠানোর বিষয় বলা হয়নি। বরং অস্বীকারের ক্ষেত্রে পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ প্রসঙ্গে উক্ত অধ্যাদেশে তৎকালে যে নিয়মই থাকুক না কেন ভাড়া জমা প্রসঙ্গে উপরোক্তরূপ বাধ্যবাধকতা এসেছে যদিও উক্ত আদালতের মন্তব্য, ভাড়াটিয়া কর্তৃক অধ্যাদেশ নির্ধারিত এ শর্তাবলী যখন পূরণ করা হবে, ভাড়া খেলাপীর অভিযোগে উচ্ছেদ থেকে ভাড়াটিয়া রক্ষা পাবে। এখানে অধ্যাদেশ নির্ধারিত শর্তাবলী উল্লেখ থাকলেও এ মামলাটি দেখা যায় সময়ের সীমানাকে প্রসারিত করার জন্য মালিকের অধিকার পরিত্যাগ ও মৌণ সম্মতি বিষয়কে বিবেচনা করার বিষয় উঠে আসে যা পরবর্তীতে ভাড়া পরিশোধে বা জমা দানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। *Md. Golam Hossain v. Mst. Asia Khatun*[৩৩] মামলা তার একটি উদাহরণ।

এছাড়া ১৯৯১ সালে বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৯ ধারায় ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়ার যে ক্ষেত্র বিধৃত তার উল্লেখ্য ১৮ ধারার কথা এসেছে। মালিকের ভাড়া গ্রহণে অস্বীকৃতির ফলে ভাড়া জমাদানের জন্য ১৯(১) ধারায় যা বলা হয়েছে তা হলো, ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরিত ধারা ১৮ এ উল্লিখিত কোন ভাড়া; এখানে কোন সময়ের মধ্যে ডাক মনি অর্ডার যোগে ভাড়া পাটাতে হবে তার কিছু উল্লেখ নাই। উপরন্তু এ ধারাটি ১৮(৫) (খ) নিয়মের মধ্যেকার ভাড়া জমাদান বিষয়ের একটি ক্ষেত্র। ফলে ১৮(৫) (ক) ধারায় বর্ণিত সময় সীমার মধ্যে ভাড়া ডাক মনি অর্ডার যোগে প্রেরণের বিষয় এখানে আসে না। এছাড়া সময় সীমার ক্ষেত্রে আছে নিম্ন প্রকার ব্যতিক্রম যা ঐ সীমাকে প্রসারিত তথা বর্ধিত করেছে।

৮. সময় সীমার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমঃ

ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মামলায় মালিকের প্রদানকৃত রশিদ এবং অথবা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের কাছে ভাড়া জমা দেওয়ার চালান ভাড়া পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। প্রতি মাসের ভাড়া সাধারণতঃ পরবর্তী মাসের প্রথমার্ধে পরিশোধের প্রমাণের জন্য মাস মাস ভাড়া পরিশোধের মাস মাস রশিদ বা চালান থাকে। মাস মাস নির্ধারিত সময়ের মধ্যেকার রশিদ না থাকলে ভাড়া খেলাপীর অভিযোগ ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে আসতে পারে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসে। মালিক ভাড়া গ্রহণ করার পরও ভাড়াটিয়ার বিরুদ্ধে ভাড়া খেলাপীর অভিযোগ আনতে পারে যে ভাড়াটিয়া চুক্তির নির্দিষ্ট সময়ে বা তার অবর্তমানে ভাড়া মাসের পরবর্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ করেনি। ভাড়াটিয়া যদি তা খণ্ডণ করতে না পারে তবে সে ভাড়া খেলাপী গণ্য হয়ে

উচ্ছেদযোগ্য হবে। এ সময় পালনে অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিল পূর্বে। কিন্তু *Ramjan Ali Mistry*৩৪ মামলায় মালিকের আচরণগত কারণে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রমকে গ্রহণ করে ভাড়াটিয়াকে খেলাপী থেকে রক্ষা করেছে। তাতে মালিকের অধিকার পরিত্যাগের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধের ব্যর্থতা যদি মালিকের কারণে হয়ে থাকে তবে মালিক তার অধিকার পরিত্যাগ করেছে গণ্য হবে এবং ভাড়াটিয়া খেলাপী হবে না। *Md. Golam Hossain v. Mst. Asia Khatun*৩৫ মামলা নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধ না করার বিষয়ে মালিকের অধিকার প্রয়োগের ব্যর্থতার একটি সার্থক উদাহরণ। বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৮(৫) ধারার নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ভাড়া পরিশোধ না থাকার বিষয়ে এ মামলায় মালিকের বিরুদ্ধে অধিকার পরিত্যাগের অভিযোগ আনা হয়েছিল। ভাড়া আদায় বিষয়ক ঘটনা প্রবাহে তাতে তা প্রমাণিত গণ্য হয়েছে। তাতে উচ্ছেদের মামলা ঐ কারণে খারিজ হয়ে যায়।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ১৮(৫) ধারার সময় সীমার মধ্যে ভাড়া পরিশোধ না করাকে ঐ ধারার ব্যতিক্রম দেখানো হয়েছে।৩৬ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বিরাজিত দেশের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ভাড়া পরিশোধের ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার নিয়ন্ত্রণে ছিল না গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সময়ের ঐ পরিস্থিতি ভাড়াটিয়ার ভাড়া পরিশোধ না করাকে ভাড়া খেলাপী করেনি। ফলে ১৮(৫) ধারার নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ভাড়াটিয়া ভাড়া না দিয়েও ভাড়া খেলাপী হয়নি। এ মামলায় এও উঠে এসেছে যে মালিকের আচরণের কারণে ভাড়া পরিশোধে ভাড়াটিয়ার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারী বিষয়ে ১৮(৫) ধারায় বর্ণিত আইনে সমর্থন আছে।

৯. উপসংহারঃ

মালিকের ভাড়া গ্রহণের অস্বীকৃতি ভাড়াটিয়ার জন্য উচ্ছেদের কারণ হলেও আইনের নির্ধারিত নিয়ম-কানুনের যথাযথ অনুসরণ ভাড়াটিয়াকে অন্তত ঐ কারণে উচ্ছেদ থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হয়। বাস্তবতাকে লক্ষ্য রেখে ভাড়াটিয়ার মালিকের সাথে ভাড়াটিয়া সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত। ফলে ভাড়া খেলাপী না হওয়ার জন্য তৎপর থাকা প্রয়োজন। ভাড়া গ্রহণে মালিকের অস্বীকৃতির সাথে সাথে ভাড়াটিয়ার যা করণীয় তা করাতে যাতে তার বিলম্ব না ঘটে সে ব্যাপারটা তার মনের পিছনে যাওয়ার মানে তার স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়া।

তথ্য নির্দিশঃ

১. *Nowab Meah v. Nur Nahar Begum* BSCR (1983) 238
২. বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১, ধারা ১৮(১)
৩. ঐ
৪. ঐ, ধারা ১৮ (১) (ক)
৫. ঐ, ধারা ১৮ (১) (খ)
৬. ঐ, ধারা ১৮ (১) (গ)
৭. ঐ, ধারা ১৮ (১) (ঘ)
৮. ঐ, ধারা ১৮ (১) (ঙ)
৯. ঐ
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. ঐ, ধারা ১৯(১)
১৩. ঐ, ধারা ১৯(২)
১৪. ঐ, ধারা ১৯(৩)
১৫. ঐ, ধারা ১৯ (৪)
১৬. ঐ, ধারা ২ (ঙ)
১৭. *Abdul Aziz v. Md. Abdul Majid (1994)* 14 BLD (AD) 147
১৮. ঐ
১৯. *বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন,* ১৯৯১, ধারা ১৩(১)
২০. ঐ, ধারা ২৭
২১. ঐ, ধারা ২৯
২২. ঐ, ধারা ১৮ (৫)
২৩. *Atikullah v. Mosammat Rahela Bibi* (1994)46 DLR 494: 14 BLD(HCD) 360.
২৪. *Indra Kumar Paul v. Mvi. Sirejuddin Ahmed* (1979) 31 DLR 389
২৫. *Ramjan Ali Mistry v. Md. Hedayetullah* (1979) 31 DLR (SC) 183
২৬. *President, National Tuberculosis Relief and Rehabilitation Society v. M. Chowdhury* (1989) 41 DLR 103
২৭. *A K. M. Shamsuddin v. Dr. Aftabuddin Ahmed* (1992) 12 BLD (AD)1
২৮. *M/S A. Hoque and Co. v. Al-Haj Zakir Hossain* (1984) 4 BLD (AD) 298
২৯. *Ramjan Ali Mistry v. Md. Hedayetullah* (1978) 31 DLR (SC) 183
৩০. *Sheikh Mohd Salimullah v. Safiqul Alam* (1991) 43 DLR 113
৩১. *Sk. Md. Emaduddin v. Jasimuddin Mistry* (1973) 25 DLR 404
৩২. (1979) 31 DLR (SC) 183
৩৩. (1988) 40 DLR (AD) 1
৩৪. (1979) 31 DLR (SC)183
৩৫. (1988) 40 DLR (AD) 1
৩৬. *Kalu Mondal v. Begum Fazilatun Nessa* (1994) 46 DLR (AD) 53

বিংশ শতাব্দীর বাংলা

ডঃ মোহাম্মদ গোলাম রসুল

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই এমন কতকগুলি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়, যার প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন ভারতের ও বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহাওয়া অনেকটা বদলে যায়। ১৯০৫ সালে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে এক মুসলিম বঙ্গের সৃষ্টি হয় বড়লাট লর্ড কার্জনের আমলে। মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধার জন্যে তারা আত্মানিয়ন্ত্রণ দাবী করে। ঢাকার নওয়াব বাহাদুর সলিমুল্লাহ ও অন্যান্য নেতাদের প্রচেষ্টায় এই দাবী শেষ পর্যন্ত সমর্থিত হয় ও বাস্তবে রূপায়িত হয়। এই দাবীর পিছনে কংগ্রেস ও হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের সমর্থন ছিল না। তাঁরা পরে এর বিরোধিতা করেন এবং সন্ত্রাসী আন্দোলনও শুরু হয় এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। কবি রবীন্দ্রনাথও এ আন্দোলনে শামিল ছিলেন। তিনি বক্তৃতা দিয়ে ও গান রচনা করে এই আন্দোলনকে জোরদার করার প্রয়াস পান। অনেক হিন্দুনেতা এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়। শেষ অবধি এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেন ১৯১১ সালে[১]। ইংরেজ সরকার ঢাকার নওয়াব সলিমুল্লাহ সাহেবের কিছুটা মনোরঞ্জনের জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২০ সালে। মুসলিম সমাজ বলাবাহুল্য বিক্ষুব্ধ হয়। মুসলমানদের কিছুটা সান্তনা দেয়ার জন্য এই প্রচেষ্টা।

১৯০৬ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঢাকায় সর্বভারতের এক মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হোয়েছিল। ১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার আদায়ের জন্যে ও তাদের অস্তিত্বকে শক্তিশালী করার জন্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

এই সব কারণে রাজনীতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানদের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে হিন্দু-মুসলিম প্রতিযোগিতা শুরু হয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ক্রমান্বয়ে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিদ্বেষ ও কলহ বিবাদের সূত্রপাত হয়। যে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হোল তা হোল মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গভঙ্গ এবং পরবর্তীকালে তার নাকচ। বলা বাহুল্য, ইতিহাসেরও ইতিহাস আছে। যে কোন ঘটনা যখনই ঘটে তা হঠাৎ ঘটে না, তার পিছনে থাকে কিছু কারণ ও পটভূমি। তাছাড়া কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না।

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গভঙ্গের পিছনে ছিল কিছু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণ। হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ছিল এবং থাকাও স্বাভাবিক। যথা সম্ভব সমঝোতা তথাপিও সম্ভব, যদি পারস্পরিক কিছু বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া হয়। পরিতাপের বিষয় তা হিন্দু মুসলিম কিছু নেতার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও সম্ভবপর হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ঘোষণা করা হোয়েছিল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বলতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বোঝায় এবং এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে মুসলমান জাতি অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সুশোভন সরকার তাঁর *On the Bengal Renaissance* (Papyrus, Calcutta, 1974, p. 155) গ্রন্থে লিখেছেন

> "We cannot shake off the traditional equation-Indian culture Hindue culture the equation which has brought and still brings misfortune to us, in the woke of historical misunderstanding"

প্রফেসর সুশোভন সরকার ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিশ শতকের সতের দশকেও স্বীকার কোরে নিয়েছেন যে, হিন্দুরা ভারতীয় কাল কারকে হিন্দু কালচার মনে করে এবং তার ফলে দুই জাতির মধ্যে সমঝোতার অভাব হোয়েছে, এখনো হচ্ছে। সুতরাং মুসলমানদেরকে হিন্দুরা ভারতীয় বলে মেনে নিতে পারেনি।[২] পরবর্তী কালে দ্বিজাতিতত্ত্বের যে উদ্ভব ঘটেছিল তার পিছনে ছিল এই তিক্ততা।

তাছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* উপন্যাসে মুসলমান জাতিকে অত্যন্ত ঘৃন্য ও ন্যক্কারজনক ভাষায় গালাগালি কোরেছেন; মুসলমান জাতিকে '*যবন*' '*ম্লেচ্ছ*' ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত কোরেছেন। একথা সুশোভন সরকারও স্বীকার কোরে নিয়েছেন এবং বলেছেন, এর জবাবে মুসলমানরা হিন্দুদেরকে '*কাফের*' বলতে বাধ্য হোয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্রাহ্মনরা শূদ্রদের সংগে কী অমানুষিক ব্যবহার কোরেছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এছাড়া Young Bengal- যুগে বাংলায় ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে যে রেনেসাঁ এসেছিল তাতে হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মেহনতী জনতার সংগে কোন সম্পর্ক রাখেনি। তেমনই ব্যবধান ছিল মুসলমানদের সঙ্গেও।[৩] (*প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১৫৭)

অধিকন্তু, হিন্দুরা বেশীর ভাগই ইংরেজ রাজত্বের শোষনের দিকটা উপলব্ধি কোরতে সমর্থ হয়নি। এ বিষয়ে বহু প্রমাণ রয়ে গেছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ, যা পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হোয়েছিল, বাঙালী হিন্দুরা তা থেকে একেবারে সরে দাঁড়িয়েছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানরা ধন-প্রাণ বিসর্জন দিয়ে এদেশ থেকে ইংরেজ শাসনকে উৎখাত কোরতে চেয়েছিল। করাচীতে কংগ্রেস অধিবেশনে মওলানা হাসরাত মোহনী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন R. P. Dutt, *India Today* এই সব নানা কারণ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলমান তার নিজের সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ নামে এক স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় গঠন কোরতে বাধ্য হোয়েছিল। এর পূর্বে মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, আগা খান, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখ মুসলিম নেতারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই সভ্য ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, মুশিদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত সালারের অধিবাসী তৎকালীন পোষ্টাল সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হক সাহেব ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলীম লীগ গঠন কল্পে আহূত অধিবেশনে আমন্ত্রিত

ডেলিগেট হিসাবে উপস্থিত ছিলেন[৪] (ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে মুসলিম চিন্তা-চেতনার ধারা*, গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

১৯০৫ সালে বাংলা ও আসাম নিয়ে যে মুসলিম বাংলা গঠিত হয়, তারও মূলে ছিল মুসলমানীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী। সে দাবী স্বীকৃতি লাভ করে এবং তার ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায়, কৃষ্টি-কালচারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে।

কিন্তু বাংলার হিন্দু জমিদার, বুদ্ধিজীবিদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় বলে, বিশেষ কোরে বাংলা ও আসামে তাদের প্রভাব হ্রাস পায় বলে ক্ষুব্ধ হোয়ে উঠে। প্রবল আন্দোলন শুরু হয় দেশব্যাপী। বহু সভা ও বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথও সে আন্দোলনে যোগ দান করেন। অবশেষে ইংরেজ বিরোধী সন্ত্রাস আন্দোলনও প্রচন্ড হোয়ে উঠে। ছয় বছর পর ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ কোরতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হয়।* নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ইংরেজ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল স্থাপন করে ১৯২০ সালে।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে আবার ভারতীয় কংগ্রেসের সভ্য জাতীয়তাবাদী নেতা মওলানা শওকত আলী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, কায়েদে আযম জিন্নাহ মওলানা আযাদ প্রমুখ মুসলমানরা তখনো মুসলিম লীগ সমর্থন করেননি এবং মুসলিম স্বতন্ত্র আন্দোলনে যোগ দেননি। বরং ১৯০৯ সালে মর্লে-মিন্টো রিফরমস মুসলমানদের অনুকূলে স্বতন্ত্র নির্বাচনের (Separate electorate) দাবী মেনে নেয় তখন ১৯১০ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে মিঃ জিন্নাহ মর্লে-মিন্টো সংস্কারের কঠোর সমালোচনা করেন। তখন মওলানা মোহাম্মদ আলীর *কমরেড* পত্রিকা ও উর্দু *হামদর্দ* পত্রিকা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদ প্রচারে সোচ্চার ছিল। মওলানা জাফর আলীর পত্রিকা *জমিদার* ও একই ভূমিকা পালন করি।

এইসব ঘটনার পরেই এলো বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা। ১৯১১ সালে ১২ই ডিসেম্বর দিল্লী দরবারে নতুন সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন এবং কোলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতের রাজধানীতে স্থানান্তরিত করার ঘোষণা দেন। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

১৯১২ সালে তুরস্ক বিরোধী বলকান যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি তুরস্কের পক্ষে যায়। ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে এক সাহায্য মিশন প্রেরিত হয়। সেই মিশনের অন্তভূর্ক্ত ছিলেন সিরাজগঞ্জের সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজী, যাঁর *অনল প্রবাহ* ও *স্পেন বিজয় কাব্য* বিপুল খ্যাতি অর্জন কোরেছিল।

এরপরে ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত। একদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, অন্যদিকে জার্মানী, ইতালী ও তুরস্ক। মুসলমানরা তুরস্কের উসমানীয় খেলাফত রক্ষাকল্পে খেলাফত আন্দোলন শুরু করেন। আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও মহামান্য আগা খান ও সৈয়দ আমীর আলী

প্রমুখ নেতারা নেতৃত্ব দেন। ১৯২০–২১ সালে একযোগে খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা গ্রহণ কোরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোয়ে যুদ্ধে জয় করে ভারতের স্বাধীনতাদানে কোন আগ্রহ না দেখালে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। আগাখান, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ নেতারা তুরস্ক যান তুর্কী খেলাফতকে রক্ষা করার জন্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কামাল পাশাকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যে। কামাল পাশা পরাজিত তুরস্ককে রক্ষা কোরে শক্তিশালী করার ব্রত গ্রহণ কোরেছিলেন। গ্রীস, বৃটেন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে উদ্ধার কোরে তিনি তখন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। ভারতীয় নেতাদের অনুরোধ তিনি রক্ষা করেননি। তুরস্কের দুর্বল খেলাফতকে উচ্ছেদ কোরে তিনি স্বহস্তে ক্ষমতা নিয়ে দেশকে রক্ষা করেন। কামালপাশার বীরত্ব ও কৃতিত্বের প্রশংসা কোরে যুদ্ধকেরত হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'কামাল পাশা' নামে এক কবিতা রচনা করেন যার প্রথম লাইন হোল 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' এই কবিতার তুর্কী ভাষায় অনুবাদ তুর্কীদেরও অনুপ্রাণিত করে।

১৯২০ –২১ সালে কবি যুদ্ধ থেকে ফিরে কোলকাতায় আসেন। তাঁর আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এক নতুন জোয়ার নিয়ে আসে। কবি যুদ্ধকালে তাঁর শিবির থেকেই *ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, "বাউন্ডুলের আত্মকথা"* প্রভৃতি লিখে ফেলেন। সেগুলি প্রকাশিত হয়। সেখানে থাকতেই তিনি এক মৌলভী সাহেবের কাছে ফার্সী কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন। হাফেযের কিছু গযলেরও অনুবাদ করেন। সে গযলগুলির স্বাদও অনুপম। হাফেয শিরাজী ছিলেন ইরানের বাগিচার বুলবুল আর নজরুল ইসলামকে বলা যেতে পারে বাংলার গুলবাগিচার বুলবুল। ইরানের গযলের স্বাদ ও মাস্‌তি বা উন্মাদনা তিনি বাংলা গযলে আমদানী করেন। এছাড়া তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখে বাংলা সাহিত্যের নির্জীব স্নায়ুশিরায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন।

কবির উদার মানবিকতা তাঁকে হিন্দু–মুসলিম ঐক্য ও মিলনের প্রচেষ্টায় এক দিকে ইসলামী কবিতা ও গান রচনায় এবং অন্যদিকে শ্যামা সংগীত ও কীর্তন গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। ফলে হিন্দু–মুসলিম ঐতিহ্য তাঁর হাতে সমানভাবে রূপায়িত হোল বটে এবং প্রশংসা ও খ্যাতি অর্জন করেন ঠিকই। কিন্তু কিছু রক্ষনশীল মুসলমানদের অপ্রীতিভাজনও তিনি হন।

কবি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্যে অনেক জাগরনী কবিতা ও গান লিখেন এবং ইংরেজ সরকারের রোধে পতিত হন। তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি লিখেন...

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট।
.....
লাথি মার ভাঙবে তালা
যত সব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা।

এদিক থেকে তাঁর "*অগ্নিবীণা*" ও "*বিষের বাঁশী*" অনবদ্য রচনা। এগুলো ইংরেজ সরকার ঘোষণা কোরে বাজেয়াপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথও তাঁকে প্রশংসার কোরে তাঁর *বসন্ত* নাটিকা কবির নামে উৎসর্গ করেন। কবির প্রাণ-মাতানো বৈচিত্র্যপূর্ণ গান হিন্দু মুসলিম সকলকে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে। নিঃসন্দেহে তিনি স্বাধীনতার চেতনায় মানুষকে সঞ্জীবিত করেন। তাঁর '*কামাল পাশা,*' '*আনোয়ার পাশা,*' '*উমর ফারুক,*' '*খালেদ*', '*সাদ জগলুল*', '*মোহাররম*', '*কোরবানী*', '*বাজিছে দামামা*', '*খেয়াপারের তরণী*', '*তুইও ওঠ জেগে*' প্রভৃতি কবিতা ইসলামী আদর্শ, বীরত্ব ও স্বাধীনতার মন্ত্রে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। বিপ্লবীরাও তাঁর রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়। বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে কবির বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী ভূমিকা এবং তাঁর তেজস্বী রচনা ও বক্তৃতা মানুষের মনে সাহস ও প্রেরণা সঞ্চার করে। সত্যিই সেই সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য ও অদ্বিতীয়। মানবতার মহানবানী তাঁর *মানুষ, ফরিয়াদ, কুলিমজুর* প্রভৃতি কবিতায় ধ্বনিত হয়। সেই সময় এদেশের রাজনীতিতে কিছু অগ্নিপুরুষেরও আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হোলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর ভাবশিষ্য সুভাষ বোস। দেশবন্ধু ছিলেন প্রকৃত দেশ প্রেমিক; হিন্দু মুসলমানকে ঐক্য ও প্রীতির বন্ধনে তিনি বাঁধতে চেয়েছিলেন। সকল জাতিভেদ ও বৈষম্য ঘুচিয়ে সব মানুষকে তিনি সত্যিকার মানুষের মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলেন। চাকরীতে ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়েছিলেন কোলকাতা করপোরেশানের মেয়র থাকা কালে। বরং মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে যা প্রাপ্য ছিল তার চাইতে অনেক বেশী চাকুরী তারা পেয়েছিল। এতো বেশী তারা পেয়েছিল এই জন্যে যে, ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভে তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে একেবারে বঞ্চিত হোয়েছিল এবং হিন্দুরা পক্ষান্তরে অনেক বেশী ভোগ কোরে ছিল। এইভাবে দেশবন্ধু বঞ্চিত ও নিপীড়িত মুসলমানদেরকে বেশী চাকরী দিয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা কোরেছিলেন ক্ষতিপূরণ কোরতে। পাঁচটি বছর তাঁর মেয়র থাকা কালে মুসলমানরা সুবিচার পায়। এমন উদারতা ও মানবতা আর কোন হিন্দু নেতা দেখাতে পারেন নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি করেন নি। পরস্পর মেলামেশা, খাওয়া দাওয়ায় তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যে বেঙ্গল প্যাকেট কোরেছিলেন, যা অনুসরণ কোরলে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্নতা দেশ থেকে একেবারে দূরীভূত হোত। দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯২৫ সালে তিনি দার্জিলিং-এ পরলোক গমন কোরলে তাঁর আদর্শ অনুসৃত হয়নি। তাহোলে দাঙ্গা বন্ধ হোয়ে যেত এবং দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হোত। এই মহানুভব নেতার গুনাবলীর ভূয়সী প্রশংসা কোরেছেন রজনী পাম দত্ত তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *India To-day*-তে।

যে দাঙ্গা কয়েক বছর বন্ধ ছিল তা আবার শুরু হোয়ে যায়। ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে কয়েকটি গোল টেবিল বৈঠক হয় লন্ডনে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্যে। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সমঝোতা হয়নি। মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু ঘটে বিদেশেই। তিনি যা চেয়েছিলেন তাই হোয়েছে। তিনি বিলেত যাবার আগে বলেছিলেন যদি ভারত স্বাধীন হয় তবে যেন ফিরে আসি দেশে, নতুবা স্বাধীন দেশ বিলেতেই যেন আমার মৃত্যু হয়। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা আল্লাহ কবুল

করে নিয়েছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন পন্ডিত, তেমনই ছিলেন লেখক ও বক্তা। তিনি বিলেতে তাঁর বাগ্মিতা ও পান্ডিত্যের জন্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর আর এক মোহাম্মদ আলীর হাতে মুসলিম ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ন্যস্ত হয়। মৃত্যুর আগে কংগ্রেসের সভ্য ও হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়াসী মওলানা মোহাম্মদ আলী শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি কোরতে বাধ্য হোয়েছিলেন যে, মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, হিন্দু মুসলিম মিলনের সম্ভাবনা দুরাশা। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। মুসলিম লীগে যোগদান কোরতে পছন্দ করেন নি, যদিও তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। তিনিও স্বপ্নে দেখছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের। তাঁর স্বপ্নও ভেঙ্গে গেল। তিনিও বুঝলেন মরীচিকার পিছনে ছুটে কোন লাভ হবে না। মিঃ জিন্নাকে সরোজিনি নাইডু সম্মান দিয়েছিলেন *Ambassador of Hindu-Muslim Unity* উপাধি দিয়ে। সেই ব্যক্তিটিও হতাশ হোয়ে মুসলিম লীগে যোগ দিলেন। এখন তিনিই হোলেন জাতির কর্ণধার এবং মুসলমানদের পরিত্রাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে হাল ধরলেন। আল্লামা কবি ইকবাল তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। পাকিস্তান নামে এক নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টির জন্যে তিনি মনে প্রাণে নিজকে উৎসর্গ কোরলেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোলো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১ বছর পর কায়েদে আযম ইনতেকাল করেন ও ১৯৫১ সালে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী প্রশাসনিক এক ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন। ব্যুরোক্রাটদের হাতে পড়ে প্রশাসনিক দুর্বলতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার অভাব, অগণতান্ত্রিক মনোভাব ও সর্বোপরি চারিত্রিক অধঃপতন ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েম হওয়ার পরিবর্তে অনৈসলামিক ও ধ্বংসাত্মক কার্য কলাপ শুরু হয়। ক্ষমতার লড়াই এর ফলে আদর্শের ও লক্ষ্যের অপমৃত্যু ঘটে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালী-অবাঙালীর সংঘাত বাড়তে থাকে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবীতে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের দশ বছর শাসনের পর ১৯৭১ সালে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এহিয়া খানের আমলে এহিয়া-ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপে সংঘাত চরমে উঠে। নির্বাচনের রায় অমান্য কোরে বাঙালীদের সাফল্যকে স্বীকৃতি না দিলে প্রচন্ড সংঘর্ষ বাধে।

এবার একটু পিছন ফিরে দেখা যাক? আমরা বিংশ শতকের বাংলার সমগ্র রূপটা কী দেখতে পাই। শুরু থেকেই ১৯৪৭ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা কোরেছি তা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে যে, এই শতকের প্রথম অর্ধেকটা ছিল অপূর্ব গৌরবের যুগ। কারণ হিন্দু ও মুসলিম প্রতিভার অপরূপ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্র-শরৎপ্রতিভার একদিকে চূড়ান্ত, সমৃদ্ধি, আবার সেই সঙ্গে রবীন্দ্রোত্তর যুগ কাব্যসাহিত্যের নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সমৃদ্ধিও লক্ষ্যমাত্রা। কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাফল্যের স্বাক্ষর বাংলা সাহিত্যে রয়ে গেছে। সর্বতোমুখী প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সোনার ফসলে সাহিত্যের সব শাখা-প্রশাখা ভরে

উঠেছে, এবং অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অবদানে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সোনার ফসল ফলেছে, তথাপিও উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আরও নতুন নতুন ও বিচিত্র অবদান বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছে।

তেমনই কাব্যে ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের পরও নতুন দিগন্ত খুলে গেছে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী গভীর কাব্য ও সংগীতের ফসলে যখন আমরা বাংলা সাহিত্যের এক অপরূপ রূপ দেখছি, ঠিক তখনই কবি নজরুলের চমকপ্রদ আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। নজরুল এলেন বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণ যুগে, যখন আবির্ভূত হোলেন সে আসর হোয়ে উঠলো আরও জমজমাট। সেই সোনালী যুগের শৈলজানন্দ, প্রেমেন মিত্র, অচিন্ত্য সেন গুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিকরা ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপাল। তাঁদের মাঝে কবি সমাদর ও সম্মান লাভ কোরলেন বিপুল মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক মীর মোশাররফ হোসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ আবদুর রহিম, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, ডঃ শহীদুল্লাহ, কাজী ইমদাদুল হক, এস ওয়াজেদ আলী, কবি গোলাম মোস্তফা, কবি জসীমউদ্দীন, কবি শাহাদাত হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আরও অনেকে প্রখ্যাত। কবি নজরুলের কবিতা, গান, বক্তৃতা বাংলার ঘরে ঘরে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগলো। হিন্দু-মুসলমানের সকলের প্রিয় হোলেন কবি তাঁর উদারতা, মানবিকতা ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের বলে। হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য-ইতিহাসকে সজীব কোরে তুললেন তাঁর কাব্যে ও সংগীতে। বাংলা ভাষার এক নতুন শ্রী ও শক্তি নিয়ে এলেন নজরুল। বাংলা সাহিত্যে তিনি যেমন ক্ষুরধার বাণী নিয়ে এলেন, তেমনি নিয়ে এলেন এক অভূতপূর্ব রোমান্টিক ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য। কবির নিজের ভাষায়- '*এক হাতে মম বাঁশের বাঁশরী আর এক হাতে রণতূর্য।*'

তাঁর '*অগ্নিবীনা,* '*বিষের বাঁশী*তে জলদগম্ভীর বিদ্রোহের হুঙ্কার, আবার উপন্যাস '*ব্যাথার দান*' তাঁর গযল গানের ভাষা কী অপরূপ লাবণ্যময় সুন্দর! একদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অন্যায় অনাচার ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বজ্রকঠোর-বাণী, অন্যদিকে কবি হাফিযের মরমীয়া ভাবধারা ও প্রেমের মদিরায় পরিপূর্ণ ফার্সী গযলের স্বাদ নজরুল বাংলা গযলের মধ্যে আমদানী কোরলেন। ইরানের গযলের বাগিচা ও বুলবুলের সুষমা-সুরভি কবি বাংলা গযলে আমাদের দিলেন। সংগীত জগতে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হোল। তাঁর বিবিধ, বিচিত্র গানে ভাব, ভাষা, সুরের এক অপূর্ব মিলন ঘটলো। বস্তুতঃ বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে যে মুসলিম রেনেসাঁ এসেছিল সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার মধ্যমনি ছিলেন নজরুল। রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা অতুলনীয়। বাংলা সাহিত্যের আসরে কবি নজরুলের পর উদীয়মান কবি ফররুখ আহমদের খ্যাতি কোলকাতাতেও শোনা গিয়েছিল। কবি নজরুল তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। দেশ বিভাগের কালে কবি নজরুলের পর যে কবি সর্বাপেক্ষা স্মরণযোগ্য, তিনিই কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর '*সাত সাগরের মাঝি*' '*পাঞ্জেরী*' '*লাশ*' প্রভৃতি কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের

অমূল্য সম্পদ। কবি নজরুলের '*মানুষ*' '*কুলি মজুর*' '*ফরিয়াদ*' প্রভৃতি কবিতার পর কবি ফররুখ আহমেদই কেবল এমন বলিষ্ঠ, মর্মস্পর্শী কবিতা জাতিকে দেশকে, মানুষকে উপহার দিয়ে গেছেন। "*পাঞ্জেরী,*" কবিতায় "*রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী,*" এই লাইনটি বারবার প্রতি স্তবকের শেষে, আগে এতে কবির ব্যাকুলতা জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে মূর্ত হোয়ে উঠেছে। 'লাশ' কবিতাটিতে ফররুখ বলেন–

জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরনীর 'পর
ক্ষুধিত অসাড় তনু বক্রিশ নাড়ীর তাপে পড়ে আছে, নিসাড় নিথর
পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর।

বর্তমান জড়বাদী নিষ্ঠুর সভ্যতার পৈশাচিক, অমানবিক মুখোশ তিনি খুলে ধরেছেন এসব মর্মস্পর্শী কবিতায় যা একমাত্র নজরুল ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাতেই দেখা যায়। সুকান্ত তাঁর 'রানার' কবিতায় আর্ত, নির্যাতীত মানবতার এক করুণ, মর্মন্তুদ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁরা বস্তুতঃ দুঃসহ মানবতার দরদী কবি।

অত্যন্ত পরিতাপ ও লজ্জার বিষয় যে, এই সব কবিকে চরম দুঃখ কষ্টে দিন কাটাতে হোয়েছে। তাই তাঁদের হাতে দুঃসহ মানবতার বেদনা এমন হৃদয়গ্রাহী হোয়ে ফুটে উঠেছে। কবি ফররুখ আহমদকে তো এক শ্রেণীর হৃদয়হীন বুদ্ধিজীবিদের ষড়যন্ত্রের শিকার হোয়ে প্রাণ দিতে হোয়েছে অসহায় পুত্রকণ্যা নিয়ে। জাতি ও দেশের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মুছে যাবার নয়। নজরুল ইসলামের মতো ফররুখ আহমদও ছিলেন আপোষহীন বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার ও ভন্ডামীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী পুরুষ। দেশ ও জাতির কাছ থেকে তাঁরা ন্যায্য সমাদর ও সম্মান পাননি। তবে তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ মহাবিচারক স্রষ্টার কাছে তাঁদের ত্যাগ ও প্রতিভার মরনোত্তর পুরষ্কার পাবেন।

এখানে একটি ঘটনা, যা মুসলমান শুধু নয়, হিন্দুরও ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে তা হোল দেশবিভাগ। এই দেশবিভাগ কোন ন্যায়–নীতি অনুসরণ কোরে হয়নি। বিশেষ কোরে মুসলমানরাই বিশেষভাবে বঞ্চিত হোয়েছে। মুসলমানরা যে পাকিস্তান লাভ করে তার আয়তন ভারতের তুলনায় অনেক ছোট এবং তাও অনেক জেলা বাংলাদেশে খণ্ডিত আকারে গিয়েছে। পাঞ্জাব প্রদেশও অখণ্ড থাকেনি। এর ফলে নানা সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে এবং সীমান্ত বিরোধও ঘটেছে। নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের এটা ছিল গোটা উপমহাদেশের উপর চরম আঘাত। স্বাধীনতা এলো, কিন্তু সুখ এলো না; এলো নানা সমস্যা জর্জরিত স্বাধীনতা।

অতীতে কায়েদে আযম, আলী ভ্রাতৃদ্বয়, এ. কে. ফযলুল হক, শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দি, সৈয়দ বদরুদ্দীন প্রমুখ নেতাদের প্রশংসনীয় ভূমিকার পর এলো বিভাগোত্তর কালে বাংলায় এক ব্যর্থতা ও বিপর্যয়ের যুগ। ১৯৭১ সালে নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে মন্ত্রীত্ব গঠন কোরতে দেয়া হয়না। জুলফিকার ভুট্টোর কুপরামর্শে এহিয়া খান শেখ মুজিবকে ক্ষমতা

হস্তান্তর না করায় পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাব বাঙালী মুসলমানদের স্বভাবতই জেগে উঠে। বস্তুতঃ এহিয়া-ভুট্টোর কারসাজিতে পাকিস্তান ভেঙে যায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এদেশে। নয়মাস সংগ্রামের পর পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশ কায়েম হয়। এহিয়া ও ভুট্টো উভয়েই ছিলেন অদূরদর্শী। অধিকন্তু ভুট্টোর দুরাকাঙ্খা পাকিস্তানের সর্বনাশ নিয়ে এলো। ক্ষমতার লালসা ও চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পতনের মূল কারণ।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যেই পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। দেশবিভাগের ফলে মুসলমান জাতির উত্থানের পরিবর্তে অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। যোগ্য, চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ নেতার অভাবে মুসলমান জাতির বিরাট সম্ভাবনা মরিচিকার মতো উঠে গেল।

বিংশ শতাব্দী অবসানপ্রায়। একাদশ শতাব্দীর আসন্নপ্রায়। জানিনা, এদেশ ও জাতির ভাগ্যে কী আছে? এ যাবৎ ঘটনা পরিক্রমায় সুদিনের আশা তেমন উজ্জ্বল মনে হয় না।

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের অবসান হোয়ে পাকিস্তানের অখণ্ডতা নষ্ট হওয়ার পিছনে যে প্রধান কারণ ক্রিয়াশীল ছিল তা হোল জাতীয়তাবোধের অভাব। ধর্মকে পাকিস্তানের ভিত্তি কোরে পাকিস্তান আন্দোলন হোল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্ম তথা ইসলাম বাস্তবায়িত হোল না, ইসলামকে শুধু শ্লোগানে পরিণত করা হোল স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবে। তদুপরি জাতীয়তাবোধও গড়ে উঠলো না, পাকিস্তানের দুই খণ্ডের মধ্যে একাত্মতা বা সহমর্মিতাও সৃষ্টি হোল না। এর পরিণামে পাকিস্তনের এক অঞ্চল হাতছাড়া হোল। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, যে-কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতাশালী হওয়ার মূলে দুটি শক্তি ক্রিয়াশীল থাকতে হবে- একটি *আসাবিয়া* (ইবনে খালদুনের ভাষায়) বা জাতীয়তাবোধ, আর অপরটি ধর্ম বা আদর্শ। উভয়ের সম্মিলনে রাষ্ট্র গঠিত হবে, যার সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মহানবী (সঃ) কর্তৃক মদিনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এটা না হোলে ইবনে খালদুনের বিশ্ববিশ্রুত মোকাদ্দিসার মতে কোন রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হোতে পারে না।

টীকা

১। নওয়াব সলিমুল্লাহ, মওলানা মোহাম্মদ আলী যেওহর ও অন্যান্য মুসলিম নেতারা এতে বিক্ষুব্ধ হন।

২। রবীন্দ্রনাথও তাঁর *কালান্তর* গ্রন্থের *হিন্দু-মুসলমান সমস্যা* প্রবন্ধে হিন্দুদের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা কোরেছেন।

৩। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ অবসানের আপ্রাণ চেষ্টা কোরেও স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র আন্দোলনের পরামর্শ দেন।

৪। আমি স্বয়ং সালারের অধিবাসী ছিলাম। সালারের সন্নিকটে তাশিবপুরের অধিবাসী যিল্লুর রহমান নওয়াব আবদুল লতিফের Muhammuedin Literary Society'র সভ্য ছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Franz Rosenthal, English Tramslation of Ibn Khaldun's *Muqaddimah* (London, 1958).

Hector Bolitho, *Jinnah*, (Karachi O. U. P. Londan, 1954 (1964 Rep.) Jawaharlal Nehru, *The Discovery of India* (Calcutta, 1946; Delhi, 1995 Rep.)

Rajani Palme Dutt, *India Today* , (Calcutta, 1979 Rep.)

Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissarnce* (Calcutta, Papyrus, 1979)

মোহাম্মদ মোদাব্বের। *ইতিহাস কথা কয়* (ঢাকা, ১৯৮১)

ডাঃ আবদুল ওয়াহিদ, *উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান* (ঢাকা, ১৯৮৩)।

ডঃ ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে মুসলিম চিন্তা-চেতনার ধারা* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

বিংশ শতাব্দীর বাংলা : শব্দের রূপ বৈচিত্র্য ও বানান-বিভ্রাট

স্বরোচিষ সরকার

সূচনা

ভাষার বিবর্তন দৃশ্যযোগ হয় ভাষার যেসব উপাদানে, মুদ্রিত শব্দ তার অন্যতম। গ্রিক, ল্যাটিন বা সংস্কৃত মৃত ভাষা– এদের কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু বাংলা ভাষার মতো একটি জীবন্ত ভাষা সময়ের ব্যবধানে শব্দের চেহারাতে নানা ধরনের পরিবর্তনের ছাপ রাখে। একই কারণে বাংলা শব্দের একশো বা হাজার বছরের পুরনো চেহারা আর বর্তমান চেহারা এক নয়। ভাষার এই বিবর্তনকে আমোঘ ও অনতিক্রম্য মেনে নিয়েও আধুনিককালের ভাষা ব্যবহারকারী কোনো নির্দিষ্ট কালপরিধিতে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির সুনির্দিষ্ট অবয়ব দাবি করতে পারেন। প্রায় আড়াইশো বছর আগে থেকে ইংরেজি ভাষায় যার দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে। ১৭৫৫ সালে স্যামুয়েল জনসনের A Dictionary of the English Language প্রকাশের পূর্বে ইংরেজি ভাষা ছিলো বহু দিক দিয়ে বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণহীন ও মানরূপশূন্য।[১] স্বাভাবিকভাবে ইংরেজি শব্দের বানানেও বিশেষ কোনো শৃঙ্খলা ছিলো না। আঠারো শতকে ইংরেজদের বিশুদ্ধি প্রবণতার সঙ্গে উক্ত অভিধানের শাসন যুক্ত হয়ে ভাষার অন্যান্য উপাদানের পাশাপাশি ইংরেজি শব্দের রূপেও মোটামুটি স্থিরতা আসে, যা এখানো পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পালিত হয়ে আসছে। একইভাবে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারীও ভাষার শৃঙ্খলাহীনতা ও বানান বিভ্রাটের পরিবর্তে সুস্থিত কোনো অবস্থার প্রত্যাশী হবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি শতক। এই শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অসংখ্য প্রতিভাবান সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হন। শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাষা–আন্দোলন নামে একটি যুগান্ত সৃষ্টিকারী রাজনীতিক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিলো। শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। পুরো শতাব্দী জুড়ে বাংলা ভাষায় যতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা পূর্বের যে কোনো শতাব্দীর তুলনায় গুণগত ও পরিমাণগত সব দিক দিয়েই বেশি। দৈনন্দিন ও জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষার ব্যবহারের কথা বিচার করলেও অন্যান্য শতাব্দীর তুলনায় এ শতাব্দী অনেক গুণ এগিয়ে। সাধারণ ধারণায় এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, ব্যাপকভাবে চর্চার অভাব কোনো ভাষার সুস্থিত মানরূপ সৃষ্টির অন্তরায়। কিন্তু বাংলা ভাষার এমন ব্যাপক চর্চা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাংলা শব্দের অবয়ব পূর্ববর্তী দশকগুলোর মতোই নানা রকম বিকল্প বানান দ্বারা স্বীকৃত, যা ভাষার বিশৃঙ্খল অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

সমস্যাটি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা খুব কম হয়েছে, তা নয়। বস্তুত পুরো শতাব্দী জুড়ে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট লেখক ও পণ্ডিতগণ বাংলা শব্দের অবয়বকে একটা সুস্থিত মানে উন্নীত করতে কখনো ব্যক্তিগতভাবে কখনো সঙ্ঘবদ্ধভাবে নানা ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। হরফ সংস্কার, বানান সংস্কার, রীতি সংস্কার প্রভৃতি নানা ধরনের সংস্কার প্রচেষ্টা সেসব উদ্যোগের বহিঃপ্রকাশ। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের অনেক প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের লেখায় এসব সংস্কার প্রচেষ্টার ইতিবাচক প্রভাব কম বেশি পড়তে দেখা যায়। তবে সংস্কার প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে বুমেরাং হয়ে নতুন নতুন জটিলতা ও বিভ্রাটের জন্ম দিয়েছে, সে কথাও সত্যি। বর্তমান নিবন্ধে বিংশ শতাব্দীর বাংলা শব্দের এই অবয়ব-বৈচিত্র্য, সংস্কার-উদ্যোগ ও প্রাসঙ্গিক কিছু জটিলতার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হবে।

হরফ

হরফ হলো মুদ্রিত শব্দের একক। বর্তমানে বাংলা মুদ্রণের জন্য যেসব হরফ ব্যবহৃত হয়, তার ইতিহাস খুব দীর্ঘকালের নয়। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণ লেখার সময়ে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে যে বাংলা হরফ নির্মাণ করিয়েছিলেন, তা ছিলো একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। প্রথম ভালোভাবে কাজ চালানোর মতো হরফ তৈরি করেন জেসুয়া মার্শম্যান ১৮১৮ সালে। এরপর ১৮৫৫ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণের সময়ে বাংলা হরফের যে আদ্যন্ত সংস্কার করেন, এখনো পর্যন্ত তা বাংলা হরফের আদর্শ।[২] বাংলা মৌলিক ও যুক্তাক্ষরের যে চেহারা বিদ্যাসাগর দান করেছিলেন, হ্যান্ড-কম্পোজের যুগ পেরিয়ে কম্পিউটার কম্পোজের যুগেও তার আদল প্রায় একই রকম আছে। সে সময়ে হাতে কম্পোজ করার জন্য ৫৬৩ প্রকারের বাংলা হরফের দরকার হতো (যার মধ্যে ৪৭৪টি বিভিন্ন প্রকারের টাইপ, ৪৯টি বিভিন্ন চিহ্ন, স্পেস প্রভৃতি এবং ৪০টি কর্ন (Kerned) টাইপ- মোট ৪৭৪ + ৪৯ + ৪০= ৫৬৩টি)।[৩] পরে অবশ্য বিভিন্ন যুক্তাক্ষরকে সরল করার মধ্য দিয়ে এর সংখ্যা সাড়ে চারশোতে এসে দাঁড়ায়।

এই বিপুল সংখ্যক হরফ নিয়ে উনিশ শতকের বাংলা মুদ্রণের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং হরফের এই চেহারাতেই বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা মুদ্রিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের হরফ সংস্কারের পর সমগ্র উনিশ শতকে এর কোনো সমালোচনা হয়নি তা নয়। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা মাত্র ৮২টি বর্ণের মাধ্যমে বাংলা মুদ্রণ সম্ভব বলে একটি দীর্ঘ যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করে।[৪] তবে এসব প্রস্তাবের কোনো প্রভাব উনিশ শতকের বাংলা বর্ণমালায় বা বাংলা হরফে পড়েনি। শতাব্দীর গোড়ায় ১৯০৯ সালের প্রবাসী পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের যে প্রস্তাব করেছিলেন, ১৮৭৮ সালে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাবের চাইতে তা ছিলো বহুগুণে ঐতিহ্য-ছেঁড়া।[৫]

পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ জাতীয় সংস্কার প্রস্তাবের কয়েকটি রূপান্তর বিশেষভাবে চোখে পড়ে। আবু ইসহাক (১৯৫১), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৯৫২), ফেরদাউস খান (১৯৫৭), মোফজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯৬২) ও বাংলা একাডেমী (১৯৬৩) উত্থাপিত বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাবসমূহ এর মধ্যে অন্যতম।[৬]

ঐতিহ্য-ছেঁড়া এসব সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ না করলেও যুক্তাক্ষরের আদল পরিবর্তন সম্পর্কিত কিছু প্রস্তাব বাংলা ভাষাকে অনেকটা দায়ে পড়ে মেনে নিতে হয় এবং সঙ্গত কারণেই তা মুদ্রিত বাংলা ভাষার চেহারায় নানা রকম বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। হরফের এ বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রধান যে কারণ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তা হলো: এক, মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রকৃতির পরিবর্তন ও মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের আবির্ভাব; এবং দুই, বিভিন্ন যুক্তির বর্ণমালা সংস্কার। প্রথম কারণটি যান্ত্রিক আর দ্বিতীয় কারণটি যৌক্তিক। কারণ দুটি একত্রে বাংলা হরফে কিভাবে বৈচিত্র্য এনেছে তার দু একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে:

পীঠিকা-১

মূল যুক্তাক্ষর	যান্ত্রিক বৈচিত্র্য	যৌক্তিক বৈচিত্র্য	মোট বৈচিত্র্য
ষ্ট	ষ্ট ষ্ট ষ্ট	স্ট স্ট স্ট	ষ্ট ষ্ট ষ্ট স্ট স্ট স্ট (৬)
ণ্ড	ণ্ড ণ্ড	ন্ড ন্ড	ণ্ড ণ্ড ন্ড ন্ড (৪)
ঙ্গ	ঙ্গ ঙ্গ	ঙ্গ	ঙ্গ ঙ্গ ঙ্গ (৩)
ঙ্ক	ঙ্ক ঙ্ক	ংক	ঙ্ক ঙ্ক ংক (৩)
স্ক	স্ক স্ক স্ক		স্ক স্ক স্ক (৩)
দ্ধ	দ্ধ দ্ধ দ্ধ দ্ধ		দ্ধ দ্ধ দ্ধ দ্ধ (৪)
স্ত্র	স্ত্র স্ত্র স্ত্র স্ত্র		স্ত্র স্ত্র স্ত্র স্ত্র (৪)
শ্ব	শ্ব শ্ব		শ্ব শ্ব (২)
হ্ম	হ্ম	হ্ম হ্ম	হ্ম হ্ম হ্ম (৩)
গু	গু	গু	গু গু (২)

অর্থাৎ এতে দেখা যাচ্ছে, বাংলায় পূর্বে যেখানে ১০টি হরফ দিয়ে কাজ চালানো যেতো, বিশ শতকে নানা কারণে সেখানে আরো ২৪টির মতো (অর্থাৎ মোট ৩৪টি) হরফের জন্ম হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এসব হরফে তৈরি শব্দের চেহারাও এ অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে। অঙ্কশাস্ত্রের পারমুটেশন-কমবিনেশনের হিসেবে এতে শব্দের চেহারা কতো বিচিত্র হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

আশার কথা এই, খুব কম ক্ষেত্রেই বাংলা বর্ণমালা যৌক্তিক কারণগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। ভাষার অন্তঃস্থিত রক্ষণশীল প্রবণতা ঐ অগ্রহণযোগ্যতার কারণ। তবে যান্ত্রিক

কারণগুলোকে এড়ানো কঠিন ছিলো– যা বাংলা হরফের গায়ে, একই সঙ্গে বাংলা হরফের ইতিহাসে অনেকটা কলঙ্কচিহ্নের মতো কিছুদিনের জন্য লেগে রইলো। বিশ শতকের বাংলা হরফের ইতিহাসে এ এক অপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অবদানের স্বাক্ষর।

যান্ত্রিক কারণে বাংলা হরফের বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিলো মুদ্রাক্ষর যন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্রের লাইনো টাইপের কারণে। অল্প টাইপে অধিক যুক্তাক্ষর তৈরি করতে গিয়ে এটা হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর আশির দশকে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে বাংলা কম্পোজ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তাক্ষর লেখায় আর কোনো সমস্যা নেই। সংযোগ সূত্রের মাধ্যমে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিতে প্রয়োজনে এখন ৬৫,৫৩৬টি ক্যারাকটারকে পর্যন্ত আলাদাভাবে এন্ট্রি করা সম্ভব।[৭]

বর্তমান শতাব্দীতে মুদ্রণ সারল্য ও শিশুর মগজের ওপর বোঝা কমানোর যুক্তিতে কিছু যুক্তাক্ষরকে স্বচ্ছ করার প্রস্তাব বহু ব্যক্তি ও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির ক্ষমতার কথা ভাবতে পারলে এরা হয়তো মুদ্রণ সারল্য নিয়ে এতোটা চিন্তিত না হতেও পারতেন। অন্যদিকে শিশুর মগজের ওপর বোঝা কমানোর যে সদিচ্ছা থেকে তাঁরা হরফের সংখ্যা হ্রাস করতে চেয়েছেন, তাতে হিতে বিপরীত কি পরিমাণ হয়েছে ওপরের পীঠিকাটি থেকে তা খানিকটা আঁচ করা যাবে। এমনও হতে পারে হরফের স্বচ্ছরূপের প্রস্তাবকগণ লাইনো ও মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের শব্দের অবয়ব দ্বারা নিজেদের অলক্ষ্যে প্রভাবিত হয়ে আছেন অথবা তার মায়া ছাড়তে পারছেন না। অযথা মানব–মস্তিস্কের গ্রহণ ক্ষমতা নিয়ে ভাবছেন, আর একইসঙ্গে জটিলতা বাড়াচ্ছেন।[৮]

উক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে প্রণীত ১৯৯২ সালের পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব এবং একই বছরের বাংলা একাডেমীর সংস্কার প্রস্তাব প্রায় সমশ্রেণীর। বিস্ময়করভাবে ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমিও হরফের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু সংস্কার প্রস্তাব করে, ভাষার ওপর যার প্রভাবের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দুই দেশের এই অ্যাকাডেমি দুটোকে প্রতিনিধিত্বশীল গণ্য করে বর্ণমালা সম্পর্কে এদের মনোভাবের পরিচয় নেওয়া যাক।

১৯৯২ সালে প্রকাশিত বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম শীর্ষক পুস্তিকার ৩.০১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমন গু, রু, শু, দ্রু, শ্রু, রূ, ভ্রু, হৃ, ত্রু, ভ্রু।"[৯]

বাংলা একাডেমী তার নিয়মের দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে নিজেই নিজের নিয়ম রক্ষা করেনি। ভ–এর নিচে র–ফলা দেখানো হয়েছে, আবার ভ্র–তে উ–কার দেওয়া হয়েছে ভ–এর পুরাতন রূপের সঙ্গে। এতে দেখা যাচ্ছে বহুকাল ব্যবহৃত যুক্তাক্ষরটি নীতিপ্রণেতাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে

যথারীতি দৃষ্টান্তের মধ্যে জায়গা দখল করে বসে আছে। অর্থাৎ বাংলা একাডেমীর এই যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করার যুক্তি মেনে নেওয়ার অর্থ যুক্তব্যঞ্জনের চেহারায় আরো অধিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। এ নীতি অনুসারে 'ত্রুটি'কে লিখতে হবে 'ত্রুটি' রূপে; ভ্রূকুটি' কে লিখতে হবে 'ভ্রূকুটি' রূপে, এবং প্রস্তাবিত বানান নীতি অনুযায়ী উ–কার লাগালে অতিরিক্ত আরো তিনটি রূপে অর্থাৎ এর ফলে বাংলা ভাষার এক ভ্রূকুটি বহুধা বিভক্ত হয়ে মুদ্রিত কাগজের যত্রতত্র ভ্রূকুটি করতে থাকবে।

১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ শীর্ষক যে সুপারিশপত্র প্রণয়ন করেছে, বাংলা একাডেমীর মতামতের সঙ্গে তা প্রায় অভিন্ন। এরাও যুক্তব্যঞ্জনের স্বচ্ছরূপ দেখতে চান, এবং সেই অনুসারে সুপারিশ করেন। এদের ১,১১ অনুচ্ছেদের প্রস্তাব নিম্নরূপ: "সর্বত্র ব্যঞ্জন ও স্বরচিহ্নের প্রধান রূপটি যোগ করেই যুক্তচিহ্ন তৈরি করা হোক। যেমন কু, গু, তু, (ন্তু) রু,শু, হু, ত্রু, ধ্রু,।[১০] বাংলা একাডেমীর নিয়মের মধ্যে যেমন 'ভ্র' ভ্রূকুটি করেছিলো, এখানে একইভাবে 'ত্রু'টির মধ্যে 'ত্র' এসে লুকিয়ে থাকে।

বাংলা যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছরূপের কোনো তালিকা বাংলা একাডেমী দেয়নি, বাংলা আকাদেমি দিয়েছে। তালিকাটিতে ক্ত, ক্র, গ্ধ, ঙ্ক, ঙ্গ, ঞ্চ, ঞ্ড, দ্ধ, ন্থ, ন্ধ, ষ্ণ, স্থ, হ্ম ইত্যাদিকে যথাক্রমে কত, ক্র, গধ, ঙক, ঙগ, ঞচ, ঞড, দধ, নথ, নধ, ষণ, স্থ, হম ইত্যাদি রূপে লেখা হোক বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্ণের এ স্বচ্ছনীতি অনুসারে কৃষ্ণ এবং ব্রাহ্মণ-কে লিখতে হবে যথাক্রমে কৃষণ ও ব্রাহমণ। এতে কৃষ্ণের চেহারা বদলে যাবে এবং ব্রাহ্মণ চেনা কঠিন হয়ে পড়বে।

বাংলা একাডেমী ও বাংলা আকাদেমির প্রস্তাবে হরফের যে অবয়ব প্রত্যাশিত, তাতে প্রস্তাবকদের মনে মুদ্রাক্ষর যন্ত্র ও লাইনো টাইপের পরোক্ষ প্রভাব কাজ করেছে বলে মনে হয়। কিন্তু মুদ্রাক্ষর যন্ত্র ও লাইনো মেশিনের সুবিধার জন্য যে হরফের জন্ম হয়েছিলো, তাকে মূল বাংলা হরফের বিকল্পরূপে মর্যাদাপূর্ণ করা বাংলা হরফের প্রতি অবিচারের সামিল। বাংলা শব্দের রূপভেদ এতে বাড়বে বৈ কমবে না।

এ ব্যাপারে বরং সাম্প্রতিক কালের পত্রপত্রিকা হতে নিয়ে যথেষ্ট আশ্বস্ত হওয়ার কারণ ঘটে। বর্তমানে ঢাকার প্রায় সবগুলো দৈনিক কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে যে চিত্র পাওয়া যায় তা অ্যাকাডেমিগুলোর প্রস্তাবের অনুকূল নয়। বানান সংস্কার সহজে মানলেও লিপির বেলায় বাংলা ভাষা যেন খানিকটা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে। বাংলা শব্দের সুস্থিত মানরূপের স্বার্থে এ রক্ষণশীলতাকে কি তাহলে স্বাগত জানাবো অথবা জানলা–দরজা বন্ধ করে এর প্রতি মুর্দাবাদ জানাতে থাকবো?

রুগ্ন বা রুগ্‌ণ

রুগ্ন শব্দের চেহারাকে আনুষ্ঠানিকভাবে "রুগ্‌ণ" করার একমাত্র দাবিদার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।[১১] তৎসম শব্দের ণ-ত্ব বিধানের প্রতি আনুগত্যের এ এক চরম পরাকাষ্ঠা। রুগ্ন শব্দের ন-টি মূর্ধন্য ণ হলেও এর অবয়ব এতোকাল "গ্ন"- রূপেই লিখিত হয়ে আসছে- তাতে রুগ্ন লোকের অবস্থার বিশেষ কোনো হেরফের হয়নি। হ্ন-এর মূর্ধন্য অস্তিত্বও প্রায় একই রকম অস্পষ্ট। এসব বর্ণের স্বচ্ছতা সৃষ্টি ব্যবহারকারীকে অহেতুক জটিলতার মধ্যে ফেলে। তাই এ জাতীয় প্রস্তাবকে অস্বাস্থ্যকর বলাই ভালো।

প্রতিবর্ণীকরণ

নবাগত বিদেশী শব্দে st-এর বদলে স্ট চালু করার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার সূচনা। শুধু খ্রীষ্টের জন্য ব্যতিক্রম রেখে বরং জটিলতা আরো বাড়ানো হয়।[১২] সাধারণত বিদেশী কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হওয়ার পর তার উচ্চারণ আগের মতো থাকে না। বাংলায় ট বর্গের ধ্বনিগুলো মূর্ধা থেকে উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে অধিকাংশ বিদেশী শব্দের মূর্ধন্য ধ্বনি অনুপস্থিত। মূর্ধন্য ধ্বনির অপরাধে যদি ষ-কে স করতে হয়, তাহলে ট এর জন্যও সে নিয়ম প্রযোজ্য। কেননা ট-ও একটা মূর্ধন্য ধ্বনি। একই যুক্তিতে মূল ভাষার ধ্বনির প্রতি আনুগত্যের প্রশ্নে তাই ট ও ত বর্গের মাঝামাঝি আলাদা একটা বর্গ তৈরি করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তা যখন হলো না, সেক্ষেত্রে প্রচলিত যুক্তাক্ষরটির প্রতি এমন ব্যবহার একপেশে বিচার বলে বিবেচিত হতে পারে। এ নীতি গ্রহণ করে বাংলাভাষীদের স্ট ও ষ্ট এর উচ্চারণে বিশেষ কোনো তফাত তৈরি করা সম্ভব হয়েছে বলেও মনে হয় না। সাধারণ বাঙালির কণ্ঠে ইষ্টদেব আর স্টেশন অথবা পুষ্ট আর পোস্টারের ষ্ট উচ্চারণে বিশেষ কোনো তফাত নেই। অন্যদিকে, প্রচলিত যুক্তাক্ষরে প্রতিবর্ণীকরণের কাজ করা হলে বাংলা বর্ণমালা কমপক্ষে বাড়তি ৫টি যুক্তাক্ষরের (যথা: স্ট, ন্ট, ষ্ঠ, ন্ড, নঢ) ভার থেকে নিজেকে হালকা রাখতে পারতো, এবং সেই তুলনায় বানান বিভ্রাট হ্রাস পেতো।

প্রতিবর্ণীকরণ বাংলা বানানে সাধারণত দুই ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। এক, উচ্চারণ অনুসারে বিদেশী ধ্বনিটির প্রতিবর্ণ নির্বাচন প্রসঙ্গে; এবং দুই, যথাযথ প্রতিবর্ণ না পেয়ে নতুন বর্ণ সৃষ্টি প্রসঙ্গে।

প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, অ্যাডভোকেট, ইউরোপ, উইলহেল্‌ম, কুরআন, নামাজ, হজ প্রভৃতি শ্রেণীর শব্দ। একাধিক উৎস ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহ এ শ্রেণীতে সমস্যা সৃষ্টি করে। উদ্ধৃত শব্দ ৬টির কমপক্ষে নিম্নলিখিত রূপগুলো সচরাচর দেখা যায়। যথা- অ্যাডভোকেট/এডভোকেট/ এ্যাডভোকেট, ইউরোপ/ য়ুরোপ/য়োরোপ, উইলহেল্‌ম/ উইলহেলম/ হ্বিলহেল্‌ম্, কুরআন/ কোরআন/ কোরান, নামাজ/ নমায/ নামায, হজ/ হজ্ব/ হজ্জ। এভাবে বহু বিদেশী শব্দ ২/৩/৪/৫ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে বানান-বিভ্রান্তি বাড়তে থাকে। এসব শব্দের প্রতিটির

জন্য ব্যবহারকারী উচ্চারণগত ও প্রতিবর্ণীকরণগত বহু যুক্তি খাড়া করতে পারবেন। কিন্তু তাতে বানান বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে না।

১ম শব্দটিতে ব্যবহৃত স্বরধ্বনি -œ র জন্য পদের প্রথমে আমরা ব্যবহার করি অ + য + আ - এই ৩টি বর্ণকে, যার মধ্যে ২টি স্বর ও একটি ব্যঞ্জন। ঐ ব্যঞ্জনকে স্বীকার করেই অভিধানে œ-কে ্যা ধরে সংযুক্ত য-এর স্থানে বিন্যস্ত করা হয় এবং যথারীতি ভুলে থাকি যে এটি একটি স্বরবর্ণ। উভয় অ্যাকাডেমি প্রথম বানানটিকে স্বীকৃতি দেওয়ায় এ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ জটিলতার অবকাশ কমে এলেও ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগতভাবে এ সমস্যা রয়েই গেল। ২য় শব্দের u বর্ণের উচ্চারণ প্রতিবর্ণীকরণ করা হয় প্রধানত ই + উ অথবা য় বর্ণ দিয়ে। যাঁরা য় দিয়ে প্রতিবর্ণীকরণের দলে তাঁরা হয়তো ভুলে যান যে, সংস্কৃত য বর্ণের ইঅ উচ্চারণ যেখানে অপরিবর্তিত থাকে, বাংলা ভাষায় শুধু সেখানেই ফুটকিযুক্ত য ব্যবহৃত হয় এবং বাংলা ভাষায় বর্ণটি আধুনিক কালের আবিষ্কার। এ বিবেচনায় ইউ-কেই অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করা যেতে পারে। ৩য় শব্দের w বর্ণের উচ্চারণ প্রতিবর্ণীকরণ করতে গিয়ে যাঁরা হ্ব বর্ণের ব্যবহার করেন, নিশ্চয়ই তাঁরা হ্ব বর্ণের বাংলা উচ্চারণের বৈচিত্র্যের কথা মনে রাখেন না। ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শব্দের বানানগুলোর মধ্যে কোরান, নামাজ ও হজ রূপগুলো বহুকাল ধরে প্রচলিত। বাংলা শব্দের মুদ্রিত আদল গঠনের কাজে সংস্কৃতায়ন প্রবণতা যেভাবে বাংলা শব্দের উচ্চারণ নীতিকে উপেক্ষা করে জটিলতার বীজ বপন করেছিলো, বিশ শতকে আরবি-আয়ন-প্রবণতা ঠিক একইভাবে কিছু শব্দের চেহারায় পরিবর্তন আনছে। আরবি-বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নীতিকে প্রচলনের দিকে লক্ষ রেখে পুনর্বিবেচিত করা না হলে এবং তা সর্বজনস্বীকৃতি না পেলে এ বহুরূপতা আরো বাড়তে থাকবে। এছাড়া প্রতিবেশী ভাষাসমূহে প্রস্তাবিত প্রতিবর্ণটির উচ্চারণের বিষয়টিও প্রস্তাবকদের মনে রাখা উচিত। প্রসঙ্গত য বর্ণের কথা তোলা যায়। উপমহাদেশের অন্যান্য ভাষায় বর্ণটির উচ্চারণ স্বরধ্বনির কাছাকাছি। কিন্তু প্রচলিত আরবি-বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে বর্ণটি দিয়ে ইংরেজি z এর কাছাকাছি ধ্বনিকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে।[১৩] এর ফলে ব্যবহারকারীকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবর্ণের য এবং উচ্চারণের জ-কে নিয়ে নানা রকম জটিলতায় পড়তে হয়। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে যে, হিন্দি ভাষায় ইংরেজি z-এর কাছাকাছি ধ্বনিকে নির্দেশ করা হয় জ-এর নিচে ফুটকি দিয়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে খ্রিস্টান, লন্ডন, অক্টোবর, ট্যাক্সি, এজেন্সি প্রভৃতি শব্দ। এখানে ব্যবহৃত স্ট ন্ড ক্ট ক্স এবং ন্স বর্ণগুলো বাংলা ভাষায় পূর্বে ছিলো না, বিদেশী শব্দকে প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়োজন তৈরি করতে হয়েছে। এভাবে আরো সৃষ্টি হয়েছে ন্ট, ন্ঠ, নঢ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের। অভিধান ও ধ্বনিবিষয়ক আলোচনায় ক, খ, গ, ত, থ, দ, ধ, ফ, ব, ভ, ল প্রভৃতি বর্ণে ফুটকি বা নোকতা (diacritic/tilde) দিয়ে যেসব প্রতিবর্ণ কখনো কখনো চোখে পড়ে- সাধারণ ভাষা

ব্যবহারকারীকে তার দ্বারস্থ হতে হয় না বলে সেসব বর্ণ বাংলা ভাষার চেহারায় খুব একটা প্রভাব ফেলে না।[১৪]

বানান

বর্তমানে চালু বানান নীতিগুলোর মূল উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্যে:

একই বাংলা শব্দের একাধিক বানান সাধারণ পাঠকের পক্ষে যেমন, তেমনি শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই বিভ্রান্তিকর। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর পক্ষে এই বানানগত বিভ্রান্তি মাতৃভাষায় তার দক্ষতা অর্জনের পথে অন্তরায়স্বরূপ। সুতরাং পাঠকসাধারণের স্বার্থে, বিশেষ করে, শিক্ষার্থীর স্বার্থে বাংলা বানানের অভিন্নতার উপায় নির্ণয় করা প্রয়োজন।[১৫]

বস্তুত বাংলা বানানের বিভিন্নতা একটা স্বীকৃত সত্য। কয়েকটি বাংলা অভিধান একত্রে খুলে নির্দিষ্ট শব্দ খুঁজতে গেলে পাঠক বিনা পরিশ্রমেই এ সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন। একাধিক অভিধানেরও দরকার নেই। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান-ই যথেষ্ট। অভিধানটির শব্দনির্বাচন করা হয়েছিলো সমকালীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে। তার ফলে অভিধানটি ব্যবহারকারীকে ততোটা সাহায্য না করলেও বাংলা শব্দের বানান বৈচিত্র্যকে ঐতিহাসিকভাবে ধারণ করে রেখেছে, বানান বিভ্রান্তির আলোচকের কাছে যার প্রাসঙ্গিকতা অসাধারণ। এখানে অসংখ্য ভুক্তিতে ৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০ এমনকি ১২টি পর্যন্ত বিকল্প বানান মুদ্রিত দেখা যায়। এ রকম কয়েকটি ভুক্তির শীর্ষশব্দ নিম্নরূপ:

পীঠিকা-২

শব্দের চালু রূপ	অভিধানটিতে ব্যবহৃত বিকল্প বানানসমূহ	পদপরিচয়	উৎস
আগানো	আগান/আগানো (২টি)	ক্রিয়াবিশেষ্য	তদ্ভব
আঘাটা	আঘাটা, আঘাটা, অঘাট (৩টি)	বিশেষ্য	তদ্ভব
আজগুবি	আজগুবি, আজগুবী, আজগবি, আজগবী (৪টি)	বিশেষণ	আরবি
আফুটন্ত	আফুটন্ত, আফুটা, আফুট.আফুটো, আফোটা (৫টি)	বিশেষণ	তদ্ভব
আসোয়ার	আসোয়ার, আসোবার, আসওয়ার, আস-ওয়ার (ম-ব), আছওয়ার, আশোয়ার (বিরল) (৬টি)	বিশেষ্য	হিন্দি
এত্তেলা	এত্তেলা, এত্তলা, এতলা, এতেলা, এতালা, ঈত্তেলা, ইত্তিলা (৭টি)	বিশেষ্য	আরবি

কোঁতানো	কুঁতান/কুঁতানো, কুঁথন/কুঁথনো, কোঁতান/কোঁতানো, কোঁথান/ কোঁথানো (৮টি)	ক্রিয়াবিশেষ্য	তদ্ভব
খ্রিষ্টান	খ্রিষ্টান, খ্রীষ্টান, খৃষ্টান, খ্রিষ্টান, কৃশ্চান, কৃশ্চিয়ান, ক্রিশ্চান, ক্রিশ্চিয়ান, ক্রীশ্চান (৯টি)	বিশেষণ	ইংরেজি
জোটানো	জোটান/জোটানো, জুটান/জুটানো, জুটন/জুটনো, যোটান/যোটানো, যুটান/যুটানো (১০টি)	ক্রিয়াবিশেষ্য	তদ্ভব
খামাখা	খামকা, খামখা, খাহ্‌মখাহ্‌, খামোখা, খামোকা, খামোখা, খানকা, খানোকা, খানাকা, খানখা, খানোখা, খানাখা (১২টি)	বিশেষণ	ফারসি

তৎসম শব্দেরও বহু বিকল্প বানান অভিধানটিতে পাওয়া যায়, যেমন-কলস শব্দ। সংস্কৃত উৎসের এই শব্দের মোট ৬টি বিকল্প বানান স্বীকৃতি পেয়েছে (কলস, কলসি, কলসী, কলশ, কলশি, কলশী)। যদিও বলা শক্ত, সংস্কৃত সাহিত্যে এতোগুলো বানান আদৌ ব্যবহৃত হয়েছে কিনা; হয়ে থাকলেও বাংলাদেশে এতোগুলো কলসের আদৌ দরকার আছে কিনা।

পূর্বোক্ত অভিধানে পাওয়া গেলেও, বাস্তব অবস্থা মোটেই এ রকমের নয়। বাংলাদেশের মানুষ এ অভিধান দেখে শব্দের বানান ঠিক করেন না। বরং বাংলা হরফের যতো বিভিন্নতা বর্তমান চালু আছে এবং হরফ বৈচিত্র্যের জন্য শব্দের যতো রূপবৈচিত্র্য তৈরি হচ্ছে, বাংলা বানানের বিভিন্নতা সেই তুলনায় কম। বানানের সংস্কার চালু হয়ে গেলে এ বিভিন্নতা আরো কমে আসবে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া সকলের বানান নীতির মূলসূত্রও প্রায় এক। বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোর অধিবাসীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কোনো বৈঠক ছাড়াই উভয় অঞ্চলে গৃহীত বানান-নীতির এ ঐক্য নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে।

এ পথে অন্তরায় কতোটা, নির্ণয় করতে খুব বেশি বানান নীতি ঘাটবার প্রয়োজন নেই। পূর্বে উল্লেখিত বাংলা একাডেমীর বানান নীতি ও বাংলা আকাদেমির বানান-নীতির ভিতরকার অনৈক্য দেখলেই চলে। দুই অ্যাকাডেমির গৃহীত বানান নীতি মোটামুটিভাবে ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তন, পূর্ববর্তী সংস্কার, উচ্চারণ, প্রচলন প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ রেখেছে। ফলে উভয়ের প্রস্তাবে বিভিন্নতা খুব কম। তা সত্ত্বেও কয়েকটি ক্ষেত্র বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়- কোনো কোনো বিষয়ে দুই অ্যাকাডেমির মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে, আবার কোনো বিষয়ে এরা একমত হলেও তা পুনর্বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। আগামী শতাব্দীর সুস্থিত ও প্রমিত বাংলা ভাষার প্রয়োজনে যেসব বিতর্কের অবসান একান্তই জরুরি।

বানান: তৎসম শব্দ

বাংলা ভাষা প্রথম সংস্কৃতায়নের পথে পা বাড়ায় মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ লিপিকরদের হাতে। বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যে একদিকে যেমন বহু সংস্কৃত শ্লোকের ব্যবহার করা হয়েছে, তেমনি পাশাপাশি বাংলা শব্দগুলোও সংস্কৃতের প্রভাবে কাছাকাছি সংস্কৃত রূপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সমকালীন অন্যান্য বাংলা পুথির সঙ্গে তুলনা করা হলে এ ব্যাপারে বৈষ্ণব সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়ন করায় তাঁদের অবদানের স্বরূপ স্পষ্টতা পেতে পারে। অবশ্য এ নিয়ে ব্যাপক কোনো গবেষণা এখনো হয়নি। এছাড়া, বাংলা ভাষা এবং তার শব্দ ব্যাপকভাবে সংস্কৃতায়িত হয়েছে প্রধানত: ইংরেজদের উদ্যোগে আঠারো উনিশ শতকের সন্ধিলগ্নে, যাঁরা মনে করেছিলেন বাংলা ভাষা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের দুহিতা এবং সেই সূত্রে কাছাকাছি উচ্চারণের বাংলা শব্দগুলোকে সংস্কৃত শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা উচিত এবং তা করেছিলেন।[১৭] এ ব্যাপারে তাঁদের সহযোগী সংস্কৃত পণ্ডিতগণের অবদানও একেবারে কম থাকার কথা নয়। এসব কারণে উচ্চারণের দিক দিয়ে প্রায় সব শব্দকেই বাংলা বলা গেলেও মুদ্রিত আদলের বিবেচনায় বাংলা লেখায় প্রযুক্ত শব্দরাজির শতকরা প্রায় সত্তরটি শব্দই এখন সংস্কৃত বা তৎসমরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।[১৮]

ইতিহাসের এই অমোঘ ঘটনায় আটকে পড়ে বাংলা ভাষার শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ শব্দকেই তৎসম হিসেবে মেনে নিতে হয় এবং এই বিপুল পরিমাণ শব্দের জন্য বাংলা শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার শক্তিশালী লেখকগণ তৎসম বিচারে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের এই দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে মেনে নিতে কখনো কুণ্ঠিত কখনো দ্বিধান্বিত হন। এই কুণ্ঠা ও দ্বিধা থেকে জন্ম হয় তৎসম শব্দের জন্য আলাদা বানানের নিয়ম। অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত শব্দের হাত থেকে বাংলা ভাষার রেহাই পাওয়ার বিকল্প ছিলো না বলে সামান্য কিছু সংস্কার করে শব্দগুলোকে বাংলা ভাষায় আত্তীকরণ করে নেওয়া হয়। এ দিক দিয়ে বিচার করলে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দ ব্যবহারের যে নিয়ম আছে, তাকে সহজেই তৎসম শব্দকে বাংলায় আত্তীকরণের সূত্র' রূপে চিহ্নিত করা যায়।

তৎসম শব্দের এই আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিয়ে বিশ্বভারতীয় উদ্যোগে, যার উপর ভিত্তি করে একটি বানানের নিয়ম ১৯২৫ সালের প্রবাসী-তে (১৩৩২) ছাপা হয়। পরে ১৯৩৫-৩৬ সালের দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বানান-নীতি গ্রহণ করে, সেখানে তা আরো খানিকটা প্রতিষ্ঠানিক বৈধতা পেয়ে যায়। এ নীতি অনুসারে সংস্কৃত শব্দের রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব বর্জিত হয় এবং সন্ধিতে ঙ স্থানে ং ব্যবহারের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। এই সংস্কারের সূত্র ধরে বর্তমানের অ্যাকাডেমিদ্বয় আরো খানিকটা এগিয়ে এসে নিয়ম করেছে: তৎসম শব্দের বিকল্প

বানানে যেখানে ই, ঈ, উ, ঊ, শ, ষ উভয়ই আছে, সেখানে যথাক্রমে ই, উ এবং শ ব্যবহৃত হবে; পদান্তের হসন্ত এবং বিসর্গ বর্জিত হবে ইত্যাদি। বর্তমানে যাঁরা বাংলা ভাষায় লেখাপড়ার কাজ করেন, তাঁরা সকলেই তৎসম শব্দে প্রযোজ্য পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত নীতিগুলোকে পালন করে থাকেন, তাই এসব শব্দে বানান বিভ্রান্তির অবকাশ অপেক্ষাকৃত কম। এবং এর ফলে তৎসম শব্দের বানান বিতর্ক বর্তমানে দু-একটা বিষয়ের মধ্যেই সীমিত।

ইন্ ভাগান্ত শব্দ

তৎসম শব্দের যে গুটিকয় ক্ষেত্রে বানান-বিভ্রান্তি লক্ষ করা যায়, ইন্ ভাগান্ত শব্দ এর মধ্যে অন্যতম। বস্তুত এই শব্দগুলোকে নিয়ে কোনো কোনো মহলের কঠোরভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারিতা এবং কোনো কোনো মহলের সংস্কৃত ব্যাকরণকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেওয়ার যুক্তি প্রাসঙ্গিক বানান বিভ্রান্তির কারণ।

অধিকারী, অধিবাসী, অভিমুখী, আততায়ী, একাকী, কৃতী, গুণী, জ্ঞানী, দ্বেষী, ধনী, পক্ষী, প্রাণী, বিদ্রোহী, মন্ত্রী, রোগী, শশী, সহযোগী প্রভৃতি ইন্ ভাগান্ত শব্দের দৃষ্টান্ত। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সমাস হলে অথবা প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দগুলোর ঈ রূপান্তরিত হয় ই-তে। তৎসম এই শব্দগুলোতে সংস্কৃত প্রত্যয় যুক্ত করার সময়ে উভয় পক্ষই সংস্কৃত নিয়ম মানার পক্ষে। কিন্তু বিতর্ক হলো এই সব তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলায় আত্তীকৃত অন্যান্য তৎসম শব্দের সমাসের বেলায় সংস্কৃত নিয়ম মানা হবে কিনা তা নিয়ে। এক পক্ষ বলেন মানবেন, অন্য পক্ষ বলেন, মানার কোনো যুক্তি নেই। প্রথম পক্ষকে যদি রক্ষণশীল এবং দ্বিতীয় পক্ষকে যদি উদার বলা হয়, তাহলে বাংলা একাডেমীকে রক্ষণশীল এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে উদার বলতে হয়। বাংলা একাডেমীর বানানের নিয়মে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও, এ নিয়মের উপর ভিত্তি করে প্রণীত বাংলা বানান অভিধান নামক শব্দ-নির্ঘণ্টে ছাপা হয়েছে গুণিগণ, গুণিজন, প্রাণিকূল, প্রাণিজগৎ, মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা প্রভৃতি। এ নিয়মে তাঁদের লিখতে হবে আগামিকাল, আত্মঘাতিনীতি, গৃহমুখিগণ, ধনিব্যক্তি, পাপিসকল, বিদ্রোহিগণ, বলিবৃন্দ (বীর অর্থে) ইত্যাদি।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সংস্কার প্রস্তাবের ৪.২১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; "সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল শব্দটিকে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরে নিয়ে সমাস হলেও তার দীর্ঘ ঈ কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। তাই আগামীকাল, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীসভা, শশীভূষণ রূপই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"[১৯]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর বাঙ্গালা ব্যাকরণ বইয়ে লিখেছিলেন, "যদি 'গণ শব্দকে সকল শব্দের ন্যায় বহুবচনবাচক মনে করা হয়, তবে মহাত্মগণ, দাতাগণ, পক্ষীগণ, সখীগণ প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ বলিতে হইবে।"[২০] ১৯২৫ সালের বিশ্বভারতীর বানান সংস্কার প্রস্তাবেও এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত নিয়ম না মেনে ী কারান্ত প্রথমার রূপকেই বাংলার শব্দরূপ বলে ধরে নেওয়া

হয়েছিলো।[২১] এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী যদি তার রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সরে আসে, তাহলে এ জাতীয় তৎসম শব্দের বানান বিভ্রান্তি নিঃসন্দেহে দূরীভূত হবে। বানান বিভ্রান্তির প্রসঙ্গ তোলা হলো এজন্য যে, ইন্ ভাগান্ত শব্দ সম্পর্কে একাডেমীর নীতিতে একই শব্দ কখনো ই-কার দিয়ে এবং কখনো ঈ-কার দিয়ে লেখা হলে, ব্যাকারণে কম অভিজ্ঞ ব্যক্তি শব্দটির চেহারায় স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হবেন, এবং তেমন ক্ষেত্রে তাঁরা যদি শব্দটিকে ই-কার যুক্ত ভেবে ভুল করে থাকেন, তাহলে তাঁদের কতোখানি অভিযুক্ত করা ঠিক হবে? সম্প্রতি ঢাকার কিছু কিছু পত্রিকায় সে প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গেছে (যেমন, আজকের কাগজ)। বিশেষ এ ক্ষেত্রটিকে বাংলা একাডেমীর চেয়ে বাংলা আকাদেমির প্রস্তাবকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

তৎসম শব্দের ঙ এবং ং প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর বানানের নিয়মের ছোটো একটি অসঙ্গতির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলা একাডেমীর প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের ১,০৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; "ক খ গ ঘ পরে থাকলে অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বর (ং) লেখা যাবে। যেমন অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। বিকল্পে ঙ লেখা যাবে। ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ হবে। যেমন: আকাঙ্খা।"[২২] এ নিয়মের প্রথম অংশে 'সন্ধিস্থলের পূর্বপদে' বাক্যাংশ বাদ গেলেও, বানান সংস্কারকদের উদ্দেশ্য মোটামুটি বোঝা যায়। কেননা, এ ব্যাপারে প্রায় একই নিয়ম সূত্রবদ্ধ হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মে। কিন্তু ৩য় বাক্যটি নিয়ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পরিপূরক নয়, বরং প্রতিকূল। 'বিকল্পে ঙ লেখা যাবে' মানে হলো, যিনি যেমন খুশি লিখতে পারেন। পরের বাক্য দুটো আরো বিভ্রান্তিকর। 'ক্ষ এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন: আকাঙ্ক্ষা।' বাংলা একাডেমীর বানানের নিয়ম মুদ্রণে এ এক অমার্জনীয় ছাড়। 'সন্ধি সমাস ছাড়া অন্যত্র' বাক্যাংশ না থাকার ফলে এবং "অঙ্ক, সঙ্গে, গঙ্গা" প্রভৃতি দৃষ্টান্তের অভাবে এতে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, সংক্ষিপ্ত লেখার সময়েও কি তাহলে ং এর বদলে ঙ লিখতে হবে? তাছাড়া আকাঙ্ক্ষা শব্দটির মধ্যে পূর্বপদই বা কোথায় আর পরপদই বা কোথায়?

বানানঃ অ-তৎসম শব্দ

উভয় অ্যাকাডেমির বানান নীতিতে অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেসব অভিন্ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো: সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে, উচ্চারণ অনুযায়ী শ বা স হবে, কোনো ক্ষেত্রেই ণ ব্যবহৃত হবে না, ইংরেজি ধ্বনির জন্য অ্যা ব্যবহৃত হবে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পদান্তে উচ্চারিত ও ধ্বনির জন্য ও কার ব্যবহৃত হবে ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোতে ইতিমধ্যে এ নীতিগুলো মোটামুটি স্বীকৃতিও পেয়ে গেছে। অ-তৎসম শব্দ সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান দুটোর নীতি যেসব ক্ষেত্রে অভিন্ন নয়, এবং যেসব ক্ষেত্র বিতর্কের উর্ধ্বে নয়, তেমন কয়েকটি প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেতে পারে।

ক্ষ এবং খ বিতর্ক

তদ্ভব শব্দে একাডেমী খ এর পক্ষপাতী হলেও ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-এর বেলায় ছাড় দেবার পক্ষে। অন্যদিকে আকাদেমি ক্ষুদিরাম ছাড়া সর্বত্রই খ চালানোর পক্ষপাতী।[২৩] এ ব্যাপারে সংস্কৃত মূলকে অনুসরণ করে চালু বানানে পক্ষে যুক্তি তৈরি করা হলে তা বিভ্রাট অবসানে সহায়ক হতো।

অ-তৎসম ণ

প্রায় একই শ্রেণীর জটিলতা দেখা যায় অ-তৎসম শব্দে ণ এর যুক্তবর্ণে। একাডেমীর নিয়ম অনুসারে তৎসম ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ এর আগে কেবল ন যুক্ত হবে।[২৪] আকাদেমিও একইভাবে বলে অ-তৎসম শব্দে মূর্ধন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন দন্ত্য ন-ই হবে।[২৫] এ নীতির ফলে কয়েকটি শব্দের চেহারা হবে এ রকম: আন্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, পিন্ডি, মুন্ডু, লন্ডভন্ড ইত্যাদি। বিদেশী শব্দের মূর্ধন্য বর্জন তো অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে, এবারের লক্ষ্য তদ্ভব। সহজেই বোঝা যায়, এ সংস্কারের ফলে চালু নতুন কিছু শব্দের চেহারা বদলাতে শুরু করবে। হয়তো ভবিষ্যতে এ নীতির প্রভাবে ক্রমে সবাই চাশি, শিশ, কিশান, পোশা ইত্যাদিও লিখতে চাইবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ এর বানান নীতির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে অবশ্য এ ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের জন্য ছাড় দিয়ে ণ চালানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো।[২৬] তবে নিয়মটির এমন হতচ্ছাড়া অগ্রগতির জন্য নিঃসন্দেহে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দায়ী করতে হয়।

কি অথবা কী

যাবতীয় বাননীতি যেখানে উ ঈ লেখার পরিবর্তে যথাক্রমে উ ই লেখার সুপারিশ করে, সেখানে কি/কী এমন একটি ব্যতিক্রমী শব্দ, সকলেই যার দ্বৈত বানান একবাক্যে স্বীকার করে নেন। রবীন্দ্রনাথ শব্দটিকে আলাদা অর্থে দুইভাবে লিখেছিলেন বলেই হয়তো বানান সংস্কারকগণ এখানে এমন নমনীয়। দুই রকম বানান থাকলে যা হয়, এখানেও সেভাবে সৃষ্টি হয় নানা রকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। এর ফলে অনেকের লেখায় কি স্থলে কী আবার একইভাবে কী স্থলে কি হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ঢাকার বিখ্যাত দৈনিক সংবাদের চিঠিপত্র কলামে এ নিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎ যে বাদ প্রতিবাদ হয়েছে, তাও এই বিশৃঙ্খল অবস্থারই নির্দেশক। সমস্যাটি সম্পর্কে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাঙ্গা অভিধানের ২য় সংস্করণে যা বলা হয়েছে, তা খুবই যুক্তিযুক্ত। যুক্তিটি এ রকম:

কি, কী (সর্ব বিণ ও ক্রিবিণ রূপে স্বতন্ত্র পদ হিসেবে ব্যবহৃত হলে ঈ-কার, যেমন-'কী রূপ' কিন্তু 'কিরূপে') সর্ব কোন বস্তু; কোন বিষয় (তুমি কী খাবে?)। অব্য ১ সংশয়সূচক প্রশ্নবোধক শব্দ (তুমি কি খাবে?)। ২ অথবা; কিংবা। বিণ, ক্রিবিণ ১ কোন রকমের (কী জিনিস?)। ২ কেমন (কী করে এ কথা বললে?)। ৩ কতো (কী আনন্দ)। [স, কিম>][২৭]

কিন্তু সন্দেহ হয়, দেশের শতকরা কতো জন শিক্ষিত লোক ব্যাকরণের এ জটিল মারপ্যাঁচ বুঝে তাঁদের লেখায় এই "কি" সমস্যার সমাধান ঘটাবেন এবং আদৌ ঘটাতে পারবেন কিনা।

বাংলা না বাঙলা

নরেন বিশ্বাস তাঁর বাঙলা উচ্চারণ অভিধানে ঙ বর্ণের ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ বিজ্ঞাপিত করার জন্য কোথাও হস্ চিহ্নের ব্যবহার করেননি। তাঁর যুক্তি অনুযায়ী 'স্বরযুক্ত না হলে ঙ এর উচ্চারণ ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত হয়ে থাকে।"[২৮] যদি তাই হয়, তাহলে বাংলা বর্ণমালায় আলাদাভাবে অনুস্বারের কোনো প্রয়োজন থাকে না? তবে এ জাতীয় যুক্তি উত্থাপন করলেও নরেন বিশ্বাস এবং "বাঙলা" অনুসারীদের লেখায় ঙ বর্ণের ব্যঞ্জনান্ত প্রয়োগ শুধু "বাঙলা" শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একমাত্র নরেন বিশ্বান তাঁর উচ্চারণ বইয়ের উচ্চারণ নির্দেশে এ যুক্তির কিছু প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, অন্যত্র যার কোনো নজির নেই। ঙ ব্যঞ্জনান্ত হলে অঙ্ক, অঙ্গীকার, গঙ্গা, বঙ্গ, সঙ্গে প্রভৃতি শব্দের ঙ গুলোকে ছোটো করে লেখার দরকার হয় না।

ং যে প্রকৃতপক্ষে হস্‌যুক্ত ঙ-এর বিবর্তিত রূপ, তেমন একটা অনুমান করেছেন আবু ইসহাক। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে: "সংক্ষিপ্তকরণের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে 'ত' বর্ণের ওপরকার গোলাকার অংশ এবং লেজের কিছু অংশ ও হসন্ত নিয়ে এটি বিবর্তিত হয়ে 'ৎ' হয়েছে। ..... সংক্ষিপ্তকরণের একই প্রবণতা থেকে 'ঙ' বর্ণের ওপরকার গোলাকার অংশ এবং হসন্ত নিয়ে 'ঙ' বিবর্তিত হয়ে 'ং' (অনুস্বার) হয়েছে বলে মনে হয়। .... স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হলে 'ৎ' যেমন এর মূল আকৃতি ফিরে পায়, তেমনি স্বরবর্ণের সাথে যুক্ত হলে অনুস্বারও তার মূল আকৃতি (অর্থাৎ 'ঙ' এর আকৃতি) ফিরে পায়।"[২৯]

আবু ইসহাকের এ অনুমান অন্যান্য যুক্তির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। ঙ বর্ণের ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ যে যথার্থ নয়, মধ্যযুগের বহু শব্দ যেমন – কোঙর, শাঙন, সোঙর; বা আধুনিক কালের শব্দ চাঙড়, টাঙশ, ধাঙড়, নোঙর, ভাঙন, লাঙল, হাঙর প্রভৃতি দৃষ্টান্ত এর জন্য যথেষ্ট। অতএব বাংলা কি বাঙলা, সে প্রমাণের জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের কাছে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই।[৩০]

স্থাননাম

সুকুমার সেনের ভাষায়: 'স্থাননামের মূল্য ব্যক্তিনামের চেয়ে বেশি। স্থায়িত্বের দিক দিয়েও স্থাননাম অধিকতর মূল্যবান। ব্যক্তিনাম লুপ্ত হয় ব্যক্তির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে (তবে এক ব্যক্তিনাম অপরে গ্রহণ করতে পারে, করেও)। স্থাননাম দীর্ঘস্থায়ী, এমন কি চিরস্থায়ীও বলা যায়।"[৩১] কিন্তু স্থাননামের বানান সম্পর্কে কোনো বানাননীতিরই বিশেষ কোনো নির্দেশ না থাকায়, স্থাননাম নিয়ে সম্প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে বানান বিভ্রাট সৃষ্টি হচ্ছে। স্থাননামের বানান পরিবর্তনের বিপক্ষে এ ব্যাপারে বাননীতিগুলোর সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত। কেননা, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্রের মতো ঐ এলাকার নামেরও সুনির্দিষ্ট চেহারা থাকে, যার পরিবর্তন

মানচিত্র বদলানোর সামিল। বানান সংস্কারের ফলে কোনো স্থানের নাম অন্য স্থানের নামের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া, স্থাননামগুলো সরকারি-বেসরকারি নথিপত্র, দলিল-পর্চা, সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতিতে ইতিমধ্যেই যে মুদ্রিত চেহারা লাভ করেছে, বানান বদলানো হলে ঐ স্থাননামটিকে তার ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন করে ফেলা হবে। তাতে কাশ্মীর (কাশমির), চীন (চিন), নোয়াখালী (নোআখালী), কুষ্টিয়া (কুশটিয়া/কুস্টিয়া/কুশটিআ) প্রভৃতি শব্দের চেহারা বদলে যাবে এবং তেমন পরিস্থিতিতে হ্রস্ব ই-কার সম্পন্ন "চিন"কে চিনতে স্বাভাবিকভাবেই কষ্ট হওয়ার কথা।

ফাঁক

বেশ কয়েকটি নীতিমালায় দেখা যায় (বাংলা একাডেমী, বাংলা আকাদেমি, পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) "হয়নি" শব্দের চালু রূপের মাঝখানে স্পেস বা ফাঁক ব্যবহারের যুক্তি ও সুপারিশ করা হয়েছে। অব্যয় "না" যেহেতু ক্রিয়াপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে, সেহেতু "না" এর পরিবর্তিত চেহারা "নি" কেও এঁরা ফাঁক করে লেখার পক্ষপাতী। কিন্তু যে "নি" উচ্চারণের প্রভাবে (অথবা সন্ধিবদ্ধ হয়ে) ক্রিয়ার সঙ্গে লেপ্টে থাকে, তার ন্যায়-অন্যায় বিচার শব্দের চেহারা বৃদ্ধির জন্য যতোটা কার্যকর, ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য ততোটা নয়। ফাঁক সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের আরো কিছু পাঁতি আছে। ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন: এক জন, কত দূর, সুন্দর ছেলে।"৩২ "সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, ছেলে সুন্দর হোক বা নিতান্ত মূর্খ হোক, তাদের ফাঁকহীন চেহারা নিতান্তই কল্পনার বিষয়। দু-এক জন এঁদের সঙ্গে একমত হলেও, দুজন যখন একত্রে হাত ধরে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করেন, তখন এসব পণ্ডিত নির্দেশ কয়জনের মনে থাকে?" অব্যবহিত পূর্বের বাক্য দুটোতে বোল্ড শব্দগুলোর চেহারার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাংলা ভাষায় ইংরেজির মতো বহু Loose compound বা সমাসের ব্যবহার হয়, আবার সংস্কৃতের মতো সন্ধিও হয় কোথাও কোথাও। কোনো নীতি প্রণয়নের পূর্বে নীতিপ্রণেতাগণের তা স্মরণ রাখা উচিত। তা না হলে ক্রমাগত সংস্কারের আঁচড়ে বাংলা ভাষা ক্রমান্বয়ে জর্জরিত হতে থাকবে, সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।

ক্রিয়াপদের শেষের ো (ও-কার)

অ-তৎসম শব্দের বানান বিভ্রাটের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে তথাকথিত তদ্ভব ক্রিয়াপদ, তদ্ভব ক্রিয়াবিশেষ্য ও অন্যান্য কয়েকটি শব্দের ও কারান্ত উচ্চারণের সমস্যা। এ প্রসঙ্গে হায়াৎ মামুদের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

> বর্তমানে বাংলা ভাষার লেখ্য রূপে সবচেয়ে স্বেচ্ছাচারী মহল হচ্ছে ক্রিয়াপদ। অন্যান্য শব্দের বানানে ত্রুটি হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করার যোগ্যতম মাধ্যম হচ্ছে অভিধান। ক্রিয়াপদ এমন একটি

> এলাকা যা অভিধানকেও পাত্তা দেয় না, অথবা বলা ভালো অভিধান খুব ভয়ে ভয়ে সমীহ করে তাকে দূরে রাখে। দূরে না রেখে উপায় নেই। কারণ ক্রিয়াপদ এমন চরিত্রের শব্দ যা সময়ের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে নিজের চরিত্র ক্রমাগত পাল্টাতে থাকে।[৩৩]

শতাব্দীর সূচনায় সাধুরীতির পাশাপাশি চলিতরীতির গদ্য বাংলা ভাষায় চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিতরীতির ক্রিয়ায় পদান্তের ও-ধ্বনি লিখিত চেহারা পেতে শুরু করে।

১৯২৫ সালে শতাব্দীর প্রথম বানানের নিয়ম প্রস্তুত করে বিশ্বভারতী, যা ঐ সময়ের প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়। এটি তৈরি করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা অনুমোদন করেন।[৩৪] বানান নীতিটির ভাষা ও দৃষ্টান্তগুলো দেখে মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি সূত্রের শেষে বেশ কিছু বাক্য ও দৃষ্টান্ত যোগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সে সংযুক্তি ছিলো বিভিন্ন পদে ও-কারের পক্ষে বৈধতা সৃষ্টির প্রয়াস। ও-কারের বদলে ঊর্ধ্বকমা নীতি সুনীতিকুমারের সুপ্রচলিত মুদ্রাদোষ, ফলে এ নীতির অধিকাংশ সূত্রের প্রথমাংশ ঊর্ধ্বকমার পক্ষে, যা তাঁর রচনা বলে মনে করতে অসুবিধা হয় না। অন্যদিকে ৪৩টি সূত্রের মধ্যে অন্তত ১৩টি সূত্রের শেষদিকে ও-কার সমর্থিত বাক্যাবলিকে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বানান-অভ্যাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাক্যাংশগুলোর দু-একটা নিম্নরূপ: "চলতি ভাষায় ে-া কার ব্যবহার করাই সহজ" (সূত্র ৩.২-৩); "কিন্তু চলতি ভাষায় ে-া কার লেখাই ভালো" (সূত্র ৩.২-৩); "তবে ে-া কার চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়" (সূত্র ৪.৪); "ও ধ্বনি যতদূর সম্ভব ে-া কার দিয়ে লেখাই সহজ" (সূত্র ৯) প্রভৃতি। এভাবে এ নীতিমালার বর্ণনার ভাষায় এবং দৃষ্টান্তে (যা সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই) শেষ পর্যন্ত শব্দের ও ধ্বনির ও-কার রূপ প্রাধান্য পায়। সে নিয়মে নিম্নের শব্দগুলো এ রকম চেহারা পেয়েছিলো: নেবো, ভালো, যোগানো, ক'রবো, ব'লবো, ক'রছো, ডাকো, দেখো, কারো, বলো, কাঁদো-কাঁদা, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো, কেনো, যেনো, যতো, ততো, এতো, কতো, কালো, মতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো, করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো, ডাকো, থেকো, বললো, ক'রলো, র'য়েছো, ব'লেছো, মোতি, গোরু, কোলু, কোরিয়া, নিয়ো, ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি।

১৯৩৬ সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চারণ, উৎপত্তি, অর্থগ্রহণে সুবিধা ও বিকল্পে লেখা যেতে পারার যুক্তিতে কয়েকটি ও-কারকে বৈধতা দেয়, যাতে বিশ্বভারতী তথা রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত বহু ও-কার বাদ পড়ে। এ নতুন নীতি রবীন্দ্রনাথকে মানতেও অনেকটা বাধ্য করা হয়েছিলো। অসংখ্য ও-কারান্ত ক্রিয়াপদের মধ্যে সে সময়ে এভাবে যারা জাতে উঠতে সক্ষম হয়, তাদের মধ্যে পড়ো, করানো, পাঠানো, খাবো, দেবো, শোবো, ক'রবো, কাটবো, লিখবো, উঠবো, করাবো প্রভৃতি অন্যতম।[৩৫]

১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমীর বানানের নিয়মে স্বীকার করা হয় হয় যে, বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-কার হয়। তবে এই স্বীকারোক্তির মধ্যে অন্তে উচ্চারিত অসংখ্য পদের অন্তের ও-কারকে গৌণ করে দেখার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য খুব সহজেই লক্ষ করা যাবে। ছিলো, করলো, বলতো-র সঙ্গে কোরছে, হোলে, যেনো, কেনো ইত্যাদিকে যুক্ত করার মধ্যে সে উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। কেননা ছিলো করলো বলতো যে শ্রেণীর, কোরছে হোলে সে শ্রেণীর নয়, যেনো কেনো তো নয়ই। প্রথমগুলোর অন্তে ও-কার, দ্বিতীয়গুলোর আদিতে ও-কার এবং তৃতীয়গুলো তৎসম শব্দ যাতে ও-কার দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, ক্রিয়াপদের অন্তে ও-কার দেওয়ার প্রয়োজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বাংলা একাডেমীর অনেক বেড়েছে। এখানে যেসব ও-কারান্ত শব্দ তালিকাভুক্ত হয়েছে, সেগুলো হলো: ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, হলো, করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো, হতো, দিয়ো, দেবো, নিয়ো, কোরো, কাটো, শেখো, শিখো প্রভৃতি।[৩৬]

এক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমি যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয়। এদের নিয়মে খাটো, ছোটো, বড়ো, এগারো, বারো, তেরো, চোদ্দো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, ঘোরালো, ছুঁচালো, জোরালো, ধারালো, টিকালো, প্যাচালো থাকলেও ক্রিয়াপদের রূপ হয়- (তুমি) পড়, (রাত) হল, (যদি) হত প্রভৃতি। অর্থাৎ ছোটো বড়ো শব্দের মতো শব্দে অপ্রয়োজনীয় ও-কার থাকলেও এখানে হতো, হলো, দেবো-র মতো শব্দের ও-কারকে বর্জিত জ্ঞান করা হয়েছে। চোদ্দ-র ও-কারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অতএব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, অন্তত ক্রিয়াপদের এই অন্তের ও-কার প্রসঙ্গে উভয় অ্যাকাডেমি কিছুটা ভিন্ন পথাবলম্বী। পদান্তের ও-কার নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে বাংলা একাডেমী কিছুটা এগিয়েছে, অন্যদিকে বাংলা আকাদেমি কিছুটা এগিয়ে যেতে যেতে পিছু হটে এসেছে।

বাংলা শব্দের শুরুতে যে ও-কারগুলো উচ্চারিত হয়, অথচ লেখা হয় না, তা অব্যবহিত পরের সুনির্দিষ্ট কিছু ধ্বনির প্রভাবজাত, তাই সে ও-কারগুলো বাহুল্য মাত্র। একই কারণে বৈধ সত্ত্বেও গরুর ও-কার খসে পড়েছে। কিন্তু বাংলা শব্দের উচ্চারণে যে হসন্ত প্রবণতা আছে, তার ফলে শব্দের শেষে কোনো স্বরচিহ্ন না থাকলে তাতে হসন্ত উচ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বলা কঠিন, নিকটবর্তী অধিক হসন্ত প্রবণতাসম্পন্ন ভাষার প্রভাবে (যেমন হিন্দি) বাংলা ভাষার এ হসন্ত প্রবণতা ভবিষ্যতে আরো বাড়বে কিনা। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও অ্যাকাডেমি দুটোর প্রস্তাবিত বানান নীতি তদ্ভব শব্দের শেষে উচ্চারিত ও-কারকে যথাসাধ্য স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে হলেও ক্রিয়াপদে কাল

নির্দেশক – বো,–লো,–তো জাতীয় গুটিকয়েক প্রত্যয়ের বেলায় এদের রক্ষণশীলতা প্রায় সমজাতীয়।

এমন পরিস্থিতিতে পণ্ডিতগণের যুক্তি এবং পাশাপাশি বাস্তব চলচিত্রের কিছু খবরাখবর নেওয়া যাক। প্রথমে পণ্ডিত পক্ষ। বানানের কমিটিগুলো ছাড়াও এ পর্যন্ত যাঁরা বানানের ওপর প্রবন্ধ ও বইপত্র লিখেছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই প্রত্যয়গুলোর উচ্চারিত ও–কারের লেখ্যরূপ দানের প্রয়োজনীয়তা মেনে নেননি।

বানান বিশেষজ্ঞ মনীন্দ্রকুমার ঘোষ "ছিলো" তে ও–কার দেখে রীতিমতো কৌতুক বোধ করেন।[৩৭] পবিত্র সরকার বো,–লো,–তো প্রত্যয় প্রসঙ্গে economy ও উচ্চারণ শাসনের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত economy-র দাবিকে গ্রাহ্য করে এইসব ও–কার বর্জনের পক্ষে মত দেন।[৩৮] পরেশচন্দ্র মজুমদারকে বো,–লো,–তো প্রসঙ্গে অনেকটা মধ্যপন্থা অবলম্বন দেখা যায়। তিনি তাঁর বাঙলা বানানবিধি বইয়ে স্বীকার্য বর্জনীয় বানানের যে পীঠিকা দিয়েছেন সেখানে ৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদের নির্দিষ্ট স্থানে এগুলোকে বর্জনীয় বলেননি, তবে দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কারও করেননি।[৩৯] একটি অনুচ্ছেদে তিনি বলেন, "যদি স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাঙলা অতীত ও ভবিষ্যতের ল অথবা র যুক্ত পদের অন্তে ও–কার গ্রহণীয় হবে (গেলো, যাবো), তবে দেখতে হবে তা যেন মোটামুটি সর্বত্র পদান্ত প্রয়োগে অনুসৃত হয়।[৪০]

জামিল চৌধুরী প্রণীত বানান ও উচ্চারণ বইতে এইসব বানাননীতিকেই নির্দ্বিধায় বিবেচনা করতে দেখা যায়।[৪১] প্রায় অনুরূপ বই মাহবুবুল হকের পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম। পদান্তের ওকার আলোচনা প্রসঙ্গে মাহবুবুল হক –ছো – বো,– লো,– তো প্রভৃতি প্রত্যয়ের ও–কারকে যথাসাধ্য বর্জনের পক্ষে মত দেন। তবে মাহবুবুল হকের আলোচনায় – বো,– লো,– তো প্রত্যয়ের পাশাপাশি –ছো প্রত্যয়ের আগমন দেখে পদান্তের এই ও–কারের সংক্রামক শক্তি সম্পর্কে আঁচ করার যাবে।[৪২] – বো,– লো,– তো প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল হায়াৎ মামুদ। তাঁর মতে "ক্রিয়ারূপটির চেহারা সাধুভাষায় কেমন তার ওপর কথ্য রূপের বানান নির্ভর করে।"[৪৩] এই যুক্তিতে "হইল" হবে "হল"। কিন্তু বানান ঠিক করতে কেন আবার ভাষার সাধু রীতিকে আয়ত্ত করতে হবে, তাঁর কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেননি।

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এ পর্যন্ত – বো,–লো,–তো প্রত্যয়গুলোকে উচ্চারণ অনুযায়ী লিখে আসলেও এ বানানের সমর্থনে কেউই তেমন উচ্চবাচ্য করেন না। অনেকটা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী – বো,– লো,– তো প্রত্যয়গুলোতে ও–কারান্ত রূপ দান করেন। অন্তত এঁদের কাউকে বানান সংস্কারের বই বা বানান শেখানোর বই লিখে নিজেদের পক্ষ সমর্থন করতে দেখা যায় না। যাঁরা এগুলোকে উচ্চারণ অনুসারে ব্যবহার করে আসছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সেলিনা হোসেন পর্যন্ত, প্রয়োগই তাদের যুক্তি হয়ে কাজ করে। এমন কিছু প্রয়োগের নমুনা দেখানো যাক:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুদিন আগে চীন থেকে আমার কাছে নিমন্ত্রণ **এসেছিলো**। সেখানকার লোকে আমার কাছ থেকে কিছু শুন্‌তে **চেয়েছিলো** কোনো পাকা কথা। .... যে মেয়েটি আমাকে শুভ ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি **লিখেছিলো** তার চিঠিতে একটি অনুরোধ **ছিলো**, "আপনি ডায়রি লিখ্‌বেন।" তখনি জবাব দিলুম "না ডায়রি **লিখ্‌বো** না।" ... ভয় **ক'রতো** না ব'লে নয়, ভয় **ক'রতো** ব'লেই। ভয় নামক প্রাণের পাহারাওয়ালাটা ঠিক সেই মোড়ের মাথায় দেখা **দিতো** বলেই **তা'কে** ব্যঙ্গ করাটা মজা **বলে মনে হতো**।

[*যাত্রী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯২৯), পৃ. ৩, ৩১, ৩৪।]

নজরুল ইসলাম

কে সে বালা, কোথা তার ঘর?
কবে দেখেছিলে তারে? কেন হ'ল পর
যারে এত বাসিয়াছ **ভালো**?
কেন সে আসিল, এসে কেন সে লুকালো?

[*নজরুল পাণ্ডুলিপি*, সেলিনা বাহার জামান সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৩২।

বুদ্ধদেব বসু

বরুণা দত্ত কোনের **ছোটো** টেবিলটায় স'রে গিয়ে একটা ফর্দ লিখতে **বসলো**। স্মৃতিশক্তির উপর কত আর নির্ভর করা যায় আজকাল। আগেকার দিনে সে কিছুই **ভুলতো** না। হনুমান যত সহজে এক লাফে সমুদ্র পার **হয়েছিলো**, তত সহজেই সে ছেলেবেলায় এক একটা পরীক্ষা পার হ'য়ে গিয়েছে, তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জোরে।

[*পরিক্রমা* (কলকাতা: ডি এম লাইব্রেরি, ১৯৩৮), পৃ. ৮।]

শামসুর রাহমান

সময় **কাটতো** ওর রাশি রাশি বই প'ড়ে, খুব
রাত করে **ঘুমোতো** সে, **কখনো কখনো**
কণ্ঠে ওর নক্ষত্রের **মতো**
ফুটতো কী সব কথা, যা ছিলো আমার
বোধের ওপারে।...
কেননা সে **চেয়েছিলো** গণতন্ত্র মুক্তি পাক লিখে
বুকে স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘোষণা ক'রে
হেটে যাবে রাজপথে, মাথা তার ছোঁবে
আকাশের মেঘলা খিলান।

['একজন শহীদের মা বলছেন', *বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* (ঢাকা: বিউটি বুক হাউস, ১৯৮৮), পৃ. ১১-১২।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

ওসমানকে উঠে বসতে হলো। শিকের ফাঁকে থুথু ফেলে জানলাটা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়লো। কিন্তু পাশের জানলা খোলাই রইলো। [*চিলেকোঠার সেপাই*
(ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩; প্রথম প্রকাশ-১৯৮৬), পৃ.১]

হাসান আজিজুল হক

কোনো দরকার নেই আলোর- রুনু **বললো**।

আমরা কি চলে **যাবো**? লম্বা ছায়াটি জিগগেস করে।

তোমরা কি খালি হাতে?

হ্যাঁ।

আসবার সময় কারো চোখে **পড়েছো** কি? কেউ তোমাদের দেখেছে বলে মনে হয়?

মনে হয় না।

হেঁটে এলে সমস্ত পথ?

হ্যাঁ আমরা কি এখুনি চলে **যাবো**।

['আমরা অপেক্ষা করছি,' *আমরা অপেক্ষা করছি* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৯), পৃ. ১২]

আবু ইসহাক

মালমসলা তো আছে প্রচুর, কিন্তু কোনটা লিখবো? ঠিক তখনই মনে পড়লো, ১৯৫০ সালে জাল নোটের কয়েকটা মামলার তদন্তের ভার পড়েছিলো আমার ওপর। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই 'জাল' উপন্যাসটি রচিত। ১৯৫৪ সালে উপন্যাসটি লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি, এমন সময় হঠাৎ *সূর্য দীঘল বাড়ী* উপন্যাসের প্রকাশক পাওয়া **গেলো**।

[জাল (ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮৯), পৃ. ৭]

গোলাম মুরশিদ

আনন্দবাজারে লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে বেশ ভালো **লেগেছিলো**। তবে সে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এমন এক সঙ্কটের মুহূর্তে যে, ভালো লাগাটা মোটেই উপভোগ করতে পারিনি। তাছাড়া, বইপত্র কিছুই নেই, কেবল স্মৃতির ওপর নির্ভর করে **লিখবো** কী করে? [*যখন পলাতক* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৭।]

হুমায়ুন আজাদ

ভাষাতত্ত্বের অসামান্য বিকাশ **ঘটেছিলো** ধ্রুপদী ভারতে, তবে এই ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য কোনো সহায়তা করে নি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উন্মেষে; বরং মনে হয় সংস্কৃতনিষ্ঠ ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অনেকটা বাঁধা হয়ে **দাঁড়িয়েছিলো** বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবে। পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের নতুন কিছু করার **ছিলো** না।

[অবতরণিকা: বাঙলা ভাষাতত্ত্ব, *বাঙলা ভাষা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. এক।]

সেলিনা হোসেন

আলী আহমদের সঙ্গে দেখা হলেই সালাম দেয়। একদিন ওর বাসায় বড়ো একটা রুই মাছ **পাঠিয়েছিলো**। পুষ্পিতা রাখতে চায়নি, কিন্তু জোর করে রেখে গেছে। সে মাছের মাথার মুড়িঘণ্ট খেয়ে প্রদীপ্ত **বলেছিলো,** বাবা একটা লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ভিজিয়ে আগুন **জ্বালাবো**। [*গায়ত্রীসন্ধ্যা,* ১ম খণ্ড (ঢাকা: বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ১০১।]

-বো,-লো,-তো,-ছো প্রভৃতি কালবাচক প্রত্যয়গুলোর বানানে ঐক্য আনার জন্য মোটামুটি দুটো পথ খোলা আছে: এক, উচ্চারণ অনুসারে ও-কার লেখার স্বীকৃতি; অথবা দুই, উচ্চারণের তোয়াক্কা না করে সর্বত্র পদান্তের ও-কার বর্জন। বর্তমানে প্রচলিত বানাননীতিগুলো দুটো পথের কোনোটাকেই অনুসরণ করে না। তার ফলে লেখক প্রতি মুহূর্তে পদান্তের এই ও-কার নিয়ে ভাবনায় থাকেন। এ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে বিকল্পবর্জিত বানান প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে উচ্চারণকে গুরুত্ব দিয়ে যথাসাধ্য সরল-সূত্রের আবিষ্কার প্রয়োজন, ভাষা ব্যবহারকারী খুব সহজেই যা মনে রাখতে পারবেন। যেমন সূত্রটি হতে পারে এ রকম: "শেষে যুক্তাক্ষর নেই এমন যাবতীয় অ-তৎসম শব্দের অন্তে উচ্চারিত 'ও' ধ্বনিকে লিখিত রূপ দেওয়া হবে।" এতে ক্রিয়াপদের পাশাপাশি অন্যান্য পদান্তের ও-কারও বৈধতা পাবে, যা বর্তমানে চালু বাননীতিগুলোতে মোটামুটি স্বীকৃত (যেমন- কালো, ভালো, বারো, তেরো, যতো, হয়তো প্রভৃতি)। লেখ্য বাংলা ভাষার বানান প্রমিতীকরণের প্রধান অন্তরায় এই ক্রিয়াপদান্তের ও-কার সমস্যার সমাধান অন্য কোনোভাবে সম্ভব বলে আপাতত মনে হয় না।

উপসংহার

বিশ্বভারতী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলা একাডেমী, আনন্দবাজার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে পুরো শতাব্দী জুড়ে কম করে হলেও এক ডজন বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব নিয়ম প্রণয়নের মোটামুটি লক্ষ্য ছিলো বাংলা শব্দের বানানে স্থিরতা এনে বিকল্প বানানহীন একটি প্রমিত ভাষা তৈরি করা।

অনেকাংশ সফলতা এলেও ব্যর্থতার পরিমাণ যে একেবারে কম নয়, উপরের আলোচনায় তা দেখা গেছে। অন্তত, বানান যে এখনো প্রমিত রূপ পায়নি, তা প্রমাণ করতে প্রবন্ধ লেখার দরকার হয় না, সকাল বেলা গোটা চারেক দৈনিকে চোখ বুলালেই যথেষ্ট, একই শব্দ তার একাধিক রূপবৈচিত্র্য নিয়ে একে একে চোখ এসে ঘা দিতে থাকবে।

এভাবেই কি চলতে থাকবে বাংলা ভাষার দিনকাল? বাংলা গদ্য কি তার সুস্থিত চেহারার শব্দভাণ্ডার নিয়ে ধ্রুপদি অবস্থানে উঠে আসতে অক্ষম হবে? কথ্যভাষার বদনাম ঘুচিয়ে চলিত রীতি কি বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নিয়ে আবির্ভূত হবে না?

বাংলা ভাষা নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান দেশ বিদেশে কাজ করছে প্রয়োজনে তাদের সবাইকে একত্র করে একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার মাধ্যমে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা যায়। আইবিএস-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে, তা সবচেয়ে জরুরি একটি সময়ের প্রয়োজন মেটাবে। আইবিএস-এর সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যেও এটা পড়ে, এবং এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে আইবিএস বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এক মহান ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। হুমায়ুন আজাদ, 'অবতরণিকা,' *বাঙলা ভাষা, ১ম খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪),পৃ. নয়।

২। অজরচন্দ্র সরকার, 'বাঙ্গালা টাইপ ও কেস,' *প্রবাসী,* পৌষ ১৩৩৯, পৃ. ৩২৬।

৩। তদেব।

৪। 'বাংলা বর্ণমালা সংস্কার,' *বঙ্গদর্শন* (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: দি ন্যাশনাল লিটেরেচার কোম্পানি, ১৯৩৯), ৬ঃ৯, পৃ. ৪৫৩-৪৬৩; ৬ঃ১০, পৃ. ৪৯৩-৫০২; ৬ঃ১১, পৃ. ৫৪২-৫৪৫।

৫। দ্রষ্টব্য, *বাঙলা ভাষা, ১ম খণ্ড*, পৃ. ৫০০, ৫২৩।

৬। তদেব, পৃ. ৫৭৯-৬৩৯; আবু ইসহাক ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রস্তাবের জন্য দ্রষ্টব্য, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত, *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী,* ৩য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮।

৭। বাংলা একাডেমী আয়োজিত ৩রা নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠিত 'কম্পিউটার ও বাংলা ভাষা সম্পর্কিত কর্মশালা'য় কম্পিউটারে বাংলা ব্যবহারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব জনাব মোস্তফা জব্বার আলোচনা প্রসঙ্গে এ তথ্য প্রদান করেন।

৮। মানব মস্তিষ্ককে অপ্রত্যাশিত জটিলতায় ফেলেছে বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। নীতিমালা অনুসারে ১৯৯২ সাল থেকে বোর্ড প্রকাশিত প্রাথমিক শ্রেণীসমূহের পাঠ্যপুস্তকে

যুক্তাক্ষরগুলোকে স্বচ্ছরূপে মুদ্রিত হতে দেখা যায়; কিন্তু নবম দশম শ্রেণী বা উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে এ নিয়ম মানা হয় না। তার ফলে শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর একই শিক্ষার্থীকে আবার নতুন করে যুক্তবর্ণের নতুন কিছু রূপকে আয়ত্ত করতে হয়। এ পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর মস্তিস্কেষ উপর যথেষ্ট সুবিচার করে না।

৯। বাংলা একাডেমী, *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), সূত্র ৩.০১।

১০। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ: সুপারিশপত্র* (কলকাতা: আকাদেমি ভবন, ১৯৯৫), সূত্র ১.১০-১.৩০।

১১। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *পাঠ্য বইয়ের বানান*, পৃ. ৫৪।

১২। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৩৬) এবং সম্প্রতি বাংলা একাডেমী (১৯৯২) ই-এর পক্ষে হলেও বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (১৯৯২) এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলা আকাদেমি (১৯৯৫) খ্রিস্টান বানানে স্ট-এর পক্ষে।

১৩। দ্রষ্টব্য, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'আরবী ও ফারসী হরফের অনুলিখন পদ্ধতি,' *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, ১ম খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫) পৃ. প-ফ; ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, 'বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি,' *আরবি বাংলা অভিধান, ১ম খণ্ড*, মুহম্মদ আলাউদ্দিন আল্-আযহারী সংকলিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭০), পৃ. [১৫]।

১৪। বর্ণগুলোর নীচে ফুটকি দিয়ে প্রতিবর্ণীকরণের কাজ করেছেন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। দ্রষ্টব্য, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস,'বর্ণের মূল্য (Value or equivalent), উচ্চারণ ও বর্ণান্তরীকরণ,' *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯১), পৃ. ২৩।

১৫। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, 'ভূমিকা', *পাঠ্য বইয়ের বানান* (ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৯২), পৃ. ১।

১৬। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), যত্রতত্র। অভিধানের নামকরণের সঙ্গে এর প্রকৃতির খুব একটা সামঞ্জস্য নেই, রসিকতা করে এ রকম হয়তো বলা যেতে পারে যে, *বাংলা ভাষায় একটি শব্দ কতোরকম বানানে ব্যবহৃত হয়, এ অভিধানের ব্যবহারকারী তা জানতে পারেন- তাই এর নাম ব্যবহারিক।'*

১৭। হ্যালহেড সাহেবের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের জন্য দ্রষ্টব্য, গোলাম মুরশিদ, *কালান্তরে বাংলা গদ্য* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২), পৃ. ২৪।

১৮। "আমাদের লেখ্য বাঙলাভাষার শতে প্রায় সত্তরটি শব্দই হচ্ছে অবিকৃত সংস্কৃত ভাষার শব্দ," আহমদ শরীফ, 'প্রবেশক,' *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* (২য় সং; ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. তেরো।

১৯। *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ: সুপারিশপত্র, সূত্র* ৪.২১।

২০। *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

২১। বিশ্বভারতী, 'বাংলা বানানের নিয়ম,' উদ্ধৃত, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী প্রমুখ সম্পাদিত, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ৯১।

২২। *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*, সূত্র ১.০৪।

২৩। *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* সূত্র ২.০২; *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ: সুপারিশপত্র*, সূত্র ২০।

২৪। *তদেব*, সূত্র ২.০৩।

২৫। *বাংলা বানানের সমতাবিধান এবং লিখনরীতি ও লিপির সরলীকরণ: সুপারিশপত্র*, সূত্র ১৬.২০।

২৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, *বাংলা বানানের নিয়ম*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৩৭), সূত্র ৭।

২৭। *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ২য় সংস্করণ, 'কি' শব্দের নীচে।

২৮। নরেন বিশ্বাস, *বাঙলা উচ্চারণ অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০), পৃ. এগারো।

২৯। আবু ইসহাক, 'ভূমিকা,' *সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. এগারো।

৩০। *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*, সূত্র ২.১০। এখানে লেখা হয়েছে, "বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।"

৩১। সুকুমার সেন, *বাংলা স্থাননাম* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮১), পৃ. ১-২।

৩২। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, *পাঠ্য বইয়ের বানান*, সূত্র ১৯।

৩৩। হায়াৎ মামুদ, *তদেব*, পৃ. ৫৫।

৩৪। দ্রষ্টব্য, *বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ*, পৃ. ৯০।

৩৫। *তদেব*, সূত্র ৮,১১।

৩৬। *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম*, সূত্র ২.০৯, ২.১৩, ৩.০৫।

৩৭। মনীন্দ্র কুমার ঘোষ, *বাংলা বানান* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৮২), পৃ. ৫৮।

৩৮। পবিত্র সরকার, *বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা* (কলকাতাঃ চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৭), পৃ. ৭৫।

৩৯। পরেশচন্দ্র মজুমদার, *বাঙলা বানানবিধি* (কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরি, ১৯৮২), পৃ. ৪৫।

৪০। *তদেব*, পৃ. ১০।

৪১। জামিল চৌধুরী, *বাংলা বানান ও উচ্চারণ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬)।

৪২। মাহবুবুল আলম, *পাঠ্য বইয়ে বাংলা বানানের নিয়ম* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ৭২-৭৩। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত একই লেখকের *বাংলা বানানের নিয়ম* বইটিতে ও-কার সম্পর্কে গতানুগতিক রক্ষণশীলতা লক্ষণীয়। মাহবুবুল আলম, *বাংলা বানানের নিয়ম* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯১), সূত্র ২৩.১০.১।

৪৩। হায়াৎ মামুদ, *বাংলা লেখার নিয়ম কানুন* (ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৫৬।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খান বাহাদুর আহছান উল্লার (১৮৭৩-১৯৬৫) অবদানঃ একটি পর্যালোচনা

ইমরান হোসেন

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মানসকে যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের লক্ষে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৩-১৮৯৩), সৈয়দ আমির আলী (১২৪৯-১৯২৮), সৈয়দ আমির হোসেন (জ.১৮৪৩), নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), মওলানা ওবায়দুল্লা ওবেদী (১৮৩৪-১৯৮৫), নবাব ফয়েজুন্নেছা, প্রমুখ মনীষীগণের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 'আঞ্জুমনে ইসলামী (১৮৫৫), মহামেডান লিটেরেরী সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সমিতি' (১৮৯১, চট্টগ্রাম) প্রভৃতি সংগঠন বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে বাংলার মুসলিম সমাজে আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হয়। বিশ শতকের প্রথম পাদে কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতি মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায় সমূহ চিহ্নিত করে এই সব দূরীকরণে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) স্যার আজিজুল হক (১৮৯০-১৯৪৭), খান বাহাদুর আহছান উল্লা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, সৈয়দ শামসুল হুদা', দেলোয়ার হোসেন আহমদ, বেগম রোকেয়া, স্যার আবদুর রহীম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার আজিজুল হক, মৌলভী আব্দুল করিম ও খান বাহাদুর আহছান উল্লা বাংলার মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। আব্দুল করিমের *Muhamadan Education in Bengal* (1900), স্যার আজিজুল হকের *History and Problem of Moslem Education in Bengal* (1917) খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লার *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান* (১৯৩১) *নীতি, ধর্ম শিক্ষা ও চরিত্র গঠন* (১৯২৯) ও *টিচার্স ম্যানুয়েল* (১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের নীতি ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। এই সব ছাড়াও নবাব আলী চৌধুরীর *Vernacular Education in Bengal* একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের ভাষা ও পাঠ্যসূচি সমস্যা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন।

এঁদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম ও খান বাহাদুর আহছান উল্লা দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা খুব কাছ থেকে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার নানা সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে ক'জন মুসলিম মনীষী মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন খান বাহাদুর আহছান উল্লা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি দীর্ঘ তিন দশক নিজ সমাজের শৈক্ষিক, নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ১৮৭৩ সালে সাতক্ষিরার মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৯৬ সালে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সুপার নিউ মেরারী শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯০৭ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টরের পদে নিয়োগ পান এবং স্বল্প বিরতিসহ দীর্ঘ ১৭ বছর এই বিভাগে ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৪ সালে তিনি মুসলিম শিক্ষার সহকারী পরিচালক (ADPI, Moslem Education) নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে কোন বাঙালি এই পদে নিয়োগ পান নি। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে বহাল থেকে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই পদে চাকরিরত থাকাকালীন সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট এর সদস্য ও কলা অনুষদের ফেলো ছিলেন।[১] উল্লেখ্য, তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য ১৯১১ সালে খান বাহাদুর খেতাব পান।[২]

খান বাহাদুর আহ্ছান উল্লার শিক্ষা নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় পূর্বে উল্লেখিত *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান টিচার্স ম্যানুয়েল* গ্রন্থদ্বয় থেকে। দীর্ঘ সময়ের শিক্ষা বিভাগের চাকরি ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গ্রন্থের আলোচনায়। বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

> সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমান শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪.৫ জন মাত্র। বলা বাহুল্য, যাহাদের বর্ণ জ্ঞান আছে, তাহাদের শিক্ষিত পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকারের ঘোরতর মূর্খতা এক তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ ছাড়া কোথাও পরিলক্ষিত হয়না। ম্যালেরিয়া অতিব মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নাই, মূর্খতা ম্যালেরিয়া অপেক্ষা ভীষণ। জাতির সর্ব্বশক্তি ও সম্পদ জ্ঞান; অপিছ বঙ্গীয় সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মোছলমান। ইহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পাওয়া আছে।[৩]

খান বাহাদুর আহছান উল্লা সরকারী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নিজের সমাজের কল্যাণের জন্য নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। চট্টগ্রাম বিভাগের ইন্সপেক্টর থাকা কালীন এই বিভাগের মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই সময় চট্টগ্রাম

বিভাগে শিক্ষার জন্য অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করা হত। ফলে এই বিভাগে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধিরহার বেড়ে যায়। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯০৫-৬ থেকে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ববঙ্গের জেলা সমূহের মধ্যে চট্রগ্রাম জেলায় ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশী।৪ নীচের সারণী থেকে বৃদ্ধির হার স্পষ্টভাবে বুঝা যাবেঃ

সারণী-১

	১৯২১-২২		১৯২৪-২৫	
জেলা	ছাত্রসংখ্যা	হার	ছাত্রসংখ্যা	হার
ঢাকা	৬৯২০৩	২২.৫	৮২৪১৭	২৬.১+০৪.৪
চট্রগ্রাম	৫৭৭৩৭	৩২.৮	৮১৬৮৬	৪৬.৪+১৩.৬
নোয়াখালী	৫৪৭৭৮	৩১.৯	৭০৭৬৫	৪১.২+০৯.৩
পার্বত্য চট্রগ্রাম	২২৫	২০.৭	৩২৪	২৯.২+০৮.৫
যশোর	৩১৩৩১	১৯.৬	৩২৫৭২	২০.৪+০.৮
পাবনা	৩৬০৫২	১২.৬	৩৫৫৪৪	১২.৫-০.১
বর্ধমান	১২০০৯	১৬.৭	১৩২৯৪	১৮.৫+০১.৭
মুর্শিদাবাদ	১৬২৫৭	১৬.০০	১৬৯৯৬	১৬.৭+.৭

সূত্রঃ *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার,* বি. ভলিউম, (স্ট্যাটিসটিক্স), জেলাঃ ঢাকা, চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্রগ্রাম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫।

১৯২৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত খান বাহাদুর আহছান উল্লা চট্রগ্রাম বিভাগের পরির্দশকের দায়িত্বে ছিলেন। এই সময়ে তার অধিনস্থ সব জেলায় ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে। অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও এই সময় এই জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে। ১৯৫১ সালের পূর্ব পাকিস্তানের সেন্সাসে দেখা যায় যে, চট্রগ্রাম বিভাগের জেলা সমূহের শিক্ষার হার পূর্ববঙ্গে সবচেয়ে বেশী। চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেটের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৩২%, ২৩%, ২৪% ও ২৪%। অন্যান্য জেলা সমূহের মধ্যে খুলনার শিক্ষার হার ছিল ২৩% এবং এর পর ঢাকার স্থান (২১%)। খানবাহাদুর আহছান উল্লা, চট্রগ্রাম বিভাগে শিক্ষার উন্নতির জন্য যে অবকাঠামো তৈরী করে দিয়েছিলেন তারই ফলে চট্রগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।

১৯২৪ সালে মোসলেম শিক্ষা বিষয়ক সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কলিকাতায় চলে যান। এই দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তাঁর কাজের চাপ বহুগুণ বেড়ে যায়। পাশাপাশি মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতির জন্য সুযোগ পান। নীতি নির্ধারনী বিভাগীয় মিটিং ছাড়াও প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩০টি

বিষয়ের (Case) মীমাংসা করতে হত। এর উপরে ছিল নিয়মিত সাক্ষাৎকার প্রদান। গোটা বাংলার মুসলিম শিক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি অত্যন্ত সাফল্য জনকভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী সভা সমূহে প্রভাব খাটিয়ে তিনি মুসলিম শিক্ষার অনুকূলে বহু প্রস্তাব ও প্রকল্প পাশ করাতে সক্ষম হন। নতুন দায়িত্ব পাবার পর পূর্বে স্থগিত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল দীর্ঘ দিনের। সরকার নীতিগতভাবে এই দাবী মেনে নেওয়ার পরও নানা কারণে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ দাবী পেশ করা সত্বেও এই কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তিনি সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত কলেজ (ইসলামীয়া কলেজ) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তাঁর দপ্তর থেকে তথ্য ভিত্তিক দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বিপোর্টে বলা হয়ঃ

Proposal for the establishment of such a college in Calcutta was first made in 1881, and intermadiate classes were opened in Calcutta Madrasa in 1883. The classes were however abolished in 1919, and since then a certain number of Master students have been allowed to read in the presidency college for the payment of reduced fees.
On account of the increase of Muslim students Govt. expressed desire to establish in 1913 and again in 1914, Calcutta University Commission also recommended for such college.

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী, শামসুল ওলেমা হেমায়েত হোসেন, আবদুস সালাম, এম.এল.সি. কাজী জহিরুল হক, খান বাহাদুর মোশাররফ হোসেন, মিঃ আলতাফ আলী, মিঃ জে.এ. বটমলি। ১৯২৪ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এই কমিটির ১ম সভা হয়। এই সভায় প্রস্তাবিত কলেজের নাম 'ইসলামীয়া কলেজ' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হবার পর ১৯২৭ সালে এই কলেজে ক্লাশ শুরু হয়। ১৯২৭ সালের ২৮ শে জুন তিনি এই কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ফলে, কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে কাজ করার অধিকতর সুযোগ পান। এই কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ

> কলিকাতা মোছলেম ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইল। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উথাপন করেন। আমি বলিলাম হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে মোছলেম

কলেজের আবশ্যকতা নিশ্চয় আছে। ব্যয় গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন, সুতরাং আপত্তি অগ্রাহ্য। প্রস্তাবিত মোছলেম কলেজে আরবী, ফারসী ও উর্দু শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ..... ফলে কিছুদিনের মধ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল Mr. Harly এই কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন। কলেজ খুলিতেই প্রচুর মুসলিম ছাত্রের সমাবেশ হয়.....।

ইসলামীয়া কলেজ ছাড়াও তিনি তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকে বহু স্কুল, কলেজ, হোষ্টেল প্রতিষ্ঠার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল সমূহের পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন তখন নব গঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রতিবছর তাঁর মাধ্যমে এক লক্ষেরও অধিক টাকা তাঁর মাধ্যমে শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হত। তাঁর সময়ে বিভাগের হাই স্কুল সমূহের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। ফেণী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর হাই স্কুল সমূহ তাঁর সহায়তায় মজবুত ভিত্তি অর্জন করে। তিনি বিভিন্ন স্কুলে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র হোষ্টেল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সহকারী পরিচালক থাকাকালীন তিনি ১০টিরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে অর্থ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা নেন। এই স্কুলগুলোর অধিকাংশই ছিল মুসলিম প্রধান এলাকায়। সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলো হলঃ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম মোসলেম হাই স্কুল, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, ঝালকাটি সরকারী হাই স্কুল, রংপুর জেলা স্কুল, কুমিল্লা জেলা স্কুল, নোয়াখালী জেলা স্কুল, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রভৃতি।[১]

চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল তাঁর প্রচেষ্টার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাদ্রাসার "Integral Part" হিসাবে ছিল। ক্রমান্বয়ে এটি এ্যাংলো পার্সীয়ান বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৯ সালে এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ১৯১৬ সালে এটি হাইস্কুলের মর্যাদা পায়। এ ছাড়াও ঢাকা মাদ্রাসার উন্নয়ন, কলিকাতা মাদ্রাসার এ্যাংলোফার্সী বিভাগের উন্নয়ন ও প্রসার, মহসীন তহবিলের সঠিক ব্যবহারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।[২]

চট্টগ্রাম মাদ্রাসা ১৮৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। তাঁর উদ্যোগে এখানে ইন্টারমিডিয়েট সেকশন চালু হয়। ১৯২৬ সালে স্যার আবদুর রহীম এই মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। ১৯২৭ সালে এটি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৮ সালে, কলিকাতাস্থ মোসলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গালর্স কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা মাদ্রাসার সংস্কার ও কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি উদ্যোগ নেন। বেকার হোষ্টেল, টেলর হোষ্টেল ও কারমাইকেল হোষ্টেল প্রতিষ্ঠায় তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছিল।

তৎকালে মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নীতি ও সিলেবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। সিলেবাস হিন্দু পৌরানিক কাহিনী নির্ভর ও ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থী বলে অভিযোগ করা হয়। শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকারী পর্ষদসমূহে মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। খানবাহাদুর আহছান উল্লা ১৯২৬-২৭ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য ছিলেন। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অন্তরায় সমূহ দূরীকরণে সুযোগ পান এবং তিনি এই সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি বলেনঃ ইতিপূর্বে কোন মুসলিম Syndicate এর সদস্য মনোনীত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার Syndicate এর হস্তে ন্যস্ত। ..... যাহা হউক এখানকার সদস্য নির্বাচিত হইয়া বহু হিতকর কার্য সমাধানে কৃতকার্য হই।

সহকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, তাঁর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯২৬-২৭ সালে বাংলায় মোট মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১৩৯৯৪৯। এক বছরের মধ্যে ১৯২৭-২৮ সালে তা বেড়ে ১২৩৫৭০৬ জনে উন্নীত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষাতেও সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়। ১৯২৬-২৭ থেকে ১৯২৭-২৮ এই এক বছরে শুধু প্রেসিডেন্সী বিভাগে মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ১০০০ জন বাড়ে এবং মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ে ১২৭টি। সমগ্র বাংলাদেশে মক্তবের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রায় ২০০০ এর মত।

খানবাহাদুর আহছান উল্লা পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর সময়ের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তিনি সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারের মহৎ ও দুঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হন। তাঁর এই অবদান ও কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

তথ্য নির্দেশঃ

১। খানবাহাদুর আহছান উল্লা, *আমার জীবন ধারা*, ঢাকা, ১৯৮৭ (৬ষ্ঠ সংস্কারণ), পৃঃ ৯-৩৫, ৯১-৯২।

২। *Bengal Civil list*, 1944, Cal.

৩। খানবাহাদুর আহছান উল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, ঢাকা, ১৯৮৭ (২য় সংস্কারণ), পৃঃ ৫-৬

৪। *Bengal District Gazectteer*, B Volume: 1910-11, 1920-21, Districts: Bardwan Chittagong, Dacca, Iess are Pabna.

৫। *Causes of East Pakistan*, 1951, p.102

৬। *Proceeding of the Government of Bengal, Edu. Dept*, Sept. 1926.

৭। *Proceeding of the Bengal Govt op-cit.*

৮। খানবাহাদুর আহছান উল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯৪।

৯। *Proceeding of the Govt. of Bengal, op-cit* Sept. 1927

১০। *ঐ*, জুলাই, ১৯২৮

১১। *Letter of DPI to Education Secretary*, 19th Feb. 1926. File 1-M-8 (1).

১২। Education Proccedings, *op cit*, April 1929.

১৩। খানবাহাদুর আহছান উল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত পৃঃ ৯।

১৪। *Report on the public Instruction. Bengal*, 1927-28.

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম'

সাইফুদ্দীন চৌধুরী

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবন চর্চা ও সাহিত্য প্রয়াসের প্রাথমিক যুগে যে ক'জন মনীষীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, রাজশাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন যুগপৎ সংগঠক ও লেখক। লেখক হিসেবে মির্জা সাহেব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ইমাম গাজ্জালীর অমর সৃষ্টি *কিমিয়ায়ে সা'আদৎ* গ্রন্থের অনুবাদ *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* প্রকাশ করে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

> পাঠ করিয়া আমরা পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থের মধ্যে যে ভাবের মহত্ব দেখিলাম তাহা অপূর্ব। মহামূল্যবান গ্রন্থ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বাঙ্গলা ভাষায় এক অমূল্য সম্পদ এবং কালের কষ্টি পাথরে চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবে।[১]

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং পূনর্জাগরণের কাজে সহায়তা দান করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা', প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'গৌড়ীয় সমাজ', 'রাধাকান্তদেবের 'ধর্মসভা', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ন্যায় নিজ এলাকার মুসলমানদের জাগ্রত করতে সমিতি প্রতিষ্ঠা, পুস্তক রচনা ও প্রকাশ এবং পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, এ সময় বাংলাদেশে এ জাতীয় সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরও বেশ কয়েকজন বাঙালী মুসলমান ব্যক্তিত্ব অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; তাঁদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, যশোহরের মুন্সী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ্, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, টাঙ্গাইলের মৌলভী নঈমুদ্দীন প্রমুখ।

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী প্রথম জীবনে স্কুল শিক্ষকতা এবং পরবর্তীকালে সাব-রেজিষ্ট্রার হিসেবে সরকারী চাকুরীর মধ্য দিয়ে কর্মজীবন সমাপ্ত করেন। বলা চলে, মির্জা সাহেব তাঁর কর্মজীবনের প্রায় শুরু থেকেই মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সেবা, সাহিত্য চর্চা ও ধর্মপ্রচারের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি রাজশাহীতে 'নূর-অল-ইমান সমাজ' ও 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম' নামে দুটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। 'নূর-অল-ইমান সমাজ' এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।[২] নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক

প্রকাশিত *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* গ্রন্থে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়ঃ

> সুবিখ্যাত এখওয়ানোছ ছাফা নামক সমাজের অনুকরণে এবং বিদ্যানুরাগী ইংরেজ রাজপুরুষগণের স্থাপিত এসিয়াটিক সোসাইটি সমাজের সাদৃশ্যে ১৩০২ সালে উত্তর বঙ্গে নূর-অল-ইমান নামক একটা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কার্য করা এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যথাঃ
>
> (ক) বালক বালিকাগণের উপযোগী বিবিধ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা-
>
> (খ) বয়স্ক নর-নারীদিগকে জনপথ প্রদর্শনার্থ হিতকর গৃহপাঠ্য ও অবসর পাঠ্য পুস্তক ও পত্রিকা প্রচার করা-
>
> (গ) আরবী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রচার করা-
>
> (ঘ) উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ টাইপ সৃষ্টি করতঃ তদ্দারা কোরআন শরীফ ও আরবী পারসী গ্রন্থ ছাপা করা-
>
> (ঙ) শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক দেশ হিতকর গ্রন্থাদি প্রচার করা-
>
> (চ) গ্রন্থকারদিগকে তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ প্রচারে সাহায্য করা। (হিতকর গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াও প্রকাশিত না হইলে কোন শরৎ স্থাপন করিয়া সমাজের পক্ষ হইতে সে পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করা যাইবে।)
>
> (ছ) প্রচারক প্রেরণ দ্বারা মৌখিক উপদেশ প্রচারে শিক্ষিত সর্ব সাধারণকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করা-
>
> (জ) চিন্তা ও অভিজ্ঞতার আদান প্রদান হেতু সমাজের পক্ষ হইতে একখানি ম্যাগাজিন বিশ্বজ্ঞানাধার (পত্রিকা) প্রকাশ করা। নানা বিষয়ক পরামর্শ মতভেদের মীমাংসা এবং সামাজিক হিতকর কার্য্যের প্রণালী ইত্যাদি সম্বলিত নানাবিধ প্রবন্ধ ইহাতে আলোচনা করা হইবে।[৩]

নূর-অল-ইমান সমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয়;

> নূর-অল-ইমান সমাজের পরিচালক মেম্বারগণ মোসলমান হৃদয় হইতে জঘন্য দোষগুলি দূর করিয়া তৎপরিবর্তে উজ্জ্বল গুণাবলী, মনুষ্যত্ব ধর্ম উদ্ভাসিত করিতে, এসলাম সমাজে দিব্যালোক বিস্তার করিতে, মোসলমান ভ্রাতা ভগিনীর হৃদয় একটি সাধারণ মিলনসূত্রে গাঁথিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়া যে সকল চেষ্টা করিতেছেন, তন্মধ্যে পুস্তক পত্রিকার প্রচার কার্য্যও একটি প্রধান কার্য্য।[৪]

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী নিজে এই সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরবর্তীকালে লেখনঃ

> যাহারা ধর্ম্মোপদেশ দিয়ে বেড়ান, তাহাদের অধিকাংশই স্বার্থের গোলাম, তাহারা আমাদের বঙ্গীয় মোসলমান সমাজকে আলস্যের দিকে, ভিক্ষাবৃত্তির দিকে এবং

> মূর্খতার দিকে টানিয়া লইতেছেন। প্রচারকের মত প্রচারকের দল সৃষ্টি করিতে হইবে তাহাদিগকে নূতন ছাঁচে গড়িতে হইবে। বাঙ্গলাদেশের উপযোগী ও এই উন্নত যুগের লায়েক করিয়া শিক্ষার দ্বারা প্রচারক তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাহা ২/১ বৎসরের কাজ নহে। শিক্ষা দিলেও সকলেই উত্তম প্রচারক হইতে পারিবে না। ..... এই জন্য আগে গ্রন্থ প্রচার, পরে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।[৫]

নূর-অল-ইমান সমাজের সদস্যগণ নিজেরা চাঁদা সংগ্রহ করে সমাজের ব্যয় সংকুলান করতেন এবং মুষ্টি ভিক্ষা করে গরীব ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা ও শিক্ষার সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহ করতেন।[৬]

নূর-অল-ইমান সমাজের লক্ষ্য ও আদর্শকে অনুসরণ করে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত ঘটে। পিতার ঐ কর্মদ্যোগ সম্পর্কে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী পরবর্তীকালে লিখেছেনঃ ..... 'এই সমাজের কাজের সূত্রপাত হিসেবে তিনি বিশ্ববরেণ্য ইমাম গাজ্জালী সাহেবের 'কিমিয়ায়ে-সা'আদত' নামক পারস্য গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ সৌভাগ্য স্পর্শমণি লিখতে আরম্ভ করেন।[৭]

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর *দুগ্ধ সরোবর* গ্রন্থই যুগপৎ নূর-অল-ইমান সমাজ ও মির্জা সাহেবের প্রথম প্রকাশনা। গ্রন্থখানি ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে) মির্জাবাগ ভিলা, রাজশাহী থেকে এই সংগঠনের নামে প্রকাশিত হয়। *কওমী পুস্তিকা* হিসেবে প্রকাশিত এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছে, মুসলমান সমাজকে কিভাবে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা যায় তার উপায় নির্ধারণ করা। সুকৌশল এবং মনোহর গল্পচ্ছলে মুসলমান সমাজ কি কারণে দূর্দশাগ্রস্ত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করে দুর্দশা থেকে অব্যাহতি দানের প্রচেষ্টা চালান।

দুগ্ধ-সরোবর এর দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত লেখকের বক্তব্য থেকে নূর-অল-ইমান সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়ঃ

> বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে উন্নতির পথে লইতে (১) কুসংস্কার বর্জ্জিত যুক্তিমূলক উদার ধর্মমত প্রচার; (২) হিতকর শিক্ষা বিস্তার; (৩) মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার; (৪) সমবেত শক্তি গঠনে বিশ্বাসমূলক ভাগ সওদাগরীর প্রসার--এই চতুর্বিধ কার্য শৃঙ্খলার সহিত সমাজে প্রচলিত করিতে দেশের বিত্তশীল, সমাজপতিগণের নিকট অনুরোধ স্বরূপ 'দুগ্ধ-সরোবর' লিখিত হয়।[৮]

নূর-অল-ইমাম সমাজের বড় অবদান মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর মোট ৭ ভাগে ৫ খন্ডে ১৯০৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ইমাম গাজ্জালীর *কিমিয়ায়ে সা'আদাত* এর অনুবাদ প্রকাশ। সমাজের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক হিসেবে মূল দায়িত্ব দেয়া হলেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উৎসাহ দানের জন্য তৎকালের খ্যাতানামা আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

কমিটি নিম্নরূপ ছিলঃ

পরিদর্শকঃ (ক) মৌলভী আবদুল আজিজ (ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক),
(খ) মৌলভী আবু আলী মোহাম্মদ আবেদ (রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান মৌলভী),
(গ) মৌলভী মোহাম্মদ সাবের উদ্দীন আমিন (রাজশাহী মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মৌলভী),
অনুবাদক ও সম্পাদক ঃ মৌলভী মোহাম্মদ ইউসফ আলী,
নকলকারক ঃ মুনশী মোহাম্মদ আলিম,
সহকারী সম্পাদক ঃ খয়রুজ্জামান খাঁ।[৯]

'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' অনুবাদ বিষয়ে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী লিখেছেনঃ

> পাঠক ইহার অনুবাদ পড়িতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইহা একটি অমূল্য 'ধর্মবিজ্ঞান'। কিমিয়ায়ে সা'আদৎ নিকৃষ্ট ধাতু স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ এই অমূল্য গ্রন্থপাঠে নর-নারী প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকৃত দেবত্ব লাভ করিতে পারিবেন, সৌভাগ্যের মহান উন্নত সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিবেন।
>
> বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় অদ্য এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ হইতে চলিল। হাতেম তায়ী, আমীর হামজা, গোলেবকাওলী, সোনাভান, জৈগুন, বিদ্যাসুন্দর ও নানাপ্রকার নাটক নভেল প্লাবিত দেশে ইহার কিরূপ সম্মান হইবে, তাহা অনুবাদক সমাজ জানেন না। কোমল সাহিত্য উদ্যানে নিতান্ত সুকুমার-কুসুম-চয়নে যাহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা কি উত্তাল-তরঙ্গাকুলিত কুম্ভীর হাঙ্গর-মকর-সঙ্কুল ভীষণ জ্ঞানার্ণবের অতল গর্ভে অনন্ত প্রত্যাবিশিষ্ট মণিমাণিক্য উদ্ধারার্থে কোমল মস্তিষ্ক নিমজ্জিত করিতে পারিবেন? .....বিদ্যা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে; স্বদেশীয়-স্বজাতীয় ভ্রাতা ভগিনীদিগকে জ্ঞানের একটি নতুন পথ প্রদর্শন করা এবং তাঁহাদিগকে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়াই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য।[১০]

নূর-অল-ইমান সমাজ সর্বমোট ৬ খানি পুস্তক প্রকাশ করে। ঐ সমাজ থেকে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর অপর প্রকাশিত গ্রন্থ বঙ্গদেশে ইসলাম মিলনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক গ্রন্থ *খোশখবর*। নূর-অল-ইমান সমাজ থেকে প্রকাশিত অপর গ্রন্থ *ওয়ায়েজুল মোমেনীন*। দেওয়ান নাছিরুদ্দীন আহম্মদের স্বামীর প্রতি মুসলমান রমনীর কর্তব্য বিষয়ক গ্রন্থ 'পতিভক্তি' এবং মুন্সী জোবেদ আলী রচিত নামাজ রোজা বিষয়ক পুস্তক *তালিমে নামাজ*।[১১]

নূর-আল-ইমাম সমাজ কর্তৃপক্ষ, তাঁদের কার্যক্রম সমূহের বিস্তার ও প্রচারকল্পে সর্বসম্মতিক্রমে মাসিক *নূর-অল-ইমান* নামে একখানি মুখপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করেন। পত্রিকার আখ্যাপত্রে লেখা থাকতো 'নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত ও মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত।' সমাজের সকল সদস্য বিনা পয়সায় পত্রিকা পেতেন। পত্রিকাটি

প্রকাশিত হয় কলকাতার ৪নং কড়েয়া গোরস্থান রোডের রেয়াজ উল ইসলাম প্রেস থেকে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়ঃ

> আঁধার রজনীতে মানুষের হাতে উজ্জ্বল আলোক যেমন সহায় সৃষ্টিকর্তা খোদাতাআলা, বুদ্ধিকে সেইরূপ একটি উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় আলোক দিয়াছেন, সেই আলোককে সাধু বাঙ্গলায় বিবেক এবং ইংরেজীতে Conscience কনশ্যেন্স কহে। সেই পদার্থকেই আরবী ভাষায় নূর-অল-ইমান বলে, যে নূর অর্থাৎ আলোকের সাহায্যে বুদ্ধি স্বয়ং কর্তব্য-অকর্তব্য, সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য, চিনিতে পারিয়া সৎপথে চলিতে পারে। সেই আলোককে নূর-অল-ইমান বলে। ..... বঙ্গদেশে মুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোষ মারাত্মক রোগ প্রবেশ করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্বকালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল? কোন কোন গুণের জন্য তাঁহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন নূর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন। ..... কি কি দোষ মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিল? কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবননষ্ট করিতে লাগিয়াছে তাহাও নূর-অল-ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, নূর-অল-ইমান তাহারও ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে। কোন গুণটি কি উপায়ে লাভ করা যায়? কোন বল বা সৌন্দর্য্য কি তদবিরে পাওয়া যায়, তাহাও নূর-অল-ইমান শিক্ষা দিবে।[১২]

নূর-অল-ইমান পত্রিকার সর্বমোট মাত্র ৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, এই পত্রিকায়ই মির্জা সাহেবের *সৌভাগ্য স্পর্শমণির* কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল।

রাজশাহীতে মুসলমানদের অপর সংগঠন আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর উদ্যোগে। তিনি ছিলেন এই সংগঠনেরও প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। একটি ছাপানো পুস্তিকায় এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়-

> আমরা অত্যন্ত আহলাদ সহকারে জানাইতেছি যে, গত ১১ই ও ১২ই পৌষ বৃহস্পতি ও শুক্রবার বোয়ালিয়া হেতাম খাঁ মসজিদে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় রামপুর বোয়ালিয়া শহরের এবং রাজশাহী মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার মফঃস্বলের বহুসংখ্যক সভ্য সমাগত হন। ..... এ সভার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ। (১) কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, (২) কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের (কওমের) লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে। (৩) কিসে ন্যায্য জীবিকার (হালাল রুজীর) পথ প্রশস্ত (কোসাদা) হইবে, (৪) কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় সাহায্য করা যাইবে, এই সকল, পরামর্শ করিয়া গভর্ণমেন্টের আইন সঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্য প্রচলন; ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য।[১৩]

নূর-অল-ইমান সমাজের মতো এই সংগঠনের দ্বারাও মুসলমান সমাজে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও শিক্ষা বিস্তারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গৃহিত হয়। যদিও তৎকালীন কোন কোন পত্রিকায় এই সংগঠনটিকে 'ধর্মীয় সভা' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[১৪] *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় লিখা হয়ঃ

> উত্তর বঙ্গের ধর্মবীর মৌলভী হাসেন আলী সাহেবের, উপদেশে উত্তেজিত হইয়া রাজশাহীতে হেমায়েতে এসলাম সভা স্থাপিত হইয়াছে; মালদহ জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ হেমায়েতে এসলামের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে সহায় হইতেছেন।[১৫]

এই সংগঠন ও অপর একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে চট্টগ্রামের মোসলমান শিক্ষা সভার সম্পাদক (ও মোতরজ্জম, জজকোর্ট) মৌলভী আবদুল আজিজ বি.এ. প্রণীত *আরব্য ও পারস্য মধুপাক* নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম একই সংগে বরিশালে এবং পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ডহারবার ও পুরুলিয়ায়ও তার কার্যক্রম শুরু করে।

নূর-অল-ইমান সমাজের মুখপত্র হিসাবে পূর্বোক্ত 'নূর-অল-ইমান' পত্রিকা প্রকাশিত হলেও ঐ পত্রিকায় আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলামের প্রচার কাজও যুগপৎ চলতে থাকে। এ সম্পর্কে পত্রিকা সম্পাদক মীর্জা ইউসফ আলী লিখেছেনঃ

> এ কাগজে হেমায়েতে এসলাম ও নূর-অল-ইমান নামক দুই ভাগ থাকিবে। ..... হেমায়েতে এসলাম অংশে মুসলমান কওমের কথা, এসলাম সমাজের কথা, এসলাম সমাজের সভা সমিতির কথা আলোচনা করা হইবে। আর নূর-অল-ইমান অংশে ইমানের সহিত সম্বন্ধ রাখে এমন বিষয়ের অর্থাৎ ধর্ম বিষয়ের আলোচনা হইবে।[১৬]

নূর-অল-ইমান সমাজের মতো আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলামেরও দায়িত্ব ছিল মুসলমান সমাজে ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও বিদ্যাচর্চার প্রসার ঘটানো। *নূর-অল-ইমান* পত্রিকার আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম অংশে লেখা হয়ঃ

> 'স্কুল কলেজের শিক্ষা। এই লাইনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বর্তমান সময়ে গভর্ণমেন্টের রাজদরবারে ও রাজশাহী দপ্তরে চাকুরী করিয়া আপনাদের উদারান্নের সংস্থান করিয়াছেন। ..... দেশ হিতকর এখন ইষ্ট নিষ্ট চিন্তা করেন। ..... শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিলে বর্তমান মোসলমান সমাজে আর সমস্ত পীড়া আপনা আপনি দূরে যাইবে। ইহা এই দলের লোকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাদের নিকট আমাদের অনেক আশা আছে।[১৭]

এই উদ্ধৃতিতে হেমায়েতে এসলাম সংগঠনে স্কুল কলেজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষারত পাঠ্যার্থীদের 'নব্যসমাজ' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তাদের ভবিষ্যতের আকাংক্ষার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম সমিতির শিক্ষা বিস্তার কাজে তৎকালীন

রাজশাহীর হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই অর্থ সাহায্য করেছিলেন বলে *নূর-অল-ইমান* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩১০ বঙ্গাব্দে (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঐ বছরের ২০ এবং ২১শে চৈত্র তারিখে রাজশাহী শহরের প্রাণকেন্দ্র রামপুর-বোয়ালিয়ায়। এই সভায় মির্জা সাহেব অনারারী সম্পাদক মনোনীত হন। মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী এই সমিতির সঙ্গে পরের বছর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলাম মিশন সমিতি' গঠিত হলে তার কার্যনির্বাহী কমিটিরও সভ্য মনোনীত হন। বোধকরি আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের চাইতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী বড় সংগঠনের সংগে সম্পৃক্ত হওয়াই মির্জা সাহেবের কাছে উপযুক্ত মনে হয়েছিল বলেই স্বীয় প্রতিষ্ঠান 'নূর-অল-ইমান' সমাজ এবং আঞ্জুমানে হেমায়েতে এসলাম এর কার্যক্রম এ কারণ সম্ভবত বন্ধ হয়ে যায়।

মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলীর আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন দুটির কার্যকাল হয়তো সুদীর্ঘ ছিল না। কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা বিস্তারে, জাতীয়তাবোধ ও ব্যক্তিচেতনা জাগরণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সংগঠন দুটি যে সব সমাজহিতৈষণামূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছিলো; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের বাঙালী মুসলমানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তা কিছুতেই বিস্মৃত হবার নয়।

তথ্য নির্দেশঃ

১। মোঃ ইসহাক আলী *মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী,* মেহের মঞ্জিল, রাজশাহী, ১৯৮৭, পৃঃ ২৯।

২। মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী, *সৌভাগ্য স্পর্শমণি* [মূলঃ ইমাম গাজ্জালীর *কিমিয়ায়ে সা'আদত* ১ম খন্ড, বিজ্ঞাপন অংশ দ্রষ্টব্য]

৩। প্রাগুক্ত, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

৪। *মিহির ও সুধাকর* ২৫ আশ্বিন ১৩০৮।

৫। *নূর-অল-ইমান,* ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৮।
উদ্ধৃতঃ মুস্তফা নূরউল ইসলাম- *সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,* ঢাকা ১৯০৭, পৃঃ ১১৬-১১৭।

৬। কাজী আবদুল মান্নান- *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* রাজশাহী, ১৯৬১ পৃঃ ১৪৪।

৭। মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী 'মির্জা ইউসফ স্মরণে' *পল্লীবান্ধব',* ২২শে আশ্বিন ১৩৬৩ [৮ই অক্টোবর, ১৯৫৬] পৃঃ ২।

৮। মির্জা মোহাম্মদ ইউসফ আলী, *দুগ্ধ সরোবর* ২য় সংস্করণ, রাজশাহী, ১৩২১ [১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

৯। মির্জা এম. এ. আজীজ-'সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন' *মাসিক মোহাম্মদী,* চৈত্র ১৩৪০। উদ্ধৃতঃ ওয়াকিল আহমদ- *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা,* ১ম খন্ড, ঢাকা ১৯৮৩, পৃঃ ১৮৩।

১০। *সৌভাগ্য স্পর্শমণি,* ১ম খন্ড, ১ম মুদ্রণের ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮।

১১। *সৌভাগ্য স্পর্শমণি,* ১ম খন্ড, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

১২। *নূর-অল-ইমান* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩০৭।
১৩। কাজী আবদুল মান্নান- *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* পৃঃ ২৬৬।
১৪। *ইসলাম প্রচারক,* আশ্বিন ১২৯৮।
১৫। *ইসলাম প্রচারক,* বৈশাখ ১২৯৯।
১৬। কাজী আবদুল মান্নান, পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৬৭
১৭। 'হেমায়েতে এসলাম', *নূর-অল-ইমান,*১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩০৭।
১৮। *নূর-অল-ইমান,* শ্রাবণ ১৩০৭।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরবাংলার জনস্বাস্থ্যঃ প্রাসঙ্গিক পর্যালোচনা

মোঃ মাহবুবর রহমান

ভূমিকা

"স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"– এটি একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ। কোন রাষ্ট্রের আর্থ–সামাজিক উন্নতির জন্য এর অধিবাসীদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন রোগের প্রকোপ বাড়ে। ফলে অনেক সময় মৃত্যুর হার জনমহারের চেয়ে বেশি হয়। আবার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে যারা বেঁচে থাকে তাদের কর্ম ক্ষমতা কমে যায়। কৃষি প্রধান সমাজে কৃষিতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং বলা যায় যে, জনসংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধিতে এবং কৃষি উৎপাদনে জনস্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে, কিংবা প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে একটি দেশের এলাকাভেদে, এমনকি একই জেলার বিভিন্ন থানায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং কোন দেশের জনস্বাস্থ্যের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে হলে এর প্রতিটি অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের আলাদা পর্যালোচনা হওয়া আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তরবাংলার জেলাসমূহের জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং তার আর্থ–সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করবো। আলোচনার সুবিধার্থে উত্তরবাংলা বলতে আমরা চাপাইনবাবগঞ্জ জেলা বাদে বর্তমান রাজশাহী বিভাগীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছি।

ব্রিটিশ বিবরণীতে উত্তরবাংলার জেলা সমূহের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত জেলা গেজেটিয়ার, সেটেলমেন্ট রিপোর্ট, বিভিন্ন স্বাস্থ্য রিপোর্ট, প্রভৃতিতে উত্তর বাংলার জেলা সমূহের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা ভয়াবহ। ১৯১১ সালে প্রকাশিত রংপুর জেলা গেজেটিয়ারে রংপুরকে 'যমপুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১] গেজেটিয়ার প্রণেতা ভাস উল্লেখ করেছেন, বর্ষাকালে রংপুরের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এতই খারাপ হতো যে, মুসলমান শাসনামলে রংপুরের কর্মকর্তাবৃন্দ প্রত্যেক বছর বর্ষাকালে মুর্শিদাবাদ চলে যেতেন।[২] ১৮৭৮ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছেঃ রংপুর সম্পর্কে এমন কোন বছরের কথা কেউ বলতে পারবেন না যে বছর এখানকার জনস্বাস্থ্য ভাল ছিল এবং মহামারী কম হয়েছিল।[৩] ১৮৭৪ সালে রংপুরের সিভিল সার্জন এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, 'রংপুরের শতকরা ৮০ ভাগ লোক রক্তশূন্যতায় ভুগছে। এখানকার মাত্র শতকরা ২০ ভাগ লোককে সুস্থ বলা যায়। তবে এই বিশভাগের অর্ধেক লোককে একজন ইউরোপীয় সুস্থ লোকের মত সুস্থ–সবল বলা যাবে না। সে অর্থে রংপুরের মাত্র শতকরা দশভাগ লোক সুস্থ ও সবল'।[৪]

দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে ১৯১২ সালে প্রণীত জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখ করা হয়েছে যে আবহমান কাল ধরে দিনাজপুরের স্বাস্থ্য পরিবেশ খুবই খারাপ। এই জেলার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ ছিল যে, জেলার বাইরে থেকে এখানে কেউ চাকরি করতে আসতে চাইতো না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ১৮৫০-এর দশকে এই জেলায় 'রেভিনিউ সার্ভে' পরিচালনার জন্য যখন বর্ধমানে অবস্থানরত সার্ভে টিমকে এখানে বদলি করা হয় তখন উক্ত টিমের অধিকাংশ সদস্য এখানে আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং অবশেষে চাকুরীতে ইস্তফা দেন।[৫] এই জেলায় চাকরি করতে এসে জীবন দেয়ার চেয়ে তা ছেড়ে দেয়াকেই তারা উত্তম মনে করেছেন। বাস্তবেও বহিরাগতদের স্বাস্থ্য এখানে টিকতো না। গেজেটিয়ার প্রণেতা উল্লেখ করেছেন যে, দিনাজপুর জেলায় 'রেভিনিউ সার্ভে' সমাপ্ত করতে ১৮৫৭-৫৮ ও ১৮৫৮-৫৯ সেশনে এখানে পর্যায়ক্রমে তেরটি সার্ভেটিম প্রেরণ করতে হয়। কারণ প্রতিটি টিমের সদস্যই এখানে আসার পর অসুস্থ হয়ে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হতেন।[৬] গেজেটিয়ার প্রণেতা আরো লিখেছেন যে, এখানকার জনগণের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় যে, তারা অসুস্থ।[৭]

রাজশাহী জেলাও ছিল অস্বাস্থ্যকর। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে এই জেলা জ্বর পীড়িত জেলাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল।[৮]

পাবনা ও বগুড়া জেলার যমুনা নদীর তীরাঞ্চল মোটামুটি স্বাস্থ্যকর ছিল। কিন্তু পাবনার সদর মহকুমা ও বগুড়া জেলার পাঁচবিবি, শিবগঞ্জ, বগুড়া ও শেরপুর থানা সমূহ ছিল অস্বাস্থ্যকর স্থান।

১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম ছিল দিনাজপুরে এবং সবচেয়ে বেশি ছিল পাবনা জেলায় (সারণী ১ দ্রষ্টব্য) কোন এলাকার লোক বসতির ঘনত্ব বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ হলো সে এলাকার ভাল স্বাস্থ্য পরিস্থিতি। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জনসংখ্যার বিচারে উত্তরবাংলার সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর জেলা ছিল দিনাজপুর।

সারণী-১ঃ১৯০১ সালে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার প্রতি বর্গমাইলে লোক সংখ্যার ঘনত্ব।

জেলার নাম	রাজশাহী	দিনাজপুর	রংপুর	বগুড়া	পাবনা	বাংলাদেশ
১৯০১ সালে প্রতি বর্গমাইলে ঘনত্ব	৫৬৪	৩৯৭	৬১৭	৬২৯	৭৭২	৫২১

উৎসঃ ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট; মোঃ মাহ্‌বুবর রহমান, '*উত্তরবঙ্গে লোকসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিঃ তুলনামূলক আলোচনা*', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, জুন ১৯৯৬ বিবরণী ৩ক - ৩ঙ।

জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে যেমন জেলা সমূহের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিস্থিতির তুলনা করা যায়, তেমনি একই জেলার অর্ন্তভূক্ত থানা সমূহের মধ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেন্সাস রিপোর্ট সমূহে বর্ণিত থানা ভিত্তিক জনসংখ্যা তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একই সেন্সাস দশকে একটি

জেলার কিছু থানায় লোকসংখ্যা বেড়েছে, আবার অন্য কিছু থানায় তা কমেছে। ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত সময়কালে উত্তরবাংলার ১০৪টি থানার মধ্যে ২৭টি থানায় লোকসংখ্যা কমেছে এবং ৭৭টি থানায় লোকসংখ্যা বেড়েছে। যে সকল থানায় লোক সংখ্যা কমেছে তার একটি তালিকা সারণী–২ এ উল্লেখিত হলো।

সারণী–২ঃ ১৮৭২–১৯৩১ সময়কালে উত্তর বাংলার ক্ষয়িষ্ণু থানা সমূহ এবং হ্রাসের শতকরা হার।

জেলার নাম	ক্ষয়িষ্ণু	হ্রাসের শতকরা হার ১৮৭২–১৯৩১
রাজশাহীঃ মোট থানা–২৫ হ্রাসপ্রাপ্ত–১৩ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত–১২	পবা, বোয়ালিয়া তানোর, মোহনপুর বাগমারা পুঠিয়া, দুর্গাপুর চারঘাট নাটোর, বাগাতিপাড়া লালপুর, বড়াইগ্রাম, গুরুদাসপুর	–২.৭ –৪.১ –৮.৪ –৪৮.৪ –৮.৫ –২৮.১ –৩৩.১
দিনাজপুরঃ মোট থানা–২০ হ্রাসপ্রাপ্ত–৮ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত–১২	বীরগঞ্জ, খানসামা, কাহারুল রাণী সংকৈল, হরিপুর ঠাকুরগাঁও, আটওয়ারী, বালিয়াডাংগা	–০.৩ –৪.৩ –০.৪
রংপুরঃ মোট থানা–৩০ হ্রাসপ্রাপ্ত–৪ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত–২৬	কালীগঞ্জ, হাতীবান্ধা ডিমলা, ডোমার	–১০.০ –২.০
বগুড়াঃ মোট থানা–১২ হ্রাসপ্রাপ্ত x বৃদ্ধিপ্রাপ্ত–১২	নেই	x
পাবনাঃ মোট থানা–১৭ হ্রাসপ্রাপ্ত–২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত–১৫	চাটমোহর, ফরিদপুর	–১.৬

উৎসঃ *সেন্সাস রিপোর্ট* সমূহ, ১৮৭২, ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ১৯১১, ১৯২১ এবং ১৯৩১; মোঃ মাহ্‌বুবর রহমান, 'উত্তরবংগে লোকসংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধি', *প্রাগুক্ত*, সারণী–৪, পৃ. ৬০।

সারণী অনুসারে ৬০ বৎসরে উত্তর বাংলার এক চতুর্থাংশ থানায় লোক সংখ্যা কমেছিল। দু'টি কারণে লোক সংখ্যা কমতে পারে। প্রথমত এমিগ্রেশন জনিত কারণে। অর্থাৎ কিছু লোক নিজ বাসস্থান ছেড়ে চিরস্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গেলে, ছেড়ে যাওয়া স্থানে লোক সংখ্যা কমে যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যদি জন্মহারের চেয়ে মৃত্যুহার বেশি হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে জানা যায় ক্ষয়িষ্ণু থানা সমূহে লোক সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ ছিল অধিক মৃত্যুহার। অপর দিকে যে ৭৫% থানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেগুলিতে বৃদ্ধির হার ততটা সন্তোষজনক ছিল না। সারণী–৩ এ ১৮৭২–১৯৩১ সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থানা সমূহে বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

সারণী–৩ঃ ১৮৭২–১৯৩১ সময়কালে উত্তর বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থানায় বৃদ্ধির হার।

বৃদ্ধির হার	থানার সংখ্যা	থানা %
১০% এর কম বৃদ্ধি	১৬	২০.৭৮
১১%–২৫% বৃদ্ধি	১৮	২৩.৩৮
২৬%–৪৯% বৃদ্ধি	১৮	২৩.৩৮
৫০% এর অধিক বৃদ্ধি	২৫	৩২.৪৬
মোট	৭৭	১০০.০০

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্টসমূহ ১৮৭২ থেকে ১৯৩১

সারণী অনুসারে বলা যায় বর্ধিষ্ণু থানা সমূহের শতকরা ২১ ভাগ থানায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ নামে মাত্র (১০% এর কম), এবং মাত্র ৩২ ভাগ থানায় বৃদ্ধির পরিমাণ ৫০% এর অধিক। যে সকল থানায় জনসংখ্যা ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশতেই এ বৃদ্ধি ছিল সাঁওতালদের ইমিগ্রেশন জনিত কারণে। অতএব, বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর বাংলায় জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু একথার অর্থ এই নয় যে, সে সময় সন্তান উৎপাদন কম হতো। সারণী ৪–এ ১৯১২ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত রাজশাহী জেলার মোট জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা দেখানো হয়েছে।[৯] এই সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২৪ বৎসরে এই জেলার মোট ১২,১৩,৫১৬ টি শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু এ সময় মোট মৃত্যুবরণ করেছে ১১,৯৮,৭১২ জন। অর্থাৎ ২৪ বৎসরে বৃদ্ধি মাত্র ১৪,৮০৪ জন (বৃদ্ধির হার ২৪ বৎসরে ১.১২%)। ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ বছর রাজশাহী জেলার জনসংখ্যা ছিল ১৩,৮৬,৫১৯ জন। ১৯১২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত যত শিশু জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের সকলেই জীবিত থাকলে জেলার লোকসংখ্যা ১৯৩১ সালে হতো ২৪,২৩,০৬৬ জন, অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ হতো প্রায় ৭৫%। কিন্তু বাস্তবে ১৯১২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ২০ বৎসরে বেড়েছে মাত্র ১৩,৪৬৭ জন (১.৩২%)। সারণী–৫ এ ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত দশ বৎসরে বাংলাদেশের জেলা সমূহের গড় জন্ম ও মৃত্যুর হার দেখানো হয়েছে।

সারণী–৪ঃ ১৯১২ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলায় জন্ম–মৃত্যুর সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার।

বৎসর	মোট জনসংখ্যা	প্রতি হাজারে জন্মসংখ্যা	মোট মৃত্যু সংখ্যা	প্রতিহাজারে মৃত্যু সংখ্যা	বৃদ্ধি বা হ্রাস ১৯১২–৩৫
১৯১২	৬১,৫৩৬	৪১.৫৬	৫৪,০২১	৩৬.৪৮	+৭,৫১৫
১৯১৩	৬০,৫২৯	৪০.৮৮	৪৭,৭৫১	৩২.৩১	+১২,৭৭৮
১৯১৪	৫৭,২৩১	৩৮.৬৪	৫৬,২৩৪	৩৭.৯৮	+৯৭৯
১৯১৫	৫১,০৯৯	৩৪.৫১	৫৫,৬২৭	৩৭.৫৯	–৪,৫২৮
১৯১৬	৫২,৪১৮	৩৫.৪০	৫২,৯৪৯	৩৬.৩২	–৫৩১
১৯১৭	৫৯,৫৪২	৪০.২১	৫১,৮৫৩	৩৫.২৯	+৭,৬৮৯
১৯১৮	৫৩,৩১৮	৩৬.০১	৫৯,৯৭৬	৪০.৫৩	–৬,৬৫৮
১৯১৯	৪৮,৫৩১	৩২.৭৯	৬১,৪৩১	৪১.৫১	–১২,৯০০
১৯২০	৫৬,৯৯৮	৩৮.৪৯	৫৭,০৬৬	৩৮.৫৬	–৬৮
১৯২১	৪৯,৪১৭	৩৩.৩৭	৬৩,২৪০	৪৩.১২	–১৩,৮২৩
১৯২২	৪৭,১৪৮	৩১.৬৪	৫৩,৯৩৩	৩৬.২০	–৬,৭৮৫
১৯২৩	৫২,০৯৪	৩৪.৯৭	৫২,৯৯৭	৩৫.৫৭	–৯০৩
১৯২৪	৪৮,৪৪৬	৩২.৫২	৫১,৪৬৬	৩৪.৫৪	–৩,০২০
১৯২৫	৫২,৮১৭	৩৫.৪৫	৫৫,৬৬৭	৩৭.৩৬	–২,৮৫০
১৯২৬	৪০,৮৩৮	২৭.৪১	৪৫,৯৩২	৩০.৮১	–৫,০৪৯
১৯২৭	৫০,৫৭১	৩৩.৯৪	৪৭,০৫৫	৩১.৫৯	+৩,৫০৬
১৯২৮	৪৭,১৬৪	৩১.৬৬	৪০,৪০১	৩৩.১৬	–২,২৩৭
১৯২৯	৪৭,২১৯	৩১.৬৯	৩৯,৩১৭	৩৩.১০	–২,০৯৮
১৯৩০	৩৯,৬২৩	২৬.৫৯	৪৫,৭০৮	৩০.৬৮	–৭,১২৫
১৯৩১	৪৬,৫৪১	৩২.৫৬	৪৩,৯২৩	৩০.৭৩	+২,৬১৮
১৯৩২	৪১,৯৬৪	২৯.৩৬	৪০,০৯৭	২৮.০৫	+১,৮৬৭
১৯৩৩	৫১,১২৩	৩৫.৭৭	৪৪,৫৫৬	৩১.১৭	+৬,৫৬৭
১৯৩৪	৪৫,২৪০	৩১.৬৫	৩৯,৭৯০	২৭.৮৪	+৫,৪৫০
১৯৩৫	৫২,১০৯	৩৬.৪৫	৩৭,৭২২	২৬.৩৯	+১৪,৩৮৭
মোট	১২,১৩,৫১৬		১১,৯৮,৭১২		+১৪,৮০৪

উৎসঃ S.N. Mitra, *Rural Public Health Circles Inspection Reports for the Rajshahi District for the year 1934-35* (Alipore: Bengal Government Press, 1936), P. 7.

সারণীঃ৫–এ লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত সময় রাজশাহী ও দিনাজপুর জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয় দিকই বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। উভয়ক্ষেত্রে রংপুরের অবস্থান ছিল

পঞ্চম। জন্মহারে পাবনা সপ্তম, মৃতুহারে ৬ষ্ঠ। বগুড়ায় জন্মহার ছিল সবচেয়ে কম। মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে এই জেলার অবস্থান দশম। সারণী-৫ এ একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হচ্ছে মৃত্যুহারের সঙ্গে জন্মহারের সম্পর্ক। মৃত্যুহার বেশি হলে জন্মহারও বাড়ে কিংবা বাড়ানো হয়-এটাই বোধ হয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সারণী থেকে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হলো যে, ১৯৩০-এর দশকে দিনাজপুর, রাজশাহী ও রংপুর জেলাসমূহ তৎকালীন বাংলাদেশের অন্যতম অস্বাস্থ্যকর জেলা ছিল।

সারণী-৫ঃ ১৯৩০-৩৯[৯] দশ বৎসরে প্রতি হাজারে গড় জন্ম ও মৃত্যু হারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের জেলা সমূহের অবস্থান।

প্রতি হাজারে জন্মহার			প্রতি হাজারে মৃত্যুহার		
জেলার নাম	অবস্থান	হার	জেলার নাম	অবস্থান	হার
দিনাজপুর	১	৩৭.৭	রাজশাহী	১	৩১.০
রাজশাহী	২	৩৪.৩	দিনাজপুর	২	৩০.৫
নোয়াখালী	৩	৩৩.৪	ফরিদপুর	৩	২৬.২
ফরিদপুর	৪	৩২.২	যশোহর	৪	২৬.২
রংপুর	৫	৩০.৪	রংপুর	৫	২৫.৯
ঢাকা	৬	২৯.৯	পাবনা	৬	২৫.৭
পাবনা	৭	২৮.৯	চট্রগ্রাম	৭	২২.৬
ময়মনসিংহ	৮	২৮.৪	ঢাকা	৮	২২.১
চট্রগ্রাম	৯	২৮.৪	নোয়াখালী	৯	২১.৮
খুলনা	১০	২৬.৯	বগুড়া	১০	২০.৯
বাখেরগঞ্জ	১১	২৬.৮	খুলনা	১১	২০.৪
যশোহর	১২	২৫.৭	ময়মনসিংহ	১২	২০.২
বগুড়া	১৩	২৪.৫	বাখেরগঞ্জ	১৩	২০.১

উৎসঃ Government of Bengal (Public Health Department), *Bengal Public Health Report for the year 1939* (Alipore: Bengal Government Press, 1941) PP. 11,19.

রোগের বিবরণঃ যে সকল রোগে এত বেশি সংখ্যক লোক মৃত্যুবরন করতো সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, যক্ষা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি। সারণী-৬ এ উত্তরবাংলার জেলা সমূহে ১৯২৯-৩৮ পর্যন্ত দশ বৎসরে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর হার দেখানো হয়েছে। সারণীতে লক্ষ্যণীয় যে এর মধ্যে কেবল জ্বরজনিত রোগেই তিন-চতুর্থাংশ মৃত্যু ঘটেছে। জ্বরের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছিল মুখ্য।[১০] সারণী-৭ এ দেখা যায় যে, বিভিন্ন রোগে মোট মৃত্যুব্যক্তির প্রায় এক-

চতুর্থাংশই ছিল এক বৎসরের নীচের বয়সের শিশু। উক্ত সারণীতে আরো লক্ষ্যণীয় যে, পাঁচ বৎসরের নীচের বয়সের বালকদের মৃত্যুর হার ছিল মোট মৃত্যুর শতকরা ৩৭ ভাগ। এ প্রসঙ্গে ১৩২১ বাংলা সনের প্রতিভা পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিলঃ[১১]

> দুগ্ধপোষ্য শিশুর মৃত্যুর হার অত্যাধিক। প্রত্যেক চারটি শিশুর মধ্যে ১টি এক বৎসরের মধ্যেই মারা যায়। শিশু মৃত্যুর হার বিগত ত্রিশ বৎসর একইভাবে চলিয়াছে। পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দি, কাশি এবং আতুর ঘরের কুবন্দোবস্ত প্রভৃতি শিশু মৃত্যুর কারণ। তন্মধ্যে পেটের অসুখ কিংবা দুধহারা রোগই সর্ব প্রধান। পৈত্রিক ও মাতৃক দুর্বলতা হেতুও কতক শিশু মারা যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের উত্তর বাংলার মৃত্যুহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১ থেকে ১৫ এবং ৩১ থেকে উর্ধ্বের বয়সের নারী পুরুষের মধ্যে পুরুষের মৃত্যুহার নারীদের চেয়ে বেশি ছিল। পক্ষান্তরে ১৫ থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের নারী-পুরুষের মধ্যে নারীদের মৃত্যুর হার ছিল পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি (সারণী-৮)

সারণী-৬ঃ ১৯২৯-৩৮ সময়কালে বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর হার।

জেলার নাম	প্রতি হাজারে বিভিন্ন রোগে গড় মৃত্যুর হার ১৯২৯-৩৮						জ্বরে মৃত্যুর শতকরা হার	
	কলেরা	বসন্ত	জ্বর	আমাশয়	শ্বাসকষ্ট	অন্যান্য	মোট	
রাজশাহী	০.৭	০.২	২৪.৭	০.৩	০.৭	৪.৪	৩১.০	৭৯.৭
দিনাজপুর	০.২	০.৩	২২.৭	০.৬	২.০	৪.৭	৩০.৫	৭৪.৪
রংপুর	০.৫	০.৩	২১.০	০.৭	১.২	২.২	২৫.৯	৮১.১
বগুড়া	০.৫	০.১	১৬.০	০.৬	১.০	২.৭	২০.৯	৭৬.৬
পাবনা	১.৮	০.৪	১৮.৬	০.৫	১.০	৩.৪	২৫.৭	৭২.৪

উৎসঃ Govt. of Bengal (Public Health Department) *Bengal Public Health Report for the year 1939* (Alipore: Bengal Government Press, 1941), PP. 39, 50, 59, 87 and 89.

সারণী-৭ঃ উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলার বয়সভেদে মৃত্যুর সংখ্যা, ১৯৩৯।

৫টি জেলা মোট	১ বৎঃ নীচে	১ থেকে ৫ এর নীচে	৫ থেকে ১০ এর নীচে	১০ থেকে ১৫ এর নীচে	১৫ থেকে ২০ এর নীচে	২০ থেকে ৩০ এর নীচে	৩০ থেকে ৪০ এর নীচে	৪০ থেকে ৫০ এর নীচে	৫০ থেকে ৬০ এর নীচে	৬০ এর উর্দ্ধে	মোট
মোট মৃত্যু সংখ্যা	৪৬,২৮৭	২৪,৯৪১	১৫,০৯৩	৭,৩৩২	৯,৩৫৩	২২,২৮২	১৯,৩৬৯	১৬,৫০৪	১৪,০৯২	১৮,৯৮০	১৯৪২৩৩
মৃত্যুর হার	২৩.৮৩	১২.৮৪	৭.৭৭	৩.৭৭	৪.৮২	১১.৪৭	৯.৯৭	৮.৫০	৭.২৬	৯.৭৭	১০০

উৎসঃ A. C. Chatterji (ed.), *Bengal Public Health Report for the year 1939* (Alipore: Bengal Government Press, 1941), P. 192

সারণী–৮ঃ উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলায় ১৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সের পুরুষ ও নারীর মৃত্যুর হার, ১৯৩৯

পাঁচটি জেলায় মোট	১৫ এর নীচে পর্যন্ত		১৫থেকে ৩০ এর নীচে পর্যন্ত		৩০ থেকে উর্ধে		সকল বয়স		
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	মোট
মোট মৃত্যু সংখ্যা	৫১০৯৬	৪২৫৫৭	১৩০৫৩	১৮৫৮২	৩৮৫৯৮	৩০৩৪৭	১০২৭৪৭	৯১৪৮৬	১৯৪২৩৩
মৃত্যুর হার	২৬.৩	২১.৯	৬.৭	৯.৬	১৯.৯	১৫.৬	৫২.৯	৪৭.১	

উৎসঃ A.C. Chatterji (ed.), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ১৯২–১৯৫।

এর কারণ এই যে, ১৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বয়স হচ্ছে বাঙালী নারীগণের মাতৃত্বের কাল। এই বয়সের অনেক নারী সন্তান প্রসবের সময় কিংবা তার পর মৃত্যুবরণ করায় এই বয়সের নারীদের মৃত্যুর হার বেশি ছিল। গ্রাম–বাংলায় অল্প বয়স্ক বালক বালিকার বিবাহ দেয়ার প্রবণতা বেশি। বাল্য বিবাহের কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অল্প বয়স্কা প্রসূতির দুর্বল শিশুরা মারা যেত। অনেক সময় অল্প বয়স্কা প্রসূতিরাও অকালে প্রাণ হারাতো। বিশেষ করে হিন্দু রমনীর প্রসূতি সংক্রান্ত প্রচলিত নানান কুসংস্কার প্রসূতির স্বাস্থ্য হানি কিংবা মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। এতদসংক্রান্ত একটি রিপোর্টের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হলোঃ[১২]

> As soon as the labour pain commences they are dragged to the most ill-ventilated and the worst room in the house, where a blazing fire is burning and a Chatai (Plank) for a pillow. The placenta which is discharged during the birth of a child is kept deposited in the room for five days after which period it is removed. In this state they have to pass 21 days, during which period no member of the family can touch them... and during which time they are left entirely to the care of a low cast Haree woman, whose idea of cleanliness is still worse. This practice is in itself sufficient to kill any human being, for more when it is used on a female whose health has already been broken by repeated attacks of fever.

উত্তরবাংলার স্বাস্থ্যহীনতার কারণঃ

প্রকৃতিগতভাবেই উত্তরবাংলার অনেক এলাকা ছিল অস্বাস্থ্যকর। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কারণে অনেক এলাকা অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে ওমেলী উল্লেখ করেছেনঃ[১৩]

> প্রাকৃতিক অবস্থান জেলার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে জেলার অস্বাস্থ্যকর থানাগুলির সবই ছিল দক্ষিণ অঞ্চলে... গঙ্গা নদীর পানি পর্যাপ্ত পরিমাণ না পাওয়া এবং পলিমাটি পড়ে বড়াল নদীর মুখ ভরাট হয়ে যাওয়াই ছিল এ থানাগুলির অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রধান কারণ। মুসাখান ও নন্দকুজা নদী দিয়ে প্লাবনের জল উত্তর মুখে প্রবাহিত হত বলে জেলার দক্ষিণাঞ্চলে রীতিমত জল নিস্কাশন হত না। ফলে এসব এলাকার বিলগুলিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো। এসকল অগভীর বিলের সংখ্যাও ছিল অনেক। এসব কারণেই এ এলাকায় জ্বরের প্রকোপ দেখা দিত।

তবে মহামারী আকারে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির আর্বিভাব হওয়ার পিছনে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে মানুষের জীবনরীতি, স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের অজ্ঞানতা, অসচেতনতা ও নানান কুসংস্কার দায়ী ছিল। উত্তর বাংলার গ্রামসমূহের বাড়ীঘরগুলির পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর। গ্রামের বাসস্থানের চর্তুদিকে বাঁশ ঝাড় ও ঘন গাছপালার কারণে বাড়ীতে রোদ প্রবেশ করতে পারত না, তাছাড়া প্রতিটি বাড়ীর আশেপাশে থাকত নিম্ন জলাভূমি। এসব কারণে বাড়ীর চর্তুদিকস্থ জায়গা সব সময় স্যাঁতস্যাঁতে থাকত ও মশা উৎপাদনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করতো।[১৪]

গ্রামগুলিতে পানি সরবরাহের অবস্থা ছিল শোচনীয়। গ্রীষ্মকালে এখানকার খাল-বিল শুকিয়ে যেত অথবা পানির গভীরতা খুব হ্রাস পেত। বেপরোয়াভাবে কাপড়কাঁচা, গোসল করা, বাসন-কোসন পরিস্কার করা, গরু-বাছুরের গা ধোয়ানো ইত্যাদি কাজের দরুন সেই অগভীর পানি সহজেই দুষিত হয়ে পড়ত। গ্রামবাসীদের যত্রতত্র মলমুত্র ত্যাগ এবং রাত্রিকালে মশারী ছাড়া শয়ন করা প্রভৃতি কারণে জনস্বাস্থ্যের অবস্থার চরম অবনতি হয়েছিল।

গ্রাম বাংলার কৃষকের কাজের পরিবেশ ও পদ্ধতি তাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলত। এ প্রসঙ্গে বগুড়া জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখিত হয়েছে যে,[১৫]

> মোট লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ লোক ধান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এই জীবিকা অর্জনের জন্য আবহাওয়ার সবরকম প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে তাদের বাইরে কাজ করতে হত। বর্ষাকালে ধানের চারা রোপণের মৌসুমে চাষীকে সমস্ত দিন মাঠের হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে চারাগাছ রোপণ করতে হত। শীতকালের উপযোগী গরম কাপড় গায়ে দেওয়ার সামর্থ তাদের ছিল না। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে নিকৃষ্টমানের চাল, বিশেষ করে শরৎকালের অস্বাস্থ্যকর সময়ে নতুন মোটা চালের ভাত তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। (এই ভাত খাওয়ায়) ভাদ্র থেকে

কার্তিক এই কয়েক মাস উদরাময় রোগের প্রাদুর্ভাব অতি নিয়মিত ঘটনা ছিল। আমাশয় কখন কখন খুব মারাত্মকভাবে দেখা দিত।

কলেরা রোগের কারণ সম্পর্কে হান্টার লিখেছেন যে বড় বড় শহর ও গ্রামের বহু ধর্মীয় মেলা অনুষ্ঠিত হতো। এসকল মেলায় হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটতো। তারা পরিবেশকে নোংরা করে তুলত। এ সকল মেলা কলেরা–বসন্তের উৎসস্থল ছিল।

অপরিকল্পিতভাবে রেলপথ এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মান করার ফলে দেশের অনেক এলাকায় পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, ফলে সেসব এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। এই জলাবদ্ধতা মশার উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ে।

ব্যাপক আকারে পাট চাষ শুরু হলেও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। পাট পচানোর ফলে পানি দুষিত হয়। পচা পানিতে মশার বংশ বিস্তার ঘটে।

অসাধু ব্যবসায়ীদের খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতার ফলেও অনেক রোগের সৃষ্টি হতো। ১৯৩৪ সালে রাজশাহীতে বিভিন্ন খাদ্যের ভেজাল পরীক্ষা করে নিম্নরূপ ফল পাওয়া যায়ঃ[১৬]

খাদ্যদ্রব্যের নাম	স্যাম্পল সংখ্যা	ভেজাল সংখ্যা	ভেজালের %
সরিষার তেল	৫২৪	২৯৯	৫৭.১
ঘি	২৩	৯	৩৯.১
দুধ	১৯	১০	৫২.৬
ময়দা	৩৭	–	–
দই	১৪	৭	৫০.০০

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিবারণঃ (লোকবিশ্বাস এবং সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়টি ছিল একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়–রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন দায়–দায়িত্ব পালন করা হতো না। তখন অসুস্থ হলে পীর–মাওলানা–ঠাকুর–সন্নাসীর নিকট ঝাড়ফুক নেয়া হতো। মুসলমানরা রোজা–নামায, দোয়া–দরুদ করতেন, হিন্দুরা পূজা পার্বন, পশুবলী প্রভৃতি ব্রত পালন করতেন। তখন হিন্দু–মুসলমান নির্বিশেষে নানা রকম তাবিজ নিত। বিভিন্ন ধরনের সংস্কার মেনে চলা হতো। মেডিকেল চিকিৎসা বলতে তখন 'আয়ূর্ব্বেদ' চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে 'আয়ূর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে'র জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ৫০০০ বৎসর পূর্বে বৈদিক যুগে। মুসলমান শাসনামলে ত্রয়োদশ শতকে এখানে 'ইউনানী' পদ্ধতির ঔষধ চালু হয়। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু হয় ঊনবিংশ শতকে।

ধর্মীয় ও লোক বিশ্বাসঃ

সুষ্ঠু চিকিৎসা পদ্ধতি চালু না থাকায় এবং সরকারী উদ্যোগে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা না থাকায় মানুষ বিভিন্ন ধর্মীয় বিধান ও অনেক লোক বিশ্বাস মেনে চলতো। এ সকল ধর্মীয় বিধান ও লোক বিশ্বাস সামাজিক প্রথা হিসেবেই পালিত হতো। সমাজে ছোটরা বড়দের কাছ থেকে এই প্রথাগুলো শিখত এবং দৈনন্দিন জীবনে তা মেনে চলত। উক্ত ধর্মীয় বিধান ও লোক বিশ্বাসের কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়া হলো।

ধর্মীয় বিধানঃ

(ক) হিন্দু ধর্মীয়ঃ মনু প্রচারিত হিন্দু শাস্ত্রবিধি[১৭]

– পানিয় জলের পবিত্রতা রক্ষার্থে নির্দেশ করা হয়েছে যে, 'মল, মূত্র, থুথু, রক্ত, কিংবা অন্যকোন দুষিত পদার্থ পানিতে ফেলা নিষেধ।'[১৭ক]

– খাদ্যদ্রব্য ভোজন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, 'অতিরিক্তভোজন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর'।[১৭খ]

– 'রসুন ও পিঁয়াজ ভক্ষণ থেকে বিরত হও'।[১৭গ]

– 'বদ,–হজম অবস্থায় কোন কিছু ভক্ষণ ঠিক নয়'।[১৭ঘ]

– গোসল করা সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে যে, 'আহারের পরপরই, কিংবা অসুস্থ অবস্থায়, কিংবা মধ্যরাতে এবং অতিরিক্ত পোশাক পরিধান অবস্থায় স্নান করা ঠিক নয়।'[১৭ঙ]

(খ) ইসলাম ধর্মে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে অনেক নির্দেশ উপদেশ আছে। তন্মধ্যে এখানে কিছু উল্লেখিত হলোঃ[১৮]

> পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক", "শুভ্র বস্ত্র পরিধান কর", "কাঁচা রসুন–পিয়াঁজ ভক্ষণ করে মসজিদে আসা ঠিক নয়", "অল্প আহার পূণ্যজনক", "কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে," "অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যজনক," "প্রতি সপ্তাহে নখ কাটা উত্তম", "চোখকে সুরমা দ্বারা সুশোভিত কর, কারণ তা দৃষ্টি শক্তি উজ্জ্বল করে", "দন্তমাজন মৃত্যুব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক", "বাঘ ও ভালুকের কাছ থেকে যেমন দূরে থাকার চেষ্টা কর; তেমনি কুষ্ঠ রোগীর কাছ থেকে দূরে সরে থেকো", "কালিজিরা একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত সর্ব রোগেই অব্যর্থ মহৌষধ ... ইত্যাদি।

(গ) লোক বিশ্বাসঃ[১৯] রোগের উৎপত্তি এবং রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অনেক লোক বিশ্বাস আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনো আছে। জেলাভিত্তিক এই লোক বিশ্বাসগুলির কিছু এখানে উল্লেখিত হলোঃ

রোগের কারণ বিষয়ে

–'ফু দিয়া বাতি নিবালি অসুখ হয়' (পাবনা)

–'দুধ চুরি করি খাইলে তার সারা গায়ে ধলা কুষ্ঠ হয়' (রংপুর)

-'ঘরের চৌকাঠের উপর কিউ বসিলে তার গুটির ব্যারাম হয়' (রাজশাহী)
-'ভাতের চাউল খাইলে গায় আঁচল হয়' (রাজশাহী)
-'চৈইত মাসে বাগুন খাইলে পচারী হয়' (রাজশাহী)
-'আইতোত আয়না দেইকলে চউকের জুতি কমি যায়'(রংপুর)
-'শিশুদের আয়না দেখাইলে দাঁত বাঁকা হয়' (পাবনা)
-'মুড়ি খাইয়া পানি খাইলে প্যাট নষ্ট হয়' (পাবনা)
-'উক্কা তামুক বেশি খাইলে যক্ষা ব্যারাম হয়' (পাবনা) ইত্যাদি

লোক চিকিৎসা বিষয়ে-

-'কচি ডালিমের অস খাইলে আমাশা ব্যারাম ভাল হয়'(পাবনা)
-'জাউন দিয়া পান খাইলে তার হজম শক্তি বাড়ে' (পাবনা)
-'চামের জুতা শুঁগলে মিরকি ব্যারাম ভাল হয়' (রংপুর)
-'মাটির থালিত ভাত খালি শরীল ভাল থাকে'-(পাবনা)
-'সব সময় পূর্ব দিকে দাঁড়িয়ে গোসল করলি তার সর্দ্দি অয়না' (পাবনা) ইত্যাদি।

সরকারী প্রয়াসঃ[২০]

পাশ্চাত্যে যদিও জনস্বাস্থ্য আন্দোলন শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির দিকে, কিন্তু বাংলায় সরকারীভাবে জনস্বাস্থ্য বিভাগ প্রবর্তিত হয় প্রায় ৭৫ বছর পর ১৯২৭ সালে। উক্ত সময় পর্যন্ত বাংলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক দায়িত্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের মধ্যে বিভক্ত ছিল। যেমন রেল বিভাগে কর্মরত কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সেবার দায়িত্ব ছিল রেলওয়ে কোম্পানীর। গ্রামের লোকদের স্বাস্থ্য তদারকির দায়িত্ব ছিল জেলা বোর্ডের । প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, জনস্বাস্থ্য বিষয়টি প্রায় ১১টি ভিন্ন কর্তৃপক্ষের উপর অর্পন করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষসমূহ ছিলঃ (১) বিভাগীয় কমিশনার (২) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (৩) সিভিল সার্জন (৪) ফ্যাক্টরী ইন্সপেক্টর (৫) ড্রেনেজ কমিশনার (৬) ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ (৭) রেলওয়ে কোম্পানী (৮) পৌরসভা (৯) জেলা বোর্ড (১০) ইউনিয়ন কমিটি (১১) ইউনিয়ন বোর্ড। এসকল কর্তৃপক্ষকে মূলতঃ স্যানিটেশন বিষয়ে নজর রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। বিভিন্ন এ্যাক্ট-এ কেবল দায়িত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছিল। যে সকল এ্যাক্ট-এ স্যানিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছিল সেগুলি হলোঃ The calcutta Municipal Act, The Bengal Municipal Act (1884) The Bengal Local Self Government Act (1885), The Bengal Village self-Government Act(1919), The Calcutta Ports Act, The Epidemic Diseases Act (1897), The

Bengal Agricultural and Sanitary Improvement Act (1920), The Bengal Vaccination Act (1880) and the Bengal Registration of Births and Deaths Act (1873) প্রভৃতি। এসকল আইনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কেবল দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, ঐ দায়িত্ব পালনে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না; সার্বিক কর্তৃত্বও কোন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়নি। যেমন ১৮৮৫ সালের স্বায়ত্বশাসন আইনে জেলা বোর্ডের স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে বলা হয়েছিলঃ to provide so far as may be possible for the proper sanitation of its district' কিন্তু জেলা বোর্ডকে sanitary authority করা হয়নি। ফলে জেলা বোর্ড পল্লী এলাকায় কয়েকটি ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা করেই তার দায়িত্ব পালন করতো। এই ডিসপেনসারী সমূহের মাধ্যমে কেবল রোগের চিকিৎসা করা হতো, রোগ প্রতিরোধের কোন উদ্যোগ কিংবা ব্যবস্থা জেলা বোর্ড কর্তৃপক্ষের ছিল না। অনুরূপভাবে সিভিল সার্জন ছিলেন জেলার স্বাস্থ্য প্রশাসনের প্রধান। জেলার ডিসপেনসারী সমূহ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। তিনি ছিলেন সরকারী কর্মচারী, তার উপর জেলা বোর্ডের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। Local Self-Government Act –এও সিভিল সার্জনকে স্যানিটেশন বিষয়ে কোন দায়িত্ব দেয়া হয়নি। ফলে সিভিল সার্জন ও জেলা বোর্ডের মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত জনস্বাস্থ্য বিষয়ে এই অরাজকতা চলতেই থাকে। ১৯১৯ সালে তৎকালীন বাংলার স্যানিটারী কমিশনার – ডাঃ সি. এ. বেন্টলী– সরকারের নিকট এই মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে, একটি সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য প্রশাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সরকারের উচিত একটি Public Health Act পাশ করানো। তিনি রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলে যুক্তি দেন। ডাঃ বেন্টলী যখন বাংলার সরকারের সঙ্গে লেখালেখি করছিলেন সে সময় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে সি. আর. দাস বাংলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলার জোরদাবী পেশ করেন। তিনি এ বিষয়ে আইন পাশের লক্ষ্যে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। তার এই খসড়া রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন স্বাস্থ্য পরিচালক Public Health Organisation বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯২৭ সালে বাংলার Public Health Organisation প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা বোর্ডকে 'কনট্রোলিং অথোরিটি' করা হয়। জেলা বোর্ডের অধীনে প্রতি থানায় একটি করে হেলথ সার্কেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য জেলা বোর্ডে একটি জেলা স্বাস্থ্য অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। তার অধীনে নিম্নলিখিত পদ সৃষ্টি করা হয়ঃ

মহকুমা হেলথ অফিসার

স্যানিটারী অফিসার

স্যানিটারী ইন্সপেক্টর

স্যানিটারী সহকারী

ক্যারিয়ার কর্মচারী

এইভাবে ১৯২৭ সাল থেকে বাংলায় সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্য সংগঠন গড়ে উঠে।

চিকিৎসা সংগঠনঃ ১৯২৭ পর্যন্তঃ

যদিও জনস্বাস্থ্য সংস্থা (Public Health Organisation) গঠিত হয় ১৯২৭ সালে, কিন্তু তার পূর্বেও পল্লী ও শহর এলাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর পরিচালিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম চালু ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন জেলায় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ জেলার জমিদার ও ধনী জোতদারদের আর্থিক সহায়তায় ও উদ্যোগে এ সকল দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে এ সকল দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার ভার ও নতুন নতুন দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের উপর অর্পিত হয়। তবে জোতদার-জমিদারদের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ অব্যাহত থাকে। কিছু চিকিৎসালয় পুরোপুরি জমিদারদের আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত হতে থাকে। সরকার কোন কোন চিকিৎসালয়ে ইউরোপীয় ঔষধ, বিভিন্ন সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট প্রভৃতি সরবরাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উত্তরবাংলার জেলা সমূহে যে সকল চিকিৎসালয় ছিল তার একটি তালিকা সারণী – ৯ এ দেয়া হলো। সারণীতে লক্ষণীয় যে ১৮৭২ থেকে ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এই প্রায় ত্রিশ বৎসরে চিকিৎসালয়ের সংখ্যা চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলা বোর্ডসমূহের প্রচেষ্টার কারণেই এই বৃদ্ধি ঘটেছে।

সারণী– ৯ ঃ ১৮৭২ ও ১৯০৩ সাল উত্তর বাংলার বিভিন্ন জেলায় ডিসপেনসারীর সংখ্যা।[২১]

জেলার নাম	দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা	
	১৮৭২	১৯০৩
রাজশাহী	৫	১৭
দিনাজপুর	২	৯
রংপুর	৬	২৫
বগুড়া	৩	৯
পাবনা	৩	১২
মোট	১৯	৭২

এই দাতব্য চিকিৎসালয়গুলি ছিল অনাবাসিক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই হাসপাতালগুলির লক্ষ্য ছিল রোগের প্রতিকার করা, প্রতিরোধ নয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রোগ প্রতিরোধের উদ্যোগ

নেয়া হয়। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে কুইনাইন ও টিকাদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে কুইনাইন জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে পোষ্ট মাষ্টার ও স্কুল শিক্ষকগণকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পোষ্ট মাষ্টারগণের সহযোগিতা পাওয়া গেলেও স্কুল শিক্ষকদের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে টিকাদান কর্মসূচী চালু করা হয়। টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব সিভিল সার্জনের উপর ন্যাস্ত ছিল। ১৯০৭–০৮ সালে এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রতি জেলায় সিভিল সার্জনের অধীনে একজন পরিদর্শক, একজন উপ–পরিদর্শক এবং বিভিন্ন সংখ্যক লাইসেন্সপ্রাপ্ত টিকাদার সমন্বয়ে একটি সংস্থা গঠিত হয়। গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে টিকাদার নিয়োগ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে লাইসেন্স দেয়া হয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিনা পয়সায় টিকা দেয়া হতো। কিন্তু বাড়িতে যেয়ে টিকা দান করলে প্রতি টিকার জন্য টিকাদার ২৫ পয়সা ফি পেতেন। লাইসেন্স প্রাপ্ত টিকাদারগণ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে টিকা দিতেন এবং এজন্য প্রতি টিকার জন্য ১২ পয়সা করে পেতেন। ১৯০৭–০৮ সালে বগুড়ায় 'টিকা থেকে উপকৃত জনসংখ্যার অনুপাত ছিল ৩৬ঃ২৬।' 'সে বছর ২৫,৯২৯টি টিকা সফল হয়েছিল এবং প্রতি টিকায় খরচ পড়েছিল .০৮ পয়সা মাত্র।[২২]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রামাঞ্চলে পেশাদার ডাক্তারের উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে উল্লেখিত হয়েছেঃ[২৩]

> 'নাটোর মহকুমার লালোর, গোবিন্দপুর, ছাতিন, আড়ানি, মালঞ্চী প্রভৃতি বড় বড় গ্রামে বহু হাতুড়ে চিকিৎসক, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ ডাক্তার এবং পাশ করা এলোপ্যাথি ডাক্তার ছিল। যে সব গ্রামে একাধিক ডাক্তার ছিল, সে সব জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিত। এসব চিকিৎসকদের দর্শনী ছিল খুব সামান্য। রোগী কর্তৃক ডাক্তারকে দেহ দর্শনীর হার ছিল নিম্নরূপঃ
>
> (১) ডাক্তারের নিজ গ্রাম কোন দর্শনী লাগতো না;
>
> (২) পাশের গ্রামে দর্শনী ছিল ১.০০ টাকা;
>
> (৩) ৩/৪ মাইল দূরের গ্রামের দর্শনী ছিল ২.০০ টাকা।

১৯১৯ সালে পাশকৃত "The Bengal Village Self-Government Act, 1919" এর মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেয়া হয়। ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূর করা, মশা–মাছির উৎসস্থল পরিস্কার করা, ইউনিয়নের অন্তর্গত হাট–

বাজার ও মেলার সুষ্ঠু স্বাস্থ্যগত পরিবেশ বজায় রাখা, পাণীয় জলের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কাঁচা ও পাকা কুয়া খনন করা, কিংবা পুরাতনগুলি মেরামত করা এবং নদ নদী ও পুকুরের পানি যাতে দুষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা–ইত্যাদি দায়িত্ব ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে অর্পিত হয়। প্রয়োজনে ইউনিয়নে বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠা করতে পারত। এই আইন পাশের পর বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড নিজস্ব উদ্যোগে অথবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সহায়তায় বিভিন্ন গ্রামে কাঁচা–পাকা কুয়া নির্মাণ করতে থাকে।

জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের আগ্রহ ও উৎসাহ থাকলেও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের পক্ষে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

চিকিৎসা কার্যক্রমঃ ১৯২৭ এর পর

১৯২৭ সালে 'জনস্বাস্থ্য সংস্থা (Public Health Organisation) গঠিত হওয়ার পর স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছুটা সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এখন থেকে রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছিল তার এলাকায় কোন মহামারী দেখা দিলে তা তৎক্ষণাৎ থানার জনস্বাস্থ্য সার্কেল অফিসে অবহিত করা। কোন এলাকা থেকে মহামারীর খবর পেলে জনস্বাস্থ্য বিভাগ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করতো। অবস্থার মোকাবিলার জন্য সাময়িক ভিত্তিতে গ্রাম্য ডাক্তার নিয়োগ করা হতো। বসন্ত নিরোধের জন্যও প্রতি ইউনিয়নে ৫/৬টি করে টিকাদান কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ম্যালিরিয়া প্রতিরোধের জন্য কুইনাইন সহজলভ্য করা হয় এবং ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বিনা মূল্যে কুইনাইন বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের মাধ্যমে বিভিন্ন হাট বাজারে পোষ্টার লিফলেট বিতরণ করে এবং ফটো–স্লাইড প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়। যে সমস্ত গ্রামে পানিয় জলের তীব্র অভাব ছিল এবং যে সমস্ত গ্রামে প্রায়শঃই বিভিন্ন রোগ হতো স্বাস্থ্য পরিদর্শকবৃন্দ তার থানা ভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে জেলা বোর্ডকে দেন। অসাধু ব্যবসায়ীগণ যাতে খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত করতে ভয় পান সেজন্য বিভিন্ন হাটে বাজারে স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রেরণ করা হতো এবং অপরাধীকে জরিমানা করা হতো।

এ সকল বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলাফল খুব সাফল্যজনক না হলেও একেবারে শূন্য ছিল না। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এবং লোকবল কম থাকায় প্রতিটি গ্রামে স্বাস্থ্য সুবিধা পৌছানো সম্ভব হয়নি। তবে যে সকল স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় অবস্থিত ছিল তার চার পাশের এলাকায় স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সরকারী উদ্যোগে স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ করায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের তিন দশকের চেয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি পরিলক্ষিত হয় (সারণী–১০ দ্রষ্টব্য)। তবে এই বুদ্ধির হার যে সন্তোষজনক ছিল না তা' এই সারণী থেকেই স্পষ্ট। আমরা পূর্বেও সেকথা উল্লেখ করেছি। সারণী ৪ আমরা লক্ষ্য করি যে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে জন্মহার যথেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুহার বেশি হওয়ায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল মন্থর।

সারণী–১০ঃ উত্তর বাংলার পাঁচটি জেলায় জনসংখ্যার হ্রাস–বৃদ্ধি, ১৮৭২–১৯৪১

জেলার নাম	বৃদ্ধির হার								
	১৮৭২-৮১	১৮৮১-৯১	১৮৯১-১৯০৯	১৮৭২-১৯০১	১৯০১-১১	১৯১১-২১	১৯২১-৩১	১৯৩১-৪১	১৯০১-১৯৪১
রাজশাহী	-১.০	-১.০	+২	+.০২	+১.০	-০.৪	-৪.০	+১১.৩	+১৪.৩
দিনাজপুর	+১.০	+৩.০	+৬.০	+৯.১	+৮.০	+১.০	+৩.০	+৮.২	+২২.৭
রংপুর	-৩.০	-২.০	+৪.৩	-০.০	+১০.৭	+৫.১	+৩.৭	-০.৮	+১৮.৯
বগুড়া	+৭.০	+১১.৩	+১১.৮	+৩৬.৮	+১৫.২	+৬.৬	+৩.৫	+৮.৯	+৩৬.১
পাবনা	+৮.০	+৪.০	+৪.০	+২৫.৩	+১.০	-৩.০	-৩.৭	+১৬.৯	+২০.৩

উৎসঃ সেন্সাস রিপোর্ট সমূহ, ১৮৭২ থেকে ১৯৪১

মৃত্যুজনিত কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মন্থর হওয়া প্রতিকূল স্বাস্থ্য পরিস্থিতির কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং মন্তব্য করা যায় যে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও এ সময় জন স্বাস্থ্য পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতি ঘটেনি।

উপসংহার

কৃষিতে জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির প্রভাবঃ

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর বাংলার জেলা সমূহে জনস্বাস্থ্য পরিস্থিতির কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এ সময় বিভিন্ন মহামারীতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে। যারা বেঁচে থাকে তারাও শারীরিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই দুর্বলতা অতি সহজে অন্য রোগে আক্রান্ত হয় এবং পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। এই মৃত্যুহার কৃষিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উত্তরবাংলা কৃষি প্রধান এলাকা। এ শতকের চতুর্থ দশকে এখানে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক কৃষি নির্ভর ছিল। বিনয় ভূষণ চৌধুরী মন্তব্য করেছেন,[২৪] বিভিন্ন রোগে, বিশেষ করে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু বরণকারীদের হার দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেই বেশি ছিল। কুটির শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের চেয়ে কৃষি শ্রমিকগণ অধিক হারে মৃত্যুবরণ করতো। বিনয় ভূষণ চৌধুরী আরো উল্লেখ করেছেন যে, ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুবরণকারীদের ৩৭% ছিল দিন মজুর ও ভিক্ষুক শ্রেণীর, ৩১% ছিল কৃষক রায়ত, ১৯% ছিল কামার, কুমার, তাঁতী, ধোপা, স্বর্ণকার প্রভৃতি পেশার লোক এবং মাত্র ১২% ছিল ধনী জমিদার–জোতদার–ব্যবসায়ী

শ্রেণীর।[২৫] শ্রী চৌধুরীর এই মন্তব্য থেকে বলা যায় যে, অধিক মৃত্যু হারের ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায়। উপরন্তু ম্যালেরিয়া কিংবা অন্যকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে বেঁচে যাওয়া শ্রমিকদের জমিতে কাজের শক্তি হ্রাস পায়। অনেক গৃহস্থ পরিবার যারা নিজ পরিবারের সদস্যদের শ্রমে জমি চাষ করতো তেমন পরিবারের কার্যক্ষম সদস্যের মৃত্যু ঘটায় তাদেরকে বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু অর্থাভাবে অনেক পরিবারের পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয় না। ফলে তাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।

সে সময় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রবল প্রকোপ থাকতো অক্টোবর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত এই সময়কালটি হচ্ছে আমন ধান উৎপাদনের সময়। এতে প্রচুর কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ায় আমন চাষের সময় অনেক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে; ফলে আমন উৎপাদন ব্যাহত হয়। অনেক জমি পতিত থাকে। কৃষির আওতায় নতুন জমি আনয়নের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়। উত্তরবাংলার যে সকল থানায় লোক সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল সে সকল থানায় পতিত জমির হার লোক সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত থানা সমূহের পতিত জমির হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ সালে রংপুরের সাঘাটা থানায় (লোক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত থানা) আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ যেখানে ৬% সেখানে ক্ষয়িষ্ণু থানা ডোমার ও ডিমলার আবাদযোগ্য পতিত জমির হার ছিল ২০%।[২৬]

অতএব বলা যায় যে, ব্রিটিশ আমলে গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি বহুলাংশে দায়ী ছিল।

তথ্য নির্দেশঃ

১। J. A. Vas, Rangpur, *Eastern Bengal and Assam Gazetteers*, (Allahabad: Pioneer Press, 1911), P. 49

২। ঐ

৩। *Report on the Indian Famine Commission*,(London: Eyre & Spottis Woode, 1978), Vol. III, P. 529.

৪। উদ্ধৃতি দেখুন, *Rangpur District Census Report of 1891*, Paragraph-18.

৫। F. W. Strong, *Eastern Bengal District Gazetteers: Dinajpur*, (Allahbad: The Pioneer Press, 1912), P. 44.

৬। ঐ

৭। ঐ

৮। L. S. S. O 'Malley, *Bengal District Gazetteers, Rajshahi*, (Calcutta: Bengal Secetariat Book Depot., 1916), P.67.

৯। জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন ঃ N. I. Khan, *Bangladesh District Gazetteers, Pabna*, (Dacca: Bangladesh Government Press, 1978), PP. 175-176.

১০। বাংলার ম্যালেরিয়ার উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য সুরেন্দ্র মোহন বসু, 'বঙ্গে ম্যালেরিয়ার আদিম ইতিহাস', *প্রবাসী*, জৈষ্ঠ, ১৩৩২, পৃঃ ২৫৫-২৫৬

১১। বিলাস চন্দ্র দাস, *'বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জেলার স্বাস্থ্য, প্রতিভা*, বৈশাখ, ১৩২১, পৃ. ৩৭

১২। Major F. B. Fry, *First Report on Malaria in Bengal*, (Calcutta: The Bengal Secratariat Book Depot., 1912), P. 7.

১৩। L. S. S. O'Malley, *op-cit*, PP. 68-69; নূরুল ইসলাম খান (সম্পাঃ), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ারঃ বৃহত্তর রাজশাহী* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৯১), পৃ. ২৬২।

১৪। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য; (লেখকদের নাম নেই), '*পল্লী গ্রামের স্বাস্থ্যঃ সাধারণের অবস্থা*,' *মালঞ্চ* ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ১৩২২, পৃ. ১০৬৮–১০৭০।

১৫। J. N. Gupta, *Bengal District Gazetteers, Bogra*, (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot., 1909), PP. 52-53; মসাহেদ চৌধুরী (সম্পাঃ), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ১৯৮৯), পৃ. ১৬৯।

১৬। S. N. Mitra (ed), *Rural Public Health Circles Inspection Reports for the Rajshahi District for the year* 1934-35, (Alipore: Bengal Government Press, 1936), P. 15.

১৭। এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ K. P. Gupta, 'Some Sanitary and Social Rules in the Shastres,; *Calcutta Review*, No. ClXXVII, PP. 53-63 বিলাসচন্দ্র দাস, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬

১৭ক। মনুঃ অধ্যায়-৪, শ্লোক-৫৬

১৭খ। মনুঃ অধ্যায়-২, শ্লোক-৫৭

১৭গ। মনুঃ অধ্যায়-৫, শ্লোক-৫

১৭ঘ। মনুঃ অধ্যায়-৪, শ্লোক-৭০

১৮। রফিক উল্লাহ (সংকলন ও সম্পাদনা), *হাদীস শরীফ* (কলিকাতাঃ হরফ প্রকাশনী, ১৯৯০), দেখুন হাদীস নং ১৭৬, ২০৪,২১২, ৩৯০, ৩৯৬, ৫৫৪, ৭৪৭, ৭৫৩, ৭৮১, ১১৭৩, ১১৭৪, ১১৭৬, ১১৭৮, ১১৮৫ ইত্যাদি।

১৯। আলমগীর জলীল ও সামীয়ুল ইসলাম (সম্পাঃ) *লোক-সাহিত্য, সপ্তদশ খণ্ড* (*লোক সংস্কার ঃ রোগের উৎপত্তি ও লোক চিকিৎসা*) (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৯)।

২০। বিস্তারিত দেখুন Md. Mahbubar Rahman, 'Welfare Activities of the Colonial Government in Rural Bengal: Improvement of Public Health and Sanitation in Rangpur District', *The Rajshahi University Studies* (Part A), Vol. XVII, 1989, PP. 67-82', Government of Bengal, (Public Health Organisation (Calcutta: Bengal government Press, 1934).

২১। W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, *Rangpur & Dinajpur* (London: Trubner & Co., 1876), PP. 350-458; *Ibid*, Vol. IX *Pabna*, P.374; *Ibid*, vol. VIII, *Rajshahi & Bogra*, PP. 124, 315; *The Imperial Gazetteer of India*, Vol, XXI, *Rangpur* (Oxford: Clarendon Press, 1908) P 231; *Ibid*, Vol. VIII, Bogra, P. 262; *Ibid*, Vol. XI *Dinajpur*, P. 354; *Ibid*, Vol. XIX, *Pabna*, P. 304, *Ibid*, Vol. XXI *Rajshahi*, P. 168.

২২। মসাহেদ চৌধুরী, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার, বগুড়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

২৩। নূরুল ইসলাম খান, *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর রাজশাহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১

২৪। Binay Chaudhuri, 'Agricultural Production in Bengal, 1850-1900' of Decline and Growth, ***Bengal Past and Present***

২৫। তদেব, পৃ. ১৬৩

২৬। Md. Mahbubar Rahman, 'Village Life in Colonial Bengal: Change and Continuity in Rangpur Distict, 1870-1940", Unpublished Ph. D. Thesis, *Institute of Bangladesh Studies*, 1988, P. 122 footnote-8.

[illegible]

[illegible] L. S. S. O'Malley, op. cit. [illegible]

[illegible]

[illegible] J. C. Gupta, Bengal District Gazetteers, Bogra, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1925, [illegible]

[illegible] S. N. Mitra (ed.), Rural Public Health Circles Inspection Reports for the Rajshahi District for the year 1924-25, Alipore, Bengal Government Press, [illegible]

[illegible] R. K. Gupta, "Some Canteens and Social Rules in the Shastras", Calcutta Review, Vol. CXXXVI, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Md. Mahbubar Rahman, "Welfare Activities of the Colonial Government in Rural Bengal: Improvement of Public Health and Sanitation in Rangpur District", The Rajshahi University Studies (Part-A), Vol. XXII, 1996, PP. 173-183; Government of Bengal, Public Health Organization (Calcutta: Bengal Government Press, 1935).

[illegible] W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Vol. VII, Maldah & Dinajpur (London: Trubner & Co., 1876), PP. 150-155; Ibid., Vol. IX Pabna, P. 334; Ibid., Vol. VIII, Rajshahi & Bogra, PP. 124-[illegible]; The Imperial Gazetteer of India, Vol. XXI, Rangpur (Oxford: Clarendon Press, 1908), P. 251; Ibid., Vol. VIII, Bogra, P. 288; Ibid., Vol. XI Dinajpur, P. 358; Ibid., Vol. XIX, Pabna, P. [illegible]; Ibid., Vol. XXI Rajshahi, P. 183.

[illegible]

[illegible]

[illegible] Binay Chaudhuri, "Agricultural Production in Bengal, 1850-1900 : Decline and Growth", Bengal Past and Present.

[illegible]

[illegible] Md. Mahbubar Rahman, "Village Life in Colonial Bengal: Change and Continuity in Rangpur District, 1870-1940", Unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Bangladesh Studies, 1996, P. [illegible] footnote-8.

বাঙালি মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার ধারা (১৯৪০-১৯৭০)

মোঃ আবুল কাসেম

১.ঊনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা চেতনা বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাদের মাতৃভাষা বাংলা কিনা, তাদের জাতীয় ভাষা এবং মাতৃভাষা এক না ভিন্ন, তারা কি সংস্কৃত ধর্মী প্রচলিত বাংলা গ্রহণ করবে, নাকি নিজেদের জন্য আরবী ফারসী শব্দ যুক্ত স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা তৈরি করবে, তাদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলা এবং উর্দুর মধ্যে কোনটি হওয়া উচিত,তাদের জাতীয় আত্ম পরিচয়ের জন্য কোন্ কোন্ ভাষা শিক্ষা করা দরকার ইত্যাদি বহু প্রশ্ন তাদেরকে পীড়া দিয়ে আসছিল। সমসাময়িক কালের পত্রপত্রিকাসমূহে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত সাহিত্যকর্মে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ এ সকল প্রশ্নের কোন কোনটির নিষ্পত্তি হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা যে হয়নি সেটা বোঝা গেল চল্লিশের দশকে। তদানিন্তন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৪০ সালে দ্বিজাতিতত্ব ভিত্তিক লাহোর প্রস্তাব (যা পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রস্তাব নামে খ্যাত হয়েছিল।) গৃহীত হলে উপর্যক্ত বিষয়সমূহ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আরও কিছু নতুন বিষয়ও সংযোজিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধে শিরোনামায় উল্লেখিত সময় পরিসরে তথা পাকিস্তান প্রস্তাব থেকে শুরু করে সমগ্র পাকিস্তান আমলে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর ভাষাসচেতনতা কী কী ধারায় ও স্বরূপে তাদের সাহিত্যিকর্মসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২. বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি এ প্রশ্নে কয়েকটি পত্র পত্রিকা উর্দুর পক্ষে প্রচারণা শুরু করলে বিষয়টি নতুন সূত্রে বিতর্কিত হয়ে উঠে। ইংরেজী মর্নিং নিউজের একজন পত্রলেখকের পত্রের বক্তব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে সম্পাদকীয় ছেপেছিল 'দৈনিক আজাদ'। মর্নিং নিউজের উক্ত পত্রলেখকের পত্রের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

> বাংলাভাষা শিক্ষিত মুসলমানদের বর্তমান মনোভাব হইতেছে বাংলা এবং উর্দু ভাষা, বাংলা ভাষা বনাম উর্দু ভাষা নয়। অনেকগুলো গুরুতর কারণ আছে, যার জন্য মুসলিম বাঙ্গার সকলে এই দন্ডে উর্দু গ্রহণ করিতে পারে না। সেটা সম্পন্ন হইতে কয়েক বছর সময় লাগিবে। কিন্তু পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই আছে, যদিও তা অস্পষ্ট হইতে পারে।

২.১ উর্দুভাষীদের তৎপরতা লক্ষ্য করে আবুল মনসুর আহমদ বাঙালিদের সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই 'পূর্ব বাংলার জবান' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ (*মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক, ১৩৫০)

লেখেন। তাঁর এই প্রবন্ধে তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজে উর্দু ভাষার প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্যের উল্লেখ করে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন–

> পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগে এমন কি তার আগে থেকেই বাংলায় উর্দু অভিযান হওয়া মোটেই অবাস্তব কল্পনা মাত্র নয়। (৪)

তিনি অবশ্য উর্দু ভাষার প্রতি মুসলিম ভক্তির জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নেতৃস্থানীয় হিন্দু লেখকগণের মুসলিম বাংলার 'জবানী বাংলা'কে স্বীকার না করাকে দায়ী করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকেই জানা যায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির [কলিকাতায় ১৯৪২ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম লেখক সাহিত্যিকগণ কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠান সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়] আলোচনা সভায়ও এ বিষয়ে একধিকবার বিতর্ক হয়েছে। তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলার পক্ষেই মত প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যাঁরা উর্দুর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তাদের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। আবুল মনসুর আহমদের আশঙ্কা অমূলক নয়; কারণ সমসাময়িক কালের মুসলিম বঙ্গের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতাদের অনেকে বাংলার পক্ষে মত প্রকাশ করলেও উর্দুর প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যতটা সম্ভব নমনীয়। ১৯৪৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে। [পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির মতই অভিন্ন লক্ষ্যে এই সংগঠন একই সময়ে ঢাকার জন্ম লাভ করেছিল।] সভাপতির ভাষণে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেয়েন যদিও বলেন যে উর্দুকে বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যের বাহন করে তুলবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি উর্দুর প্রসারও বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। ('সমিতির সভাপতির আহবান' *পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, সম্পাঃ সরদার ফজলুল করিম, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৩৭৪, পৃঃ ১০৩।) আবুল হাসনাৎ ১৯৪৪ সালে রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মেলনে যে অভিভাষণ প্রদান করেন ('ভাষা বিজ্ঞান শাখার সমিতির অভিভাষণ' *মাসিক মোহাম্মদী* শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১ পৃঃ ৪৯৫–৪৯৯), তাতে তিনি বাঙালি মাসুলমানের মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবী ছেড়ে দিতে রাজী নন। তবে বাঙালি মুসলমানের অবশ্য শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে উর্দুভাষার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেন, তাতে উর্দু ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে (৪৯৮), ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে ('জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ', *মাসিক মোহাম্মদী*, বৈশাখ, ১৩৫১ পৃঃ ৩০৬–৩০৮) উর্দুর প্রতি সৈয়দ এমদাদ আলীরও বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়। যদিও তিনি বলেন, 'উর্দু আমাদের মাতৃভাষা হোক এ চিন্তা আমরা করি না। আমাদের মাতৃভাষা চিরদিন বাংলাই থাকিবে' (৩০৭), তবু তার দৃঢ় সিদ্ধান্ত হল, ধর্মীয় সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে আমাদের তরুণদের কিছু উর্দু শেখা উচিত (৩০৮)।

৩. ভবিষ্যৎ মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মুসলিম সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায়। উর্দুর পক্ষে দায়িত্বশীল মহলের বক্তব্য প্রকাশ পাবার পর [১৯৪৭ সালের ১৮ই মে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯–১৯৭৩) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। তথ্য সাঈদ–উর রহমান, *পূর্ববাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকাঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ পৃঃ ৩১] রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে লেখক সাহিত্যিকদের বিবেচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'আজাদ' পত্রিকার ২২শে জুন ১৯৪৭ সংখ্যায় কাজী আবুল হোসেন রচিত 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমেই রাষ্ট্রভাষার প্রতি বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। একই পত্রিকার ৩০শে জুন, ১৯৪৭ সংখ্যায় মোহাম্মদ আবদুল হক রচিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি এই প্রবন্ধের শেষে এ বিষয়ে লেখক সাহিত্যিকদের মতামত আহ্বান করেন। এই সংখ্যা থেকেই 'আজাদ' পত্রিকা 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বিতর্ক)' এই শিরোনামের একটি নিয়মিত কলামে বিশিষ্ট চিন্তাশীল নাগরিকের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করতে থাকে। এই কলামেই পরে উর্দু ভাষার পক্ষে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদের ভাষণের প্রতিবাদে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বিখ্যাত প্রবন্ধ 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' (*দৈনিক আজাদ*, ২৯শে জুলাই ১৯৪৭) প্রকাশ পায়।

৩.১ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সকল প্রবন্ধে কয়েকজন উর্দুর পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। যাঁরা উর্দুর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা সকলে আবার বাংলার পক্ষে ছিলেন না, আরবী কিংবা ফারসির পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। যাঁরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন তাদের বক্তব্যও ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলাভাষার পক্ষে যাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি ফররুখ আহমদ। তাঁর 'পাকিস্তানী রাষ্ট্র ভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে (*সওগাত*, আশ্বিন, ১৩৫৪,পৃঃ ৫৬৫–৫৬৬) রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলার বিরোধিতা এবং উর্দুভাষার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের পেছনে কুৎসিত এক পরাজয়ী মনোবৃত্তি কাজ করছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন–

বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গণ্য করা হলে এদেশের ইসলামী সংস্কৃতি হত্যা করা হবে। (৪৬৬)

৩.২ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আরবী ভাষাকে টেনে আনা হয়েছিল সম্ভবত উর্দুকে প্রতিহত করার অন্যতম উপায় হিসেবে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কাছাকাছি সময়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ অন্ততঃ তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে 'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা'

(*দৈনিক আজাদ*, ২৯শে জুলাই ১৯৪৭)' পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' (*ঐ* ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭) এবং 'আমাদের কওমী যবান' (*মাহেনও* জানুয়ারী, ১৯৫০)। প্রবন্ধগুলোতে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজী, বাংলা উর্দু এবং আরবী–এই চারটি ভাষারই বিভিন্ন প্রকার যোগ্যতার বিবরণ দিয়ে মিলিত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এই চারটি ভাষার প্রস্তাব করেছেন। এতে তিনি ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা না হলে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা না করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই বলে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রবন্ধের প্রায় শুরুতে তিনি কোন ভূমিকা 'ছাড়াই মন্তব্য করেন'। আরবী ভাষাকেই আমি বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় ভাষা রূপে গণ্য করি।'

শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে আরবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। আরবীর পক্ষে আর যাঁদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে এম. আই. চৌধুরী এম. এম (আলিগ) ('পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' *মাসিক মোহাম্মদী*, বৈশাখ, ১৩৫৬), ডক্টর এম আবদুল কাদের ('রাষ্ট্রভাষা' *নওবাহার*, চৈত্র ১৩৫৭) মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ('শিক্ষায় ভাষা সমস্যা' *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৫৮) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে শেষের প্রবন্ধটি নানা কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবী রখে। প্রবন্ধকার এতে মাতৃভাষা, ধর্মভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজী–বাঙালি মুসলমানের অবশ্য শিক্ষণীয় এতগুলো ভাষার বোঝা লাঘব করার উদ্দেশ্যেই ধর্মভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম তাঁর 'রাষ্ট্রভাষারূপে ফারসী' প্রবন্ধে (*মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ ১৩৫৬) ফারসী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সর্বাধিক যোগ্য প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান।

৩.৩ রাষ্ট্রভাষা উর্দুর পক্ষে প্রথম খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছিলেন সাদ মোহাম্মদ। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা (বিতর্ক)' কলামে (৩০শে জুন ১৯৪৭) অংশ নিয়ে তিনি কাজী আবুল হোসেনের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছিলেন। মাতৃভাষা বাংলা হলেও রাষ্ট্রভাষা উর্দু হতে পারে বলে মত প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, উর্দু সাহিত্যই মুসলমানের ধর্ম, ইতিহাস, তাহজীব তমুদ্দুনকে ধারণ করে রেখেছে। তাঁর মতে, উর্দু কোন প্রদেশ বিশেষের ভাষা নয়, বরং ভারতের মুসলমানদের ভাষা। তবে উর্দুর পক্ষে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাঃ উর্দু না বাংলা'। ২৮ পৃষ্ঠার ছোট পুস্তিকাকারে এটি লেখক কর্তৃক ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশের সময় এতে উল্লেখ না থাকলেও বক্তব্যাংশের মর্ম থেকে বোঝা যায়, ১৯৪৮ সালের প্রদত্ত জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ঘোষণার পর রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিতভাবে ধারণ করলে সে সময় এই প্রবন্ধ রচিত হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য লেখক এতে সবরকম যুক্তির সমাবেশ করেন। তাঁর প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন, পাকিস্তানের সকল মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধির জন্য 'পশ্চিমা মুসলমানদিগকে বাংলা পড়িতে হইবে

(৩০)। মীজানুর রহমান ছিলেন উর্দুর আর একজন বড় সমর্থক। উর্দু সাহিত্যে বাংলার দান' শীর্ষক *দৈনিক আজাদ*, ২৪শে মে, ১৯৪৯) প্রবন্ধে তিনি কলকাতায় অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে উর্দুর সূতিকাগার বলে মত প্রকাশ করেন। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার নাম' (*মাহে নও*, আগষ্ট, ১৯৫০) শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধে তিনি ধারণা প্রকাশ করেন, অভিন্ন লিপি ও অভিন্ন আদর্শের প্রভাবে পাকিস্তানের উভয় অংশের ভাষা একদিন এক হয়ে যাবে এবং সেই একীভূত ভাষার নাম 'পাকিস্তানী ভাষা' হবে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি প্রচুর আরবী ফারসী শব্দ সহযোগে বাংলা লিখতেন। তাঁর এ ধরনের একটি প্রবন্ধ 'তকবীরে সাদারৎ' (*আল ইসলাহ*, কার্তিক–চৈত্র, ১৩৫৬)। এতে বাংলা শব্দের পরিমাণ খুব কম ছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীও 'বাংলা ভাষার ভাগ্য' প্রবন্ধে (*সওগাত* অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫) উর্দুকে ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ভাষা বলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা এভাষারই সর্বাধিক বলে মত প্রকাশ করেন। সমসাময়িককালে 'খবরদার' ছদ্মনামের একজন লেখকের 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে ২৩ পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। উর্দুর পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে এটিতে বলা হয়েছিল 'পাকিস্তানের মুসলমানী বাংলার প্রায় শতকরা ৮৫টি শব্দই উর্দু ভাষাতেও প্রচলিত।' (১১)

৩.৪. বাংলা ভাষার সপক্ষে কুণ্ঠাহীন ভাষায় বক্তব্য রেখে 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' এই শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক। এটি নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' এর কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল এবং ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিতরিত হয়েছিল। প্রবন্ধে লেখক পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে আবদ্ধ এ বিষয়ে সচেতনতা ব্যক্ত করেও মত প্রকাশ করেন। ধর্ম মানব সংস্কৃতির সবটুকু নয় এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সাদৃশ্যের চাইতে বৈসাদৃশ্যই বেশী। সমকালীন বিশ্বপরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি উল্লেখ করেন ধর্ম এবং ভাষা–এ দুটোর কোনটিই রাষ্ট্রিক বন্ধনের আংশিক শর্ত নয়। তাঁর ধারণা, 'পাকিস্তান রাষ্ট্রগঠনে ধর্ম বা সম্প্রদায় বড় নহে–আত্মনিয়ন্ত্রনই বড়।' তিনি মত প্রকাশ করেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করা হবে মাতৃভাষা বাংলাকে উদ্বন্ধনে হত্যা করার ব্যবস্থামাত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির পরিপন্থি; কারণ আত্মনিয়ন্ত্রণনীতি অনুসৃত হলে পাকিস্তানের দিক থেকে বাংলাভাষার উপর হস্তক্ষেপ করা যায় না। ব্রিটিশ আমলের ইংরেজী ভাষার দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বুঝিয়ে দেন, রাষ্ট্রভাষা না হলে মাতৃভাষাও জনসাধারণের অবজ্ঞার শিকার হয়। উর্দুকে এদেশে একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা বলে মত প্রকাশ করে বলেন সাম্রাজ্যবাদীরাই সাধারণত তাদের শোষণের পথ নিস্কটক করার জন্য নিজেদের ভাষা অপরের উপর চাপিয়ে দেয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাগত বৈপরীত্য তুলে ধরে তিনি বলেন–বাংলার মত একটি সমৃদ্ধ ভাষাকে বিসর্জন দেয়া পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের পক্ষে কখনোই সমীচীন হতে পারে না। একদেশে যে একাধিক রাষ্ট্রভাষা সম্ভব সেটা বোঝানোর জন্য তিনি সুইজারল্যান্ড এবং রুশদেশের দৃষ্টান্ত তুলে

ধরেন এবং বলেন পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত হবে। বহুভাষী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দীকে একক রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা লুক্কায়িত থাকতে পারে বলে তাঁর ধারণা। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, উর্দুকে সমগ্র পাকিস্তানের একক রাষ্ট্রভাষা হলে, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে'। তাঁর মতে, 'উর্দুর সড়ক পথ ধরিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু।' উর্দুকে অনুন্নত কৃতিম ভাষা আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, যদি একটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হয়, তাহলে উর্দুর চাইতে বরং ইংরেজী অনেক ভাল। যাঁরা ভারতীয় মুসলমানদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য উর্দু শিক্ষার কথা বলেন, তাদের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন, ভারতের অল্প সংখ্যক মুসলমানই উর্দুভাষী এবং ভিন্নভাষী লোকদের মধ্যে ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদানের জন্য ভাষা শিক্ষা অপরিহার্য নয়। আবরবীভাষায় কোরান অবতীর্ণ হবার কারণ হিসেবে কোরানে নির্দেশিত সূত্রের উল্লেখ করে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯৫ জনকে অস্বীকার করে উর্দুর ন্যায় একটি বিদেশী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে তা ঐশ্বরিক বিধানের পরিপন্থী হবে। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার প্রশ্ন কেন ওঠে তাই বিস্ময়ের ব্যাপার বলে তিনি মন্তব্য করেন। যাঁরা ভাবেন সংস্কৃতের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে বাংলা হিন্দু সংস্কৃতির বাহন তাদেরকে তিনি তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন, উর্দুও খাঁটি মুসলিম সংস্কৃতির বাহন নয়। যারা বলেন বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন রেখে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, এটা হবে প্রকৃতপক্ষে আর একটা রাজনৈতিক ভাঁওতা। কারণ এর দ্বারা উর্দুজ্ঞানের অভাবে পূর্ব পাকিস্তানবাসী রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক শোষণের শিকার হবেন। উপসংহারে তিনি বলেন–

ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান ইংরেজী ভাষা গ্রহণ না করিয়া যে জাতীয় আত্মঘাতী ভুল করিয়াছিলেন পূর্ব পাকিস্তানবাসী এইবার উর্দুকে গ্রহণ করিলে অবিকল ঐ জাতীয় আর একটি রাজনৈতিক ভুলের পুনরাবৃত্তি করিবেন।

বাংলাভাষার পক্ষে দ্বিধাহীন ভাষায় বক্তব্য রেখে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন বিশিষ্ট রম্যসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী। নিজস্ব স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে রচিত ৩১ পৃষ্ঠার এ দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখক প্রতিপক্ষের বহু যুক্তি ও বক্তব্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে খন্ডন করেছেন। যখন 'বাংলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে', 'রাজনৈতিক উত্তাপ অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে', 'ভবিষ্যতের অনেক অর্থহীন দ্বন্দ্বকে এড়ানোর জন্য 'উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে' তিনি এ প্রবন্ধটি রচনা করেছেন বলে প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাগত ঐক্য সাধনের জন্য যাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে সৈয়দ মুজতবা আলীর এ প্রবন্ধে বলেন, সেটা সম্ভব হতো, যদি পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বাংলা ভুলিয়ে উর্দু শেখানো সম্ভব হতো। কিন্তু ইরান ও তুরস্কের মত মুসলিম রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়ে দেন, এ দুটো দেশে আরবী প্রচলনের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তা সম্ভব তো হয়ইনি, বরং ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে উভয় দেশেই

মাতৃভাষাপ্রীতির উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। মিশরে যে আরবী ভাষার প্রচলন হতে পেরেছে, তার কারণ, তাঁর মতে, মিশরে আরবী ভাষাভাষীদের ব্যাপক অভিবাসন। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেন, দীর্ঘ ছয়শত বছরের মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রভাষা ফারসী হওয়া সত্ত্বেও এদেশেও ফারসী প্রচলন সম্ভব হয়নি; বরং জাতীয় ভাষা হিন্দীর সঙ্গে আরবী ফারসী শব্দের মিশাল দিয়ে উর্দুভাষার জন্ম দেওয়া হয়। ধর্মবক্তৃতায় এদেশের মৌলবী মোল্লাদের ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও এদেশে যে একটুও উর্দু প্রচলিত হতে পারেনি, সে দৃষ্টান্তটিও তিনি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন। উর্দুবাদীদের কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, শুধু হাইস্কুল ও কলেজ য়্যুনিভার্সিটিতে উর্দু চালানো হবে, প্রাইমারী স্কুল এবং গ্রাম্য পাঠশালাতে বাংলাই চলবে। তার উত্তরে লেখক বলেন, তাতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হবে তা হবে উপনিবেশিক শাসনামলের বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি; এতে নতুন রাষ্ট্রের আপামরজনসাধারণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হবে। যাঁরা বলেন, কেন্দ্রীয় সংসদে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের উর্দু শেখা উচিত, কারণ কোন ভিন্ন ভাষাভাষীর পক্ষে নতুন ভাষা শিক্ষা করে উর্দুভাষীদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করা সম্ভব হবে না। এর পরিবর্তে তিনি জাতিসংঘের মত অনুবাদের আশ্রয় নেয়া উচিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। যারা তবু অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য জেদ ধরেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি হিসেব করে দেখান, পূর্ব পাকিস্তানে স্কুল কলেজে উর্দু চালাতে হলে যে পরিমাণ উর্দু শিক্ষক বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে এদেশে আমদানী করতে হবে, তাদেরকে নুন্যতম বেতন দেবার সামর্থ্য পূর্ব পাকিস্তান (তৎকালীন) সরকারের কেন ইংল্যান্ড ফ্রান্সেরও থাকার কথা নয় এবং এর ফলে বাংলা ভাষাভাষী যে বিপুল পরিমাণ চাকুরী হারিয়ে বেকার হবে, তারা তা কখনোই মেনে নেবে না; আর এর সঙ্গে রয়েছে পুস্তক, পুস্তক প্রণেতা, ছাপাখানা, কম্পোজিটর, প্রুফরীডার ইত্যাদির সমস্যা।

অনেকে বলেন, ব্রিটিশ আমলের ইংরেজীর মত উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করা হোক। এদের উদ্দেশ্যে লেখক হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সেটা হবে প্রাণঘাতী। কারণ তাঁর মতে, 'সে শিক্ষাবিস্তারে যে তখন অজস্র অর্থব্যয় হয় তা নয়, সে শিক্ষা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবশ করে তোলে, কল্পনা শক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং সর্বপ্রকার সৃজনী শক্তিকে কণ্ঠরোধ করে শিক্ষার আঁতুড় ঘরেই তার গোরস্থান বানিয়ে দেয়।' কেউ কেউ ভাবেন বাংলা 'হেঁদুয়ানী ভাষা'। তাই পূর্ব পাকিস্তানী যদি সে ভাষা রাষ্ট্র ও কৃষ্টির জন্য গ্রহণ করে তাহলে সে হিন্দু ভাবাপন্ন হয়ে যাবে। তিনি এই ধারণা খন্ডন করেন জোরালো ভাষায়। তিনি বলেন, 'বাংলাভাষা হিন্দু ঐতিহ্য ধারণ করে বটে, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।' এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, সর্বসাধারণ ধর্মের বাণী মাতৃভাষায় বুঝুক, এই তাৎপর্যে মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ 'কোরান' বহুত্ববাদী পুতুল পূজকদের ভাষা আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যুক্তির মাধ্যমে সপ্রমাণ করেন, ভাষার ক্ষেত্রে 'পাক না পাক' তথা পবিত্রতা অপবিত্রতার প্রশ্ন

অবান্তর। কারণ ইসলামের বিচারে কোন তথাকথিত 'নাপাক' ভাষায় কথা বলে ব'লে 'কলেমা' থেকে বঞ্চিত করা যায় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে উর্দুর কথা যাঁরা বলেন, তাঁদেরকে তিনি বুঝিয়ে দেন। ভাষার অজ্ঞতা কখনোই ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দেখা দেয়নি। আর বাধা হলেও তা এত সীমিত পরিসরে হবে যে, তার জন্য পুরোজাতিকে উর্দু শেখানোর কোন মানে হয় না বলে তিনি মনে করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন পাকিস্তানকে যদি সমৃদ্ধ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে জাতীয় কর্মকাণ্ডে গণমানুষকে শরীক করে সব এবং এটা সম্ভব হবে যদি শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। গণ-মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সাহিত্যিকদের ভূমিকার কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় কোন লোকের পক্ষে অ-উন্নত সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। তা তিনি যত প্রতিভাশালীই হোন না কেন। অমর প্রতিভাবান কবি কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টান্ত, পূর্ববঙ্গের লোকসাহিত্যে মুসলিম কবিদের 'আন্তজার্তিক খ্যাতির কথা স্মরণ করে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, 'পূর্ববঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির যে উপাদান আছে এবং পূর্ববঙ্গবাসীর হৃদয়মনে যে 'সামান' আছে তার বদৌলতে একদিন সে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবে।' মুসলিম সাহিত্যিকগণ ইসলামের ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে তাতেও আপত্তি থাকতে পারে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অবশ্য তিনি প্রস্তাব করেন, পূর্ববঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় উর্দু শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিত।

৪. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু প্রবর্তনের পাশাপাশি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার লিপি পরিবর্তন করে আরবী লিপি (আসলে উর্দু বর্ণমালা) প্রবর্তন করার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৬০ সালের দিকে সরকার পুনরায় বাংলাভাষার রোমান লিপি প্রবর্তনের চেষ্টা করে। বর্ণমালা পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা বিতর্কের মতই বর্ণমালা পরিবর্তনের বিষয়টিও মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের সূত্রপাত করে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পক্ষে বিপক্ষে বেশ কিছু আলোচনা সমালোচনামূলক রচনা।

৪.১ যে সমস্ত প্রবন্ধে আরবী লিপি প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয় সেগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অধ্যক্ষ শেখ শরফুদ্দিন এম. এ. বি. এল. রচিত 'নতুন লিপিতে বাংলা' (*দৈনিক আজাদ*, ২রা মে, ১৯৪৮)। সর্বাপেক্ষা বক্তব্যবহুল এ প্রবন্ধটির মাধ্যমেই সম্ভবতঃ পত্র-পত্রিকার পাতায় বর্ণমালা সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত হয়। প্রবন্ধটিতে তিনি যথারীতি বাংলা বর্ণমালার অসুবিধা এবং আরবী বর্ণমালার সুবিধার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থিত করেন এবং আরবী উর্দু, ফারসী এই তিন ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণমালা গ্রহণসহ নতুন উদ্ভাবিত কয়েকটি বর্ণমালা সংযোজন করে বাংলাভাষার উপযোগী একটি আরবী বর্ণমালা'র প্রস্তাব করেন। প্রবন্ধে তিনি আশা করেছিলেন 'আরবী হরফ ব্যবহারে বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারা প্রবেশের পথ সহজ ও স্বাভাবিক হবে।' তাঁর বিশ্বাস ছিল, আরবী হরফে লিখলে বাংলাভাষার প্রতি মুসলমানদের ভক্তি

বৃদ্ধি পাবে। মুহম্মদ আবু বকর 'আরবী হরফে বাংলা' (*দৈনিক আজাদ*, ২২শে মে, ১৯৪৯) প্রবন্ধে সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার যোগাযোগ ছিন্ন করার এবং আরবী ভাষার সঙ্গে বাংলাভাষার যোগাযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হরফ পরিবর্তনের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া আরও যাঁরা বিভিন্ন যুক্তিতে আরবী হরফের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, তাঁরা হচ্ছেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ('বাংলাভাষা ও আরবী বর্ণমালা' *দৈনিক আজাদ*, ১৫ই মার্চ, ১৯৪৯), অধ্যাপক খলিলুর রহমান ('বর্ণমালা বিতর্ক' *ঐ* ৩০মে, ১৯৪৯), আবদুল বারী ('বাংলার জন্য আরবী হরফ'– *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র, ১৩৫৬), মহীয়ুদ–দীন (অক্ষর সমস্যা' *ঐ* জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। আরবী হরফে বাংলালেখা বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কিংবা অসম্ভব এ ধরনের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করার জন্য মোহাম্মদ আকরাম খাঁ 'অনুলিখন' রচনায় (*ঐ*, মাঘ, ১৩৫৬) সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গীর বাংলা রচনাকে আরবী লিপিতে অনুলিখিত করে দেখান। আবুল ফজল মোহাম্মদ আখতারু–দ্–দীন 'বাংলা বর্ণমালার পরিবর্তন' প্রবন্ধে (*দৈনিক আজাদ*, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৯) আরবী লিপির পরিবর্তে রোমান লিপির প্রবর্তন অপেক্ষাকৃত বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বাংলার উপযোগী একটি রোমান বর্ণমালা প্রণয়ন করেন।

৪.২ ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হরফ পরিবর্তন সমর্থন করেননি। তাঁর 'আরবী হরফে বাংলাভাষা' (*দৈনিক আজাদ*, ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৯ এবং ২০শে এপ্রিল, ১৯৪৯) আরবী লিপির পক্ষের যুক্তি খন্ডন করেন। তিনি বলেন 'আরবী হরফ প্রবর্তনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে জ্ঞানের স্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে।' যারা আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিবর্তে ইসলামের দোহাই পেড়ে আরবী লিপির প্রবর্তন করতে চায়, তাদেরকে তিনি প্রতারক বলে আখ্যায়িত করেন। ডক্টর সৈয়দা ফাতেমা সাদেক এম. এ. পিএইচ.ডি. (লন্ডন) লিপি পরিবর্তনকারীদের সঙ্গে চূরান্ত লক্ষ্যের দিক থেকে একমত হয়ে বর্ণমালা পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করেন এজন্য যে, এতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তার চাইতে তিনি বাঙালিদের উর্দুভাষা মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এসময়ই উর্দুর পক্ষে প্রকাশকালবিহীন ৪৪ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ পায়। 'হরফ সমস্যা' নামের এই পুস্তিকার লেখক দূরদর্শী। এতে নতুন কথা তেমন কিছু ছিল না।

৪.৩ আরবী লিপির বিরুদ্ধে সবচাইতে জোরালো ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ফেরদাউস খানের রচনায়। এ সম্পর্কে তিনি পুস্তিকা, প্রবন্ধ A Comparative Study of the three Scripts নামক পুস্তিকা প্রকাশ, করেন; ১৯৪৮, 'বাংলা বনাম আরবী' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ, *দৈনিক আজাদ* ৯ই এপ্রিল ১৯৪৯ এবং 'হরফ সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৬৪) প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর রচনায় পঠনশীলতা ও লেখনদ্রুতি বর্ণমালা বিচারের সবচাইতে বৈজ্ঞানিক মানদন্ড বলে মত প্রকাশ করেন এবং পরীক্ষা করে দেখান, বাংলা ও উর্দু বর্ণমালার পঠনশীলতার অনুপাত ১৩ঃ৮। তাঁর হিসাবে, উর্দু বর্ণমালার

সংখ্যা ৩৭ হলেও শব্দের আদিতে মধ্যে অন্তে তার যে রূপ পরিবর্তন হয়, তার ভিত্তিতে তার সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৭।

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকও পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির প্রশ্নমালার উত্তরে আরবী বর্ণমালার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করেন।

৫. দীর্ঘকাল থেকে বাঙালী মুসলিম সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলা ভাষার নানাবিধ সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করে আসছিলেন। চল্লিশ পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের অনুপ্রেরণায় এই বিষয়ে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। ১৯৪৩ সালে পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর ভাষণে ('সভাপতির অভিভাষণ' *পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য*, প্রথম প্রকাশ– *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৩৪) ভাষা সংস্কারের প্রতি সংসদকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ সম্মেলনে "মূল সভাপতির অভিভাষণ" এ (*মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১) আবুল মনসুর আহম্মদ ও ভাষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। উক্ত সম্মেলনের ভাষা বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনের সভাপতি তদানীন্তন পুলিশ বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আবুল হাসনাৎ সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় ও পরে বই আকারে বর্ণমালা সংস্কার, বানান সংস্কার এবং ব্যাকরণ সরলীকরণ এই তিন পর্যায়ে বাংলা ভাষা সংস্কারের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা উপস্থিত করেন। স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং তার বাস্তব উপযোগিতা সম্পর্কে সংস্কারকের ভূমিকা এখানে নেহাতই নেতিবাচক এবং পাঠসংকোচনই ছিল তাঁর ব্যাকরণ সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট। সংযুক্ত বর্ণ বাদ দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে হসন্ত ব্যবহার করে তিনি উচ্চারণের সঙ্গে বানানের যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন [যেমন, 'আমার পুরশ্তাবিত শংশ্কার প্রনালী .....' ইত্যাদি] তা ছিল সত্যই গুরুতর।

৫.১ ভাষা সংস্কারের প্রসঙ্গে এ সময় পত্র পত্রিকার পাতায় বেশকিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে একশ্রেণীর প্রবন্ধে সাধারণভাবে বাংলা ভাষা সংস্কারের এবং বিশেষভাবে আবুল হাসনাৎ এর সংস্কারের অনুকূলে মতামত জ্ঞাপন করা হয়। মীজানুর রহমান তাঁর 'বাংলাভাষার কথা' প্রবন্ধটিতে (*দৈনিক আজাদ*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০) আবুল হাসনাৎ এর প্রস্তাব শুধু সমর্থনই করেন নি বরং মত প্রকাশ করেন পরিবর্তনের মাত্রা আরও বেশি হলেই ভালো হত। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তাঁর 'বাংলা স্বরযোগ ও বানান' প্রবন্ধে, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী তাঁর 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধে (*দৈনিক আজাদ*, ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৪) কম বেশি আবুল হাসনাৎ এর প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

৫.২ কেউ কেউ আবার আরবী লিপি প্রবর্তনের প্রয়াস প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেও ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কারের প্রতি ঝুঁকেছেন। এম. এ. বারী এম. এ আমাদের ভাষা ও বর্ণমালা সমস্যার সমাধান

প্রবন্ধে (*মাসিক মোহাম্মদী*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০) ভাষা সংস্কারের অনুকূলে মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন–

যদি বাংলা শিক্ষা করা কষ্টসাধ্যই থাকিয়া যায়, আর তদ্দরুণ যদি মুসলমানরা উর্দুর দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে বা আরবী অক্ষর গ্রহণ করে তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে না।

৫.৩ প্রস্তাবিত সংস্কারের বাইরে নতুন কিছু বিষয়ে মতামতও পাওয়া গেছে এ সময়। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'বাংলা ভাষার সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাওগাত মাঘ, ১৩৫১) বিদেশী পারিভাষিক ও অপারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরির ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা রয়েছে (যেমন editor, secretary এই দুই ইংরেজী শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ 'সম্পাদক') তার সমাধান কামনা করেন। আশকার ইবনে শাইখের 'ভাষার উপর জুলুম' প্রবন্ধে (*সৈনিক* ২৫শে মার্চ, ১৯৫১) আরবী ফারসী শব্দের বাংলায় প্রচলিত বানানের পরিবর্তে এগুলোকে নতুন ধরনের বানানের মাধ্যমে (যেমন, 'হাতিয়ার' না লিখে 'হাৎইয়ার' লেখা) মূলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার সমালোচনা করেন।

৫.৪ এর মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে ১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রস্তাব 'বাংলা বানান সংস্কার, পরিভাষা সংকলন, বাংলা অভিধান রচনা এবং বাংলা ব্যাকরণ সম্পর্কে বিবেচনার জন্য পূর্ববাংলা সরকারকে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের অনুরোধ' জানানো হয়েছিল। অবিলম্বে (১৯৪৯ সালের ৮ই মার্চ) পূর্ব বাংলা সরকার মৌলানা মোহম্মদ আকরাম খাঁকে সভাপতি করে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি নিয়োগের ঘোষণা দেয়। বিস্তারিত বিচার বিবেচনার পর ১৯৫০ সালের ৭ই ডিসেম্বর কমিটি কর্তৃক বাংলা ভাষার ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়। ১. বাংলা ভাষার সামগ্রিক আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে, ২. বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে, ৩. বাংলা বর্ণমালা বানান পদ্ধতি ও লিপি প্রসঙ্গে, ৪. বিদেশী ভাষা থেকে নতুন শব্দ তৈরি ও পরিভাষা প্রণয়নের পদ্ধতি প্রসঙ্গে এবং ৫. বিদেশী শব্দের বাংলায় প্রত্যক্ষয়ীকরণের নীতিমালা প্রসঙ্গে কমিটি যে সংস্কার প্রস্তাব করে আবুল হাসনাৎ এর সংস্কারের চাইতে তা কোন অংশে কম গুরুতর ছিল না। সংস্কারকৃত পূর্ববঙ্গের এই ভাষাটিকে 'সহজ বাংলা' এই নামে অভিহিত করা হয়েছিল।

৫.৫ এসকল সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত না হয়েও অনেকে বাংলা ভাষার কিছু না কিছু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। আবুল হাসনাৎ এর ১৭ পৃষ্ঠার পুস্তিকার জবাবে একই নামে ৪৪ পৃষ্ঠার অপর একটি পুস্তিকা রচনা করে ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক আবুল হাসনাৎ এর সংস্কার প্রস্তাবের তীব্রভাষার সমালোচনা করেছিলেন এবং সকল প্রস্তাবই বলতে গেলে বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনিও এই রচনায় স্বীকার করেছেন, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার অসম্ভব ও অনুচিত নয়। মুহম্মদ ফেরদাউস খাঁন, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখও

এই ভাষা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের শরীক না হয়েও কিছু না কিছু পরিমাণ সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন।

৫.৬ তবে কেউ কেউ ভাষার কোন প্রকার সংস্কার সম্ভব নয় বলেও মত প্রকাশ করেছেন। আবুল ফজল তাঁর এক প্রবন্ধে (*সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্র*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮) বলেন–

ভাষার evolution ঘটে, বিবর্তন হয়, জীবন তথা
সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গেই তা জড়িত।

আহম্মদ শরীফ ও তাঁর 'দু'র্দিন' প্রবন্ধে সকল প্রকার সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন এই বলে যে এগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

৫.৭ সমসাময়িককালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'সোজা বাংলা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে (*সৈনিক* ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৫) ভিন্ন উদ্দেশ্যে এক প্রকারের সোজা বাংলার প্রস্তাব করেন। সোজা অক্ষর, সোজা বানান এবং সোজা ভাষা–এই তিনটি মূল সূত্রের ভিত্তিতে ইংরেজী এর অনুকরণে পরিকল্পিত এই প্রস্তাব নিরক্ষর জনসাধারণকে সহজে ভাষাজ্ঞান দেবার জন্য উল্লেখ করা হয়। এই রীতিতে সকল বানান ধ্বনিমূলক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

৬. 'পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটি' (East Bengal Language Committee) পরিচালিত জরীপ কাজে তাদের বিলিকৃত প্রশ্ন মালায় একটি প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রশ্নটির প্রথম অংশ হচ্ছে–

বর্তমান বাংলাভাষার লেখ্যরীতির বিশৃঙ্খলার (diversity) পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি মনে করেন বাংলাভাষার জন্য একটি আদর্শ রীতির উদ্ভাবন করা উচিত হবে।

জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, ৩০৪ জন মতামত প্রদানকারীর মধ্যে এই প্রশ্নের পক্ষে ২২২ জন এবং বিপক্ষে ৫৭ জন ভোট দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এরই পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ ফেরদাউস খান তাঁর 'পূর্বপাকিস্তানের ষ্ট্যান্ডার্ড বাংলা' আলোচনায় (*মাসিক মোহাম্মদী*, পৌষ ১৩৫৬) পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র আদর্শরীতির প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিভাগ পূর্ব আমলের প্রচলিত আদর্শরীতিই আমাদের মেনে নেয়া উচিত। এইভাবে পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র আদর্শরীতির প্রশ্নটি সাহিত্যিকদের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হয়ে দেখা দেয়।

৬.১ এ বিষয়ে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন তাঁর 'মাশরেকী পাকিস্তানের ভাষার স্বরূপ' প্রবন্ধে (*মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ, ১৩৫৬) পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বাকরীতির মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র আদর্শ লেখ্যরীতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মত প্রকাশ করেন, যে সমস্ত পূর্ববঙ্গীয় শব্দকে পশ্চিমবঙ্গীয় আদর্শরীতির বিচারে slang এর পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো নতুন আদর্শ লেখ্যরীতির গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হতে পারে। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করার প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষার 'শব্দসম্ভার, প্রকাশভঙ্গী,

বিশিষ্ট অর্থব্যঞ্জক শব্দ সমষ্টি বা idiom অভিধান, ইহার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি'র পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জ্ঞাপক একটি অভিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রবন্ধকার এই অভিধানের অঞ্চল বিশেষে শব্দরূপের যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। [পরবর্তীকালে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ যে আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন করেছেন তাতে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনের উপর্যুক্ত মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে]। ফেরদাউস খানের প্রাগুক্ত প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে একই শিরোনামে মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম একটি প্রবন্ধ (*মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৫৬) প্রকাশ করেন। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে এ বিষয়টি আলোচিত হয়। এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন আজহারুল ইসলাম ('পাক বাংলা ভাষার লেখ্য ও কথ্যরীতি' *মাসিক মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৬৫)। এ অনুষ্ঠানেই প্রদত্ত আবুল মনসুর আহমদের বক্তৃতা সবচাইতে বক্তব্য সমৃদ্ধ ('পাক বাংলার কালচার ও ভাষা' *মাসিক মোহাম্মদী*, আষাঢ়, ১৩৬৫)। তিনি এতে পূর্ববাংলার ষ্ট্যান্ডার্ড ভাষার একটি বিস্তারিত রূপরেখা অংকন করেন। বাংলা ভাষার বর্তমান আদর্শ সাহিত্যিক চলিতরীতির সঙ্গে 'পাক্ বাংলা'র ('কেতাবী বাংলা') একটি মডেল গদ্যাংশের সঙ্গে আদর্শ পুনর্লিখিতরূপ পাশাপাশি তুলে ধরেন। তার '*পাক বাংলার কালচার*' (১৯৬৬) গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য 'পাক বাংলার ভাষা, পরিচ্ছেদে সংযোজিত হয়। আবুল মনসুর আহমদের অন্যান্য সৃষ্টিশীল ও মননশীল রচনার ভাষায় তাঁর এই ভাষাচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে।

৭. উপরে বাঙালি মুসলমানের ভাষা সচেতনতার যে সকল ধারার আলোচনা হল, তার সিংহভাগই সমকালীন রাজনীতি দ্বারা অনুকূল কিংবা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত। এই সমস্ত প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার অভাবে চিন্তাবিদদের বস্তুনিষ্ঠতা অপেক্ষা ভাবাবেগের পরিচয় বেশী ফুটে উঠেছে। ভাষা সচেতনতার আর একটি ধারা ষাটের দশক থেকে প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গবেষকদের হাতে বিকাশ লাভ করেছে। তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ভাষা শাস্ত্রের নানা শাখায় বিস্তৃত এ সকল রচনা লেখকের বৈজ্ঞানিক যুক্তি বোধে সমৃদ্ধ। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশী, ডঃ কাজী মুহম্মদ ওয়াহিদুল্লাহ্, ডঃ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রমুখ এই ধারার লেখক। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশীর সকলস্তরের বাংলাভাষার প্রচলন ও অন্যান্য ভাষা সমস্যার প্রকৃত সমাধান এই ধারার পরবর্তীকালের ভাষাসচেতন গবেষকদের হাতে আসবে বলে বিশ্বাস করা যায়।

স্থানীয় সাহিত্যে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষ

আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ ও
ডঃ নূরুল হোসেন চৌধুরী

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুর্ভিক্ষ একটি নিয়মিত ঘটনা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ভারতবর্ষও স্মরণাতীত কাল থেকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল।[১] অতীতে বাংলায়ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। কিন্তু পূর্বের তুলনায় ঔপনিবেশিক আমলেই বাংলা সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।[২] মূলতঃ ব্রিটিশদের ভূমি রাজস্বনীতি ও শিল্পনীতি ছিল এর জন্য দায়ী।[৩] এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৩ সালেও বাংলায় আর একটি মহাদুর্ভিক্ষ (Great Famine) সংঘটিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।[৪] বাংলার অন্যান্য জেলার মত রংপুরেও এই দুর্ভিক্ষ আঘাত হানে এবং রংপুরে এর তীব্রতা বেশী ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত দুর্ভিক্ষের উপর প্রকাশিত সরকারী[৫] ও বেসরকারী[৬] রিপোর্ট, বই-পুস্তক[৭] এবং গবেষণাকর্ম[৮] থেকে দুভিক্ষ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায়। তবে প্রাপ্ত এ সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী নথিপত্রের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরে প্রচলিত বিভিন্ন গান, কবিতা, ছড়াতেও রংপুরের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ বিংশ শতাব্দীর একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। আজ থেকে মাত্র ৫০ বছর পূর্বে এই দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষদর্শী অনেক প্রবীণ ব্যক্তির সাক্ষাত এখনো পাওয়া সম্ভব। যাদের নিকট থেকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের সাথে দুর্ভিক্ষের সময় প্রচলিত বিভিন্ন গান, কবিতা, ছড়া সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া যায়। প্রাপ্ত এ সমস্ত গান, কবিতা ছড়া যেমন সাহিত্যের উপাদান তেমনি এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বও কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে দুর্ভিক্ষের সময় প্রচলিত এবং প্রাপ্ত গান, কবিতা ও ছড়াসমূহের অধিকাংশই আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়ায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের সামগ্রিক বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এগুলো ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুতঃ দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে গান, কবিতা ও ছড়ার সমন্বয়ে রংপুরে যে আঞ্চলিক লোকজ সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল তা থেকে রংপুরের দুর্ভিক্ষের কারণ, ব্যাপকতা কিংবা জনসমাজে দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত লেখকদের দ্বারা এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়ার অধিকাংশ রচিত হলেও এগুলির মধ্যে দুর্ভিক্ষের বিভীষিকার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ায় তৎকালীন জন-সাধারণের মাঝে এর অবদান ছিল ব্যাপক। ফলে আজও দুর্ভিক্ষের সাক্ষী অনেক প্রবীণ ব্যক্তির মুখে এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়া শুনতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে ত্রাণের অর্থ সংগ্রহ ও জনগণকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সচেতন করার অভিপ্রায়ে রংপুরে একাধিক

সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল।[৯] উক্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সভা-সমিতি, হাট-বাজারসহ বিভিন্ন লোকালয়ে দুর্ভিক্ষের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত বিভিন্ন গানও স্থানীয় লোকজ সংস্কৃতির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছিল। যা দুর্ভিক্ষের নানাবিধ বিষয় জানার ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অংশ। কিন্তু সম্পূর্ণ, আংশিক বা খানিকটা বিকৃতরূপে প্রাপ্ত এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়াকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন গবেষণা কর্মের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। দুর্ভিক্ষের তথ্য সম্বলিত এসকল গান, কবিতা, ছড়া দিন দিন লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে এ সব গান, কবিতা ও ছড়াসংগ্রহ করা এবং তার গুরুত্ব নিরূপন করা অত্যন্ত জরুরী। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা কিছু গান, কবিতা এবং ছড়া সংগ্রহ করেছি। সেগুলিতে ১৯৪৩ এর রংপুরের দুর্ভিক্ষের যে চিত্র বর্ণিত আছে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

(ক) দুর্ভিক্ষের কারণ সম্বলিত গান, কবিতা, ছড়াঃ

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে চোরাকারবারী ও মজুতদারী ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়ে থাকে। তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী স্বয়ং স্বীকার করেছিলেন যে, বাংলায় চালের কোন অভাব ছিলনা, সমস্যার মূলে ছিল মজুতদারের গোপন মজুদ।[১০] তাছাড়া বাংলায় অবস্থানরত প্রায় ৩০ লক্ষ সৈন্যের জন্যও সরকার খাদ্য মজুদ করতে থাকে।[১১] এভাবে একদিকে ব্যবসায়ীদের অন্যদিকে সরকারীভাবে খাদ্য মজুদ করার ফলে বাজারে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। তখন মজুতদাররা কালোবাজারীতে অধিক দামে চাল বিক্রি শুরু করে। মূলত বিভিন্নভাবে সম্পদ সরিয়ে রাখার ফলে দুর্ভিক্ষ তীব্র আকার ধারণ করে।[১২] সে সময় রংপুরে প্রচলিত গানেও এই জাতীয় চিত্র পাওয়া যায়-

ভাত পায়না কাপড় পায়না
ও চাষী করে হায়রে হায়
মজুতদারে গাঁয়ের ধান
লুটে নিয়ে যায়
চাষী ভাই[১৩]

... ...

আবার অন্য একটি গানে বলা হচ্ছে-

... ...

চাষার অক্ত[১৪]পানি করিয়ে[১৫] দেশে হইল
সোনার ধান
সেও ধান লইয়া যায় তোমার দুষ্ট
গবর্ণমেন্ট।[১৬]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে মেদিনীপুরে সংঘটিত সাইক্লোন এবং রংপুরসহ বাংলার অন্যান্য অংশে বিরাজমান খরাকেও দায়ী করা হয়।[১৭] কেননা উভয় কারণেই জান-মালসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় তীব্র খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। যা দুর্ভিক্ষ সংঘটনে সহায়তা করে। দুর্ভিক্ষের এরূপ পটভূমির বিবরণও গানে পাওয়া যায়–

তেরশ পঞ্চাশ সালে আইলো খরা আর বান
ঘরবাড়ী সউগ[১৮] গেল পড়ি
ডুবি গেল ধান।
কুলাইগাছি[১৯] আর ঘাগারচর[২০]
এর ভেতরে হাহাকার বাপ
নন্দীপাড়ার[২১] নাই সন্ধান
... ...
মেদিনীপুরোত বান হায়রে অমপুরোত[২২] খরা
জমি-জিরাত[২৩] সউগ জ্বলি গেইছে
হামরা ঘাটের মরা।[২৪]
... ...

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকেও ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের অপর একটি কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়।[২৫] দুর্ভিক্ষ এবং বিশ্বযুদ্ধ একই সঙ্গে চলছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে জাপানের কাছে বার্মার পতন হওয়ায় বার্মা থেকে বাংলায় চাল আমদানী বন্ধ হয়ে যায়।[২৬] এর ফলে বাংলা তীব্র খাদ্য সংকটের মুখে পড়ায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পথ সহজ হয়। সে সময়ে রংপুরে প্রচলিত একটি ছড়ায় এ জাতীয় ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।–

আকাশ দিয়া জাহাজ যায়
ক্ষাতের[২৭] ধান সউগ পুড়ি যায়
তারে বাদে[২৮] আকাল হয়
তামান[২৯] মাইনষে মরি যায়।[৩০]

(খ) দুর্ভিক্ষের বিবরণ ও ফলাফল সম্বলিত গান, কবিতা, ছড়াঃ

দুর্ভিক্ষের সময় টাকার (নগদ অর্থ) প্রচন্ড অভাব দেখা দিয়েছিল। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য বাজারে বিক্রি করার মত উদ্বৃত্ত কৃষি পণ্য কৃষকের হাতে ছিল না।[৩১] ফলে বাজারে যদিও বা কিছু পাওয়া যেত টাকার অভাবে তা ক্রয় করা কৃষকের পক্ষে সম্ভব হতো না। প্রাপ্ত একটি ছড়ায় এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়–

দ্যাশত[৩২] আইলো এমন আকাল
হইনো[৩৩] সবায় ট্যাকার কাঙ্গাল
হাট-বাজারোত সগি[৩৪] মেলে
ট্যাকার দেখা কোনটে[৩৫] না পাই।[৩৬]

তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ এতই অসহায় হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মাঝে বিদ্যমান সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ে। যে কারণে বাঁচার তাগিদে স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী-স্বামীকে, মা-সন্তানকে সহজেই পরিত্যাগ করতে কিংবা বিক্রয় করতে পারতো।[৩৭] কোন প্রকার স্নেহ-মমতা বা ভালবাসার বন্ধন এসব কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আর বিক্রিত এ সমস্ত নারীদের দিয়ে জোর পূর্বক দেহ ব্যবসা চালানোর ঘটনাও তখন অবাস্তব ছিল না।[৩৮]

এরূপ বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেও সে সময় গান রচিত হয়েছিল-

... ...
ক্ষুধার জ্বালায় মন পাগলারে
স্বামী বেচাইলে[৩৯] ধনীর ঘরে,
... ...
মুই নারী খাঁও[৪০] দেহ ব্যাচেয়া
ক্ষুধার জ্বালায় মন পাগলারে[৪১]
... ...

খাদ্যাভাব যেমন দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান শর্ত তেমনি খাদ্যাভাব থেকে পরিত্রাণের আশায় প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী সামগ্রী বাধ্য হয়ে বিক্রি করাও অভাবী মানুষের জন্য একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। উঠতি ফসল, জমি, লাঙ্গল, গরু-ছাগল, অভাবী চাষীর স্ত্রীর অলংকার প্রভৃতি দ্রব্যাদি দুর্ভিক্ষের সময় অবাধে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি হয়।[৪২] এর একটাই কারণ তা হলো দুর্যোগের মাঝে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু এত কিছুর পরেও হয়তো শেষ রক্ষা হয় না। প্রাপ্ত গান, কবিতা, ছড়ায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

... ...
বউ এর গলার হাসলি[৪৩] গেল
কাটা-তাবিজ[৪৪] না রহিলো
কোলের শিশু ক্ষুধায় মইলো[৪৫]
বুকের দুধও মিলে না
ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলে মইলামরে
উপায় বলোনা।[৪৬]

এ সম্পর্কে একটি কবিতায় দেখা যায়–

... ...
ভাত তরকাইতো[৪৭] দুরের কতা
কপালোত না জোটে "ফ্যানে"।[৪৮]
হাঁস–মুরগী গরু–বকরী
ব্যাচেয়া[৪৯] কন্নো[৫০] শ্যাষ
পাশ্চাইশ–সালী আকালত বুজিল[৫১]
বিব্যান[৫২] হ্যায় দ্যাশ।[৫৩]
... ...
আবার একটি ছড়ায় বলা হচ্ছে–
খাবার তরে ব্যাচানু[৫৪] জমি
আরো ব্যাচানু নাঙ্গল[৫৫]
সোনা–দানা তামান[৫৬] ব্যাচেয়া
ব্যাচানু গরু–ছাগল।[৫৭]

দুর্ভিক্ষের সময়ে তীব্র খাদ্য সংকটে পড়ে মানুষ কচু, কলা গাছের ভিতরের নরম অংশ গাছের লতা–পাতা প্রভৃতি অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে কলেরা, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন মহামারীতে আক্রান্ত হয়।[৫৮] এর কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত খাদ্যভাবে শারীরীক দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।[৫৯] মহামারীতে আক্রান্ত এ সমস্ত মানুষের অধিকাংশই রাস্তা–ঘাটে পড়ে মরে থাকতো এবং প্রয়োজনীয় সৎকারের অভাবে পশু–পাখির খাদ্যে পরিণত হয়েছিল।[৬০] এটাই ছিল ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের প্রাত্যহিক ঘটনা। দুর্ভিক্ষের এরকম মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিচ্ছবিও সে সময় রংপুরের গান ও কবিতায় পাওয়া যায়–

... ...
মেলে না হায় খাদ্য খাবার
প্যাটের[৬১] ভোকে[৬২] কচুও সাবাড়
কলেরা ওগ[৬৩] ধরিই শ্যাষে[৬৪]
লাখো মানুষ মইল।
... ...
মরা লাশের খোঁজে বেড়ায়
শগুন[৬৫] কাউয়া[৬৬] উড়ি
ফকির ফকর‍্যানির[৬৭] দ্যাকলে দশা
মনটা যায় পুড়ি।[৬৮]

একটি কবিতায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

... ...
না খায়্যা হায় মরে মানুষ
আস্তা–ঘাটত[৬৯] পড়ি
কুকুর শিয়াল খায় যে তামাক[৭০]
সই যে ক্যামন করি।

... ...
কাফন কেনার অভাবেই মরাক[৭১]
ন্যাংটায়[৭২] খাইলোতে[৭৩] শোতে
উত্তর–সিথানী[৭৪] করি হায়রে
থোয় যে তাক শোতে।[৭৫]

... ...

কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের মত দুর্ভিক্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সে সময় ম্যালেরিয়াও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৭৬] ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিষেধক হচ্ছে কুইনাইন। কিন্তু সে সময় বাজার থেকে কুইনাইন উধাও হওয়ায় বাজারে এর (কুইনাইন) চরম দুর্মূল্য দেখা দেয়।[৭৭] এর ফলে কুইনাইনের অভাবে ব্যাপকভাবে ম্যালিরিয়া রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। ম্যালেরিয়া রোগ, কুইনাইন সংকট এবং এই রোগে মৃত্যুর সত্যতার তথ্যও একটি গানে উপস্থাপিত হয়েছে।–

ম্যালেরিয়ার একটিরে শিশু
প্রাণে বুঝি মরে
বাংলাদেশে কুইনাইন নাই ভাই
ডাক্তারে কি করে?[৭৮]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বছর ছিল সামগ্রিকভাবে বাংলার জন্য একটি সামাজিক অধঃপতনের বছর।[৭৯] তীব্র অভাব এবং অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যে মজুতদারী, কালোবাজারী, নারীদেহ ব্যবসা প্রভৃতির মত নানাবিধ অসামাজিক কার্যকলাপ দেখা দিয়েছিল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে আরো যোগ হয়েছিল পেশার পরিবর্তন। অনেকেই অভাবের প্রচন্ডতায় বাঁচার তাগিদে চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে ঘরের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত করে স্ত্রীকে অন্যের বাড়ীতে পেশার সাথে সম্পর্কহীন বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করতো। এক্ষেত্রে নিয়তিকে দোষারোপ করা ভিন্ন হয়তো কোন গত্যন্তর ছিল না। নিম্নের গানটিতে এর স্বপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায়–

... ...
নাঙ্গল, জোয়াল কাস্তে ছাড়ি

মাউক[৮০] ভাতারে[৮১] বান্ধে বিড়ি
তবুও হায়রে খাবার নাহি পায়
নিয়তি[৮২] তোর বিচার দেখে
মনটা আমার খাট[৮৩] হয়ে যায়
পঞ্চাইশ সালে আকালত বুঝি
জানটা হামার[৮৪] যায়।[৮৫]

... ...

দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষার জন্য বসতভিটা ত্যাগ করে খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যাবার ঘটনাও দুর্ভিক্ষের সময়ে ঘটেছিল।[৮৬] অন্ন, বস্ত্রের অভাবে পড়ে নিজ এলাকা ত্যাগের দৃষ্টান্ত নিম্নের ছড়াটিতে পাওয়া যায়–

একদিকে নাই খাবার ভাইরে
আর এক দিকে নাই বস্ত্র
খাবার খোঁজে হাটোরে[৮৭] ভাই
ভুটান[৮৮] দেশে যাই।[৮৯]

ক্ষুদ্র কৃষক, দিন মজুর এদের মত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ দুর্ভিক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।[৯০] ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণীর মধ্যে মৃত্যুর হারও ছিল বেশী। যে কারণে দুর্ভিক্ষে মজুর শ্রেণীর সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় দুর্ভিক্ষের পর প্রয়োজনীয় দিনমজুর বা কৃষি শ্রমিক পাওয়া যেতনা। একটি গান* থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তবে এছাড়াও গান প্রদানকারী এই গানের অন্য কোন একটি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন যে, 'ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যকদ্ধভাবে দাঁড়াবার জন্য হিন্দু–মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার নিদর্শন হিসাবে লেখক তার গানে দু'জন হিন্দু ও মুসলিম কৃষকের নাম একত্রে এনেছেন'–

... ...
গায়ের চাষী পাঁচু, রহমান
তারা তো মাঠে কাটে নাকো ধান
এক সাথে সবে চলে
সোনার বাংলা হলোরে শ্মশান।[৯১]

* সম্পূর্ণ গানটি পাওয়া যায়নি।

তখন খাদ্যের সাথে ছিল বস্ত্রেরও তীব্র সংকট। সরকারী আমলাদের সহায়তায় মুনাফাখোররা কাপড়ের কারবারকে কুক্ষিগতকরে জনগণের দুর্দশাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল।[৯২] পরবর্তীতে এক সময় সরকার রেশনে কাপড় প্রদানের ব্যবস্থা করে। তবে এই কাপড় দেশী কাপড়ের তুলনায় দৈর্ঘ্যে ছিল কম। প্রাপ্ত একটি গান থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত রেশন ব্যবস্থার সত্যতা, কাপড়ের পরিমাপ এবং প্রচলিত সামাজিক প্রথার পরিচয় মেলে–

আরে ওরে কন্টোলের[৯৩] কাপড়
কি আগুন[৯৪] নাগালুরে[৯৫]
নয়া জামাই মোর
দেখলে ঢালুয়া[৯৬] খোপা।[৯৭]

দুর্যোগকালীন সময়ে সরকার খাদ্যাভাবগ্রস্ত মানুষকে খাওয়ানোর জন্য বিভিন্ন জেলায় লঙ্গরখানা চালু করেছিল।[৯৮] প্রত্যহ একবেলা করে এখানে ডাল–চালের খিচুড়ি খাওয়ানো হতো। ফলে এখানে খাদ্যের আশায় অভাবী মানুষরা বিপুল সংখ্যায় ভীড় করতো। জাত–পাতের এবং মানুষে পশুতে ভেদাভেদ অভাবের তাড়নায় মানুষ ভুলে গিয়েছিল। লঙ্গরখানার এ ধরণের পরিবেশ–পরিস্থিতির সমর্থনেও গান ও ছড়া পাওয়া যায়–

... ...
মাইনষে[৯৯] কুকুরে নাই যে তফাৎ
নঙ্গর খানাত[১০০] পাতায় হাত
খিচড়ি নিয়া কাড়াকাড়ি
মরিল[১০১] ধাক্কায় ছইল।[১০২]
হায়রে কাল পঞ্চাশ সাল
এ্যামন ক্যানে[১০৩] হইল[১০৪]
... ...
লঙ্গরখানা সম্পর্কে একটি ছড়ায়* বলা হচ্ছে–
কোথায় যাবো কোথায় পাবো
হায়রে খাদ্যখানা
ইলিফ[১০৫] ক্যাম্পেও জায়গা যে নাই
সেথাও যাইতে মানা।
ইলিফ ক্যাম্পে অনেক মানুষ
গিজির গিজির[১০৬] করে[১০৭]
... ...

* সম্পূর্ণ ছড়াটি পাওয়া যায় নি।

দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চলছে। সেই সাথে চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এ সময় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টিসহ অন্যান্য দলগুলি দুর্ভিক্ষের প্রশ্নে স্বতন্ত্র অবস্থানে ছিল।১০৮ অথচ সে সময় অনাহার, বস্ত্র সংকট, মজুতদারী এবং মহামারীতে অজস্র মানুষ মৃত্যুবরণ করতে থাকে। ফলে এ সময় প্রয়োজন ছিল সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা করা। আরও প্রয়োজন ছিল চাষীদের চেতনা বৃদ্ধির। এরূপ অবস্থার উপর কৃষক সমিতি সে সময় গান বেধেছিল।

ছড়াটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি।

তোরা শোনরে দেশের চাষী
তোরা শোনরে শহরবাসী
ফসল আবাদ করলো যারা
লাখে লাখে মরলো তারা
আমলাতন্ত্র মজুতদারে
করলো মোদের শ্মশানবাসী
... ...
অন্ন থাকতে অন্নহারা
হলোরে দেশবাসী
... ...
গুদামেতে কাপড় থাকে
কাপড় পায়না দেশের লোকে
বস্ত্রভাবে মান রাখা দায়
ভদ্রলোক আর চাষীর
... ...
আজও যদি থাকিস বসে
বাঁধন আরো আঁটবে কষে
দেশ দরদীআয় ছুটে আয়
থাকিস নে আর বসে
বুক বেঁধেআজ দাঁড়াও সবে
বন্ধ করো এই সর্বনাশী।১০৯
... ...
আবার অন্য একটি গানে বলা হচ্ছে–
জাগো জাগো জাগো ও ভাই
ঘুমিয়ে অচেতন থেক না আর
অনাহার আর মহামারী মিলে
সোনার বাংলা হলো ছারখার।

... ...
কোথায় কংগ্রেস বাংলার
কোথায় লীগ বাংলার
কোথায় স্বরাজ সাধনা তোমার
দেশ যদি আজ হয় ছারখার
কে লড়িবে রণ স্বাধীনতার[১১০]
... ... ।

উপসংহারঃ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলা অঞ্চল ঐতিহ্যগতভাবে সবসময়ই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও সৌন্দর্য্য, অনুকুল আবহাওয়া, জনসাধারণের অনাড়ম্বর জীবন যাপন পদ্ধতি পর্যটক ও ভ্রমন পিয়াসীদের যেমন আকর্ষণ করেছে তেমনি লুটেরা, দস্যু ও দেশজয়ী নৃপতিগণ এখানে হানা দিয়েছে নানা সময়ে। এমনিভাবে ঔপনিবেশিক শাসন–শোষণ, সামন্ত–জমিদারদের অত্যাচার–লুন্ঠনের পাশাপাশি খরা, বন্যা, জলোচ্ছাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বাংলা পরিণত হয়েছে দুর্গত তথা দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে। বিনিময়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছে অসংখ্য মানুষ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ে রচিত অনেক গান, কবিতা, ছড়া থেকেও এর প্রমাণ মেলে। মানুষ অর্ধহারে, অনাহারে ধুকে ধুকে মরার প্রাক্কালেও ক্ষণিক দুঃখ কষ্ট লাঘবে এ সকল গান, কবিতা, ছড়া রচনা করেছিল। তৎকালীন এক ঘোরতর আর্থ–সামাজিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়া রচিত হওয়ায় এসকল লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে রংপুরের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত একটি স্বরূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আলোচিত গান, কবিতা ও ছড়ায় দুর্ভিক্ষের যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায় যে, খরা, মজুতদারী ব্যবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা প্রভৃতি কারণে যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি তার ফলে অনাহারে, মৃত্যু, মহামারী, লঙ্গরখানা, খাবার নিয়ে মানুষে পশুতে কাড়াকাড়ি, পশু–পাখির বেওয়ারিশ লাশ ভক্ষণ, বসতভিটা ত্যাগ করা, প্রভৃতি দুর্ভিক্ষ সময়ের রংপুরের একটি মর্মান্তিক অথচ প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মন্বন্তর সাধারণ মানুষের জীবনে প্রচন্ড দুর্ভোগ ও দুর্দশা সৃষ্টির পাশাপাশি তীব্র অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকটের ফলে সে সময় কালোবাজারী, মুনাফাখোর, নারী ব্যবসায়ী তথা অর্থলোভী একটি সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়, যা দুর্ভিক্ষকে দীর্ঘায়িত করেছিল। ফলে সমাজে মানুষের প্রচলিত জীবনধারা ও মূল্যবোধের আদর্শ ভেঙ্গে সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের বীজ রোপিত হয়েছিল। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষের সামগ্রিক বিষয়ের একটি চিত্র এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়ায় পাওয়া যায়– যার ধারাবাহিকতা ইতিহাসেও মেলে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এ সমস্ত গান, কবিতা, ছড়া লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে যাবার উপক্রম হলেও এগুলি সংরক্ষণের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা এখনো গৃহীত হয়নি। এগুলি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে লোকজ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পাশাপাশি স্থানীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাসও যে সমৃদ্ধশালী হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

তথ্য নির্দেশঃ

১. B. M. Bhatia, *Famines in India: A Study in Some Aspects of The Economic History of India (1860- 1945)*, (New York: Asia Publishing House, 1963), p. 7, f. n.15.

২. ২৯৮ খৃঃ পূর্বাব্দ থেকে ১৯৪৪ খৃঃ পর্যন্ত ভারতে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের তালিকায় দেখা যায় যে, বৃটিশরা বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণের (১৭৬৫) পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মাত্র ৩টি দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বৃটিশদের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মাত্র পৌণে দু'শ বছরে বাংলায় ৯টি বড় ধরণের দূর্ভিক্ষ হয়েছিল। এ সম্পর্কে দেখুন Paul R. Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44*, (New York: Oxford University Press, 1982), Appendix A. (Check List of Indian Famines From 298 B. C. To A.D. 1944), pp. 276-284.

৩. বিস্তারিত দেখুনঃ Romesh Dutt, *Economic History of India, Vol. I. & II.* (London: Routledge, 1950).

৪. Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।

৫. বিস্তারিত দেখুনঃ By Sir John Woodhead (ed), *The Famine Inquiry Commission Report*, (Delhi: Manager of Publications, 1945); Government of Bengal, Bengal Revenue Department, *A Scheme for Relief and Rehabilitation in Bengal*, (Calcutta: Bengal Covernment Press, 1944); Sir Theodore Gregory (ed.), *Report of the Foodgrain Policy Committee*, (Delhi: Manager of Publications. 1944).

৬. বিস্তারিত দেখুনঃ P. C. Mahalanobis, 'The Bengal Famine: The Back-ground and Basic Facts," *Asiatic Review*, Vol. 42 (January 1946), 310-18; K. P. Chattopadhyay, "Famine and Destitution in Rural Bengal" *Science and Culture, Vol II*, (November, 1945); 228-39; Bimal Chandra, Bhattacharaya, 'Extenl of Starvation Among the Landless Workers of Bengal *Science and Culture, Vol. II*, (May, 1946), 404-51.

৭. Kali Charan Ghosh, *Famines in Bengal, 1770-1943*, (Calcutta: Indian Associated Publishing Company, 1944); B. M. Bhatia, op. cot. ;T. K. Dutt, *Hungry Bengal*, (Lahore: Indian Printing Works, 1944); T. G. Narayan. *Famine Over Bengal*, (Calcutta: The Book Company Limited, 1944).

৮. Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত*।

৯. বিস্তারিত দেখুন, সুধীর মুখোপাধ্যায়, নৃপেন ঘোষ, *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলন ও পাটি*, (কলিকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮৫), পৃঃ ৭৫, ৭৬, সুসান্ত দাস, *ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, (কলিকাতাঃ প্রাইমা পাবলিশন ১৯৮৯), পৃ. ১৯৪-২০১।

১০. Paul R. Greenough *প্রাগুক্ত*, পৃঃ ১২২।

১১. Bowdhayn Chottophadhay, *Notes Towards An Understanding of Bengal Famine of 1943*, (Tranjactions, 1981), pp. 119-144.

১২. বদুরুদ্দীন উমর, *চিরস্তায়ী বন্দোবস্তে বাংলার কৃষক*, (কলকাতাঃ চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৭৬), পৃঃ ৫০।

১৩. লেখক/বাঁশী বাদিয়া, লক্ষীটারী, গঙ্গাচড়া, রংপুর। গানটি প্রদান করেছেন, ছয়ের উদ্দীন আহমদ, বয়স-৭৪, পেশা-কৃষি, গ্রামঃ গোপালপুর, পোঃ শ্যামপুর, থানা-বদরগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর। তারিখ, ৮/৭/৯৪ইং।

১৪. 'অক্ত', অর্থ হচ্ছে রক্ত।

১৫. 'করা শব্দকে রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় 'করিরে' বলা হয়।

১৬. গানটি উদ্ধৃত হয়েছে, সত্যেন সেন, *গ্রামবাংলায় পথে পথে*, (ঢাকাঃ কালি কলম প্রকাশনী, ১৩৮৯), পৃ. ৩৮।

১৭. *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭, Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৯৮।

১৮. 'সউগ' এর অর্থ 'সব'।

১৯. এলাকাটি সম্ভবতঃ মেদিনীপুরের।

২০. ঐ।

২১. ঐ।

২২. রংপুরে 'র' এর উচ্চারণ 'অ' করা হয়। যে কারণে রংপুর না উচ্চারণ করে 'অমপুর' বলা হচ্ছে।

২৩. 'জিরাত' অর্থ 'ফসল'।

২৪. গানটির লেখক গান প্রদানকারী নিজে। নামঃ মোঃ রফিক উদ্দীন, বয়সঃ ৭০, পেশাঃ শ্রমিক, গ্রামঃ শিবপুর, পোঃ শ্যামপুর, থানাঃ বদরগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর। তাং-১২.১.৯৫ইং।

২৫. B. M. Bhatia, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৪।

২৬. ঐ। পৃ. ৩২৩।

২৭. 'ক্ষাতের' অর্থ 'মাঠের'।

২৮. 'তারে বাদে' অর্থ 'কারণে'।

২৯. 'তামান' অর্থ 'সকল'।

৩০. লেখক এবং গান প্রদানকারী হচ্ছেন, মোঃ রফিক উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*।

৩১. *Famine Inquiry Commission Report (1945)* *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৩২. 'দ্যাশত' অর্থ 'দেশে'।

৩৩. 'হইনো' বলতে 'হলাম' বুঝতে হবে।

৩৪. 'সগি' অর্থ 'সবকিছু'।

৩৫. 'কোনটে' অর্থ 'কোথাও'।

৩৬. গান প্রদানকারী লেখক নিজেই। নামঃ আঞ্জুমান প্রামাণিক, বয়সঃ ৭০, পেশাঃ ডাক্তার, (সর্প কবিরাজ), গ্রামঃ দূর্গাপুর, থানাঃ আদিতমারী, জেলাঃ লালমনিহাট। তারিখঃ ২১.১.৯৫।

৩৭. বিস্তারিত দেখুন, *Famine Inquiry Commission Report (1945)* প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮, Paul, R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫-২২৫।

৩৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, Paul,R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬-১৫৮, ১৬৮।

৩৯. 'বেচাইলে' অর্থ 'বিক্রয় করা'।

৪০. 'খাঁও' হচ্ছে 'খাওয়ার' আঞ্চলিক রূপ।

৪১. লেখক, বিপিন বর্মন, গঙ্গাচড়া রংপুর। গানটি প্রদান করেছেন, ছয়ের উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

৪২. বিস্তারিত দেখুন Paul,R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫, ১৬৮, ১৯৬-২০৪।

৪৩. 'হাসলি' অর্থ 'গলার হার'।

৪৪. 'কাট-তাবিজ' গলায় পরার জন্য মেয়েদের এক ধরণের অলংকার বিশেষ।

৪৫. 'মইলো' অর্থ 'মারা গেল'।

৪৬. লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। গানটি প্রদান করেছেন ছয়ের উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত।

৪৭. 'তরকাই' হচ্ছে, রান্না করা 'সবজি'।

৪৮. 'ফ্যান' অর্থাৎ 'ভাতের মাড়'। প্রচন্ড অভাবে তখন মানুষ ভাতের বদলে 'ফ্যান' ভিক্ষা করছিল।

৪৯. 'ব্যাচেয়া' অর্থ 'বিক্রয় করা'।

৫০. 'কন্নো' অর্থাৎ 'করলাম'।

৫১. 'বুজিল' অর্থ 'হয়তো', 'এবার ' ইত্যাদি।

৫২. 'বিব্যান' অর্থ 'শুন্য'।

৫৩. কবিতাটি প্রদান করেছেন লেখক নিজে। নামঃ নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ, বয়সঃ ৭৫, পেশাঃ লেখক, মহল্লাঃ নতুন শালবন, পোঃ + থানা ও জেলাঃ রংপুর। তারিখঃ ১০.৭.৯৪ইং।

৫৪. 'ব্যাচানু' অর্থ 'বিক্রয় করলাম'।

৫৫. 'নাঙ্গল' অর্থ 'লাঙ্গল'।

৫৬. 'তামান' অর্থ 'সবকিছু'।

৫৭. লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ছড়াটি প্রদান করেছেন-নামঃ তসলিম উদ্দীন বানিয়া,বয়সঃ ৭৫, পেশাঃ গৃহস্থালী, গ্রামঃ নগর দারোয়ানী, থানা ও জেলাঃ নীলফামারী। তারিখঃ ১০.৮.৯৪ইং।

৫৮. বিস্তারিত দেখুন *Famine Inquify Commission Report (1945),* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২৩, Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩০-২৩৬।

৫৯. *Famine Inquify Commission Report (1945), প্রাগুক্ত,* পৃ. ১২০।

৬০. ধনঞ্জয় রায় (সম্পাঃ), রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা সংগ্রাম, (কলিকাতাঃ রত্না প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃ. ১০১।

৬১. 'প্যাটের' অর্থ 'পেট'।

৬২. 'ভোকে' অর্থ 'ক্ষুধা'।

৬৩. 'শ্যাষে' বলতে 'অবশেষে' বুঝায়।

৬৪. 'ওগ' অর্থ 'রোগ'।

৬৫. 'শগুন' বলতে 'শকুন' বুঝানো হচ্ছে।

৬৬. 'কাকের' আঞ্চলিক রূপ হচ্ছে 'কাউয়া'।

৬৭. 'ফকর‍্যানি' অর্থ 'ভিখারিনি'।

৬৮. গান প্রদানকারী লেখক নিজে। নামঃ নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ, *প্রাগুক্ত।*

৬৯. 'আস্তা-ঘাটত' অর্থাৎ 'পথে-ঘাটে'।

৭০. 'তামাক' বলতে 'মৃতদেরকে' বুঝানো হচ্ছে।

৭১. 'মরাক' অর্থ 'লাশ'।

৭২. 'ন্যাংটায়' অর্থাৎ 'কাপড় ছাড়া', 'উলঙ্গ'।

৭৩. খাইলোত' বলতে 'মাটির গর্ত' বুঝানো হচ্ছে।

৭৪. 'উত্তর সিথানী' অর্থ 'উত্তর দিকে মাথা রেখে শুইয়ে রাখা।

৭৫. কবিতা প্রদানকারী লেখক নিজে। নামঃ নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ, *প্রাগুক্ত*।

৭৬. বিস্তারিত দেখুন, *Famine Inquify Commission Report (1945), প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১-১২২।

৭৭. ঐ, পৃ. ১৩০।

৭৮. গানটি দুর্ভিক্ষের সময় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কর্তৃক রচনা করা হয়েছিল একটি নাটকের জন্য। দেখুন, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ, প্রাগুক্ত। পৃ. ৭৫।

৭৯. বিস্তারিত দেখুন, *Famine Inquify Commission Report (1945), প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭। Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭-১৫৯।

৮০. 'মাউক' অর্থ 'স্ত্রী'

৮১. 'ভাতার' অর্থ 'স্বামী'।

৮২. 'নিয়তি' বলতে এখানে 'সৃষ্টিকর্তা' কে বুঝানো হচ্ছে।

৮৩. 'খাটা' বলতে বোঝানো হচ্ছে 'খারাপ' হয়ে যাওয়া।

৮৪. 'হামার' অর্থ 'আমাদের'।

৮৫. গান প্রদানকারী লেখক নিজে। নামঃ মোঃ রফিক উদ্দীন, *প্রাগুক্ত*।

৮৬. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুনঃ Paul R. Greenough, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৭।

৮৭. 'হাটোরে' অর্থ 'চলো'।

৮৮. 'ভুটান' বলতে এখানে দেশের নামই বুঝানো হচ্ছে। তবে গান প্রদানকারীর মতে, তারা ভুটান নামে একটি দেশ আছে তা জানলেও দেশটির অবস্থান সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেন না। তবে তাদের ধারণা ছিল ভুটান দেশে কোন অভাব নেই এবং সেখানে গেলে তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে। এই ধারণা থেকেই ছড়ায় 'ভুটান' দেশের কথা আনা হয়েছে।

৮৯. লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ছড়াটি প্রদান করেছেন, মোঃ ছাবেদ হোসেন, বয়সঃ ৮৫, গ্রামঃ রতনপুর, পোঃ গুনভরি, থানাঃ ফুলছড়ি, জেলাঃ গাইবান্ধা। তারিখঃ ১৬.৯.৯৫।

৯০. *Famine Inquify Commission Report (1945)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৯১. লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। গানটি প্রদান করেছেন ছয়ের উদ্দিন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

৯২. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন ঃ পিটার কাস্টার্স, (কৃষ্ণা নিয়োগী অনুদিতঃ), তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী (ঢাকাঃ গণসাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৫২-৫৩।

৯৩. 'রেশন' ব্যবস্থাকে রংপুরে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'কন্টোল'।

৯৪. 'আগুন' অর্থ বলতে এখানে 'লজ্জার' কথা বলা হচ্ছে।

৯৫. 'নাগালুরে' বলতে 'বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়া' বুঝাচ্ছে।

৯৬. 'ঢালুয়া' অর্থ 'বড়'।

৯৭. লেখক বাঁশী বাদিয়া, *প্রাগুক্ত* গানটি প্রদান করেছেন। ছয়ের উদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*,

৯৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ *Famine Inquify Commission Report (1945), প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২-৭৫।

৯৯. 'মাইনষে' অর্থ 'মানুষ'।

১০০. 'নঙ্গর-খানাত' অর্থ 'লঙ্গরখানা'।

১০১. 'মরিল' অর্থ 'মারা গেল'।

১০২. 'ছইল' অর্থ 'ছোট্ট বাচ্চা'।

১০৩. 'এ্যামন ক্যানে' অর্থ 'এমন কেন'।

১০৪. গানটি প্রদান করেছেন লেখক নিজে। নামঃ নুরুল ইসলাম কাব্য বিনোদ, *প্রাগুক্ত*।

১০৫. 'ইলিফ' অর্থ 'রিলিফ'।

১০৬. 'গিজির গিজির' অর্থ 'প্রচন্ড ভীড়'।

১০৭. লেখকের নাম পাওয়া যায়নি। ছড়াটি প্রদান করেছেন, তসলিম উদ্দীন বানিয়া, *প্রাগুক্ত*।

১০৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ধনঞ্জয় রায় (সম্পাঃ) প্রাগুক্ত, পৃ. ১, ৬৭-৬৮।

১০৯. লেখক গোপেন রায়, রংপুর। গানটি প্রদান করেছেন ছয়ের উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত, ।

১১০. ঐ।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

লোক প্রশাসন সার
মোহাম্মদ শামসুর রহমান
বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
প্রথম পুর্ণমুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৬৫, মূল্যঃ ৭০.০০ টাকা।

জাতি সংঘের অর্থনৈতিক ও সমাজ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত সরকারী প্রশাসনের কার্য ও প্রকৃতি সম্পৃক্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। এ হ্যান্ডবুক অব পাবলিক অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন–এর বংগানুবাদ করেছেন মোহাম্মদ শামসুর রহমান লোক প্রশাসন সার শিরোনামে। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত গ্রন্থটির পূণর্মূদ্রন হলো সম্প্রতি।

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রশাসনিক কার্যক্রমের ব্যপকতার মতই বিস্তৃত। আরো সুস্পষ্টভাবে অনুবাদকের ভাষায় বলা যায় এ গ্রন্থটিতে "প্রশাসনের তিনটি বিশেষ দিক, যথা সংগঠন কর্মচারী প্রশাসন ও অর্থনৈতিক প্রশাসন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত, সহজ ও সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে।" গ্রন্থের প্রারম্ভেই চারপৃষ্ঠা ব্যাপী নাতিদীর্ঘ উপক্রমনিকাতে গ্রন্থটি রচনার পটভূমি, উদ্দেশ্য এবং পরিধি বর্ণনা করা হয়েছে। জাতিসংঘের কারিগরী সাহায্য প্রকল্পের বিশেষজ্ঞগোষ্ঠী উন্নয়নশীল দেশে কার্যরত অবস্থায় যে সব দেশের প্রশাসন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরী করেন তার ভিত্তিতে এই সার গ্রন্থ তৈরি করা হয়েছে। গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে–"উন্নয়নশীল দেশের লোক প্রশাসন উন্নয়ন কর্মসূচীর মৌল উপাদানের সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য সার গ্রন্থ প্রনয়ন করা হয়েছে।" আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, "যেসব প্রশাসক দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক উন্নতিসাধনের গুরু দায়িত্ব বহন করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। এঁদেরকে উন্নতর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচী ও অগ্রাধিকার নির্ণয়ে প্রতিকুলতা অতিক্রম করতে সাহায্য করা এর উদ্দেশ্য।"

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থটি মূল তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের একমাত্র অধ্যায়ের শিরোনাম, "লোক প্রশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন"। এ অধ্যায়ে মূলতঃ আধুনিক রাষ্ট্রে লোক প্রশাসনের নব প্রকৃতি ও জাতীয় উন্নয়কল্পে তার ব্যাপক ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার অংশ হিসেবে আছে প্রশাসনিক শৈথিল্য, উন্নয়নগামী দেশের প্রশাসনিক সমস্যাবলী, প্রশাসনিক সংস্থার নেতৃত্ব, লোক প্রশাসন ও নাগরিক, লোক প্রশাসন ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়। এক্ষেত্রে আলোচনার মূল বক্তব্য হচ্ছে, আধুনিক লোক প্রশাসন তিনটি দিক থেকে বিশেষায়নের দাবীদার প্রথমতঃ উদ্দেশ্যগত বিস্তৃতি ও উদ্দেশ্যের নবরূপায়ন, দ্বিতীয়তঃ লোক প্রশাসনের কার্যাবলী পরিমান, বৈচিত্র্য ও জটিলতার বিস্তৃতির দিক থেকে এবং তৃতীয়তঃ আধুনিক লোক প্রশাসন পরীক্ষা–নীরিক্ষার স্তর অতিক্রম করে ক্রমবর্ধমান জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একটি সুশৃংখল কর্ম প্রণালী।

এ পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশগুলির লোক প্রশাসনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর বিস্তৃতির ক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের পর্যায়ের সমস্যাগুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা পরিব্যপ্ত হয়েছে লোক প্রশাসন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক মতবাদ ও কার্যপ্রণালী বিষয়ে। এই পর্যায়ে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনার শিরোনাম সংগঠন বিশ্লেষন। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উপাদান সুসংবদ্ধ উপাদান, সংগঠনের শ্রেণী বিভাগ, সংগঠনের নাম ও কার্যবিধিমালা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় মূলতঃ প্রশাসনিক সংগঠন গড়ে ওঠার ধারা, প্রকৃতি, কারণ ইত্যাদি অনুসন্ধানে বিন্যস্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাঠামোর স্বরূপ ও স্বরূপ নির্ধারনে সম্পৃক্ত উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সাংগঠনিক কাঠামোগুলির কার্যাবলী, কার্যাবলীর ধরণ নির্দিষ্টকরণ বিষয়াবলী, প্রশাসনিক কার্যাবলীর বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশাসনিক পদ্ধতি ও উপকরন সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। সরকারী প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য সীমিত সম্পদের সর্বাধিক মিতব্যয়িতার ভিত্তিতে কার্যকর পদ্ধতি সহযোগে রাষ্ট্রিক উন্নয়নের দায়িত্বপালন। এই দায়িত্ব পালনে তাই বিশেষ পদ্ধতি ও উপকরণ উদ্ভাবন ও অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রশাসনিক কার্যকারিতার জন্য কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার যেমন, জীবন বৃত্তিক চাকুরীর বৈধতা ও নিরপেক্ষতা, মিতব্যয়িতা ও গতি, সহজবোধ্য কার্য সম্পৃক্ত ফরম, পত্রাদি লিখন, নিবন্ধন, নথি সংরক্ষন, অফিস পরিকল্পনা ও সরঞ্জাম ইত্যাদি। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা মূলতঃ পূর্বোক্ত বিষয়গুলির পদ্ধতি, গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বক্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনবৃত্তি চাকুরী সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। মেধা ও যোগ্যতাভিত্তিক জীবনবৃত্তি চাকুরী আধুনিক লোক প্রশাসনের প্রাণস্বরূপ। এ অধ্যায়ে জীবনবৃত্তি চাকুরীর প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। এছাড়া এই অধ্যায়ে রয়েছে জীবনবৃত্তি চাকুরীতে শ্রেণীকরণ ও পদক্রম, জীবনবৃত্তি চাকুরীর বেতন, অন্যান্য আর্থিক, অ-আর্থিক সুবিধাদির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা কর্মচারী প্রশাসন সংক্রান্ত। সরকারী বেসরকারী উভয় প্রকার প্রশাসনের ক্ষেত্রেই কর্মচারী প্রশাসনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এ অধ্যায়ে সুষ্ঠু কর্মচারী প্রশাসনের মৌল বিষয়গুলি যেমন, নির্বাচন, নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃংখলা, আবেদন এবং পরামর্শ জনশক্তি পরিকল্পনা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে প্রশাসনে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত আলোচনাটি অত্যন্ত বাস্তব ধর্মী ও আকর্ষনীয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম মানব সম্পর্ক, তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ। এ অধ্যায়ের আলোচনার মূল বক্তব্য মোটামুটি হ'ল "লোক প্রশাসন ক্ষেত্রে কর্মচারী সংক্রান্ত কার্যালয় এবং আদেশ প্রদানকারী তত্ত্বাবধায়কের অধীনে যে সব কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন, তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করতে হচ্ছে। এবং জীবনবৃত্তি চাকুরীতে সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে অবিরাম প্রশিক্ষণ ও আদেশ নির্দেশ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে লোক প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষনের বিস্তৃত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কিত সহজ, সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতি ইত্যাদি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বায়ত্ত্বাশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সরকারী উদ্যোগ। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেসরকারী উদ্যোক্তার অভাব, পুঁজির সংকট প্রভৃতি কারনে সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের স্বায়ত্বশাসিত ও বানিজ্যিক শিল্প সংগঠন গড়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রকার, উদ্ভবের কারন, ব্যবস্থাপনার ধরন ইত্যাদি এক্ষেত্রে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে আমরা পাই বাজেট এবং অর্থ সংক্রান্ত প্রশাসন বিষয়ক আলোচনা।

দশম অধ্যায়ে লোক প্রশাসনে গবেষনা ও পরিকল্পনার ভূমিকা যুক্তিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে লোক প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার এবং এ ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সার গ্রন্থের বক্তব্য সুস্পষ্ট, "পরিকল্পনা তখনই মূল্যবান যখন একে বাস্তবায়িত করা হয় এবং সমন্বয় ও সংশ্লেষণ করা হয়। জাতীয় পরিকল্পনার জন্য ধারাবাহিকতা, নমনীয়তার মাঝে সমতা বিধান প্রয়োজন। নতুন ঘটনা ও অবস্থার আলোকে .... বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন।"

একাদশ অধ্যায়ের আলোচনা পরিব্যাপ্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রনয়নের বিস্তৃত ও জটিল বিষয়কে কেন্দ্র করে। প্রশাসনিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রনয়নের প্রকৃতি মূলতঃ এই আলোচনার মূল বিষয়।

দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রশাসনিক জনসংযোগ প্রতিবেদন বিষয়ে। জনসংযোগ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য প্রকৃতি প্রক্রিয়া, প্রকার ইত্যাদি এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এ প্রসংগে সার গ্রন্থের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য "আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও সচেতনতা বিকাশের মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে লোক প্রশাসনকে দায়িত্বশীল ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে এবং প্রশাসন ব্যবস্থাকে বোঝার জন্য জনগনকে উৎসাহিত করতে হবে। সরকারের উচিৎ নাগরিকবৃন্দকে প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত রাখা ....."। এক্ষেত্রে জনসংযোগ প্রতিবেদনের গুরুত্ব ও প্রকৃতির বিস্তৃত আলোচনা এ অধ্যায়ের মূলভাব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে সহজেই।

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের একটি মাত্র অধ্যায়ের শিরোনাম লোক প্রশাসনে কারিগরি সাহায্য। আধুনিক লোক প্রশাসন তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে

পড়েছে। এই ব্যাপক বিস্তৃতি লোক প্রশাসনের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরি সাহায্য ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ এ অধ্যায়ের মূল বিষয়।

সার গ্রন্থের বিষয়বস্তু অত্যন্ত আধুনিক। লোক প্রশাসন সংক্রান্ত আলোচনায় এ 'বিষয়গুলি অতি সাম্প্রতি কালেও যথেষ্ট উচ্চারিত। কিন্তু সার গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনার একটি মৌল দুর্বলতা হ'ল এই আলোচনার সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমা দেশগুলির ধ্যান ধারনার প্রকাশ। তারপরও সামগ্রিক আলোচনার মাপকাঠিতে এটি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সময়োগী গ্রন্থ।

লোক প্রশাসন সার গ্রন্থের অনুবাদ অত্যন্ত সাবলীল। প্রশাসন ব্যাকরনের অপেক্ষাকৃত জটিল ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভংগিমায় অনুবাদক উপস্থাপন করেছেন। বইটিতে কিছু মুদ্রনপ্রমাদ ঘটেছে। উদাহরণ দে'য়া যাক-বইয়ের প্রারম্ভিক অনুবাদকের কথায় একটি ত্রুটি রয়েছে। অনুবাদক মোহাম্মদ শামসুর রহমান-এর পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়ে এখানে উল্লেখিত হয়েছে সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু অনুবাদক জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের একজন অধ্যাপক। সাত পাতায় দ্বিতীয় প্যারার শেষ লাইনটি এমন "এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন, অপরিহার্য বিষয় বলে বিবেচিত হচ্ছে"১। পাদটীকা অথবা প্যারার পূর্ববর্তী লাইনগুলির বক্তব্য থেকে উল্লেখিত বাক্যের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়া সার গ্রন্থের আট পাতায় সাব-হেডিং 'উন্নয়নগামী দেশের প্রশাসনিক সমস্যাবলী'কে 'খ' নং এ দেখানো হয়েছে। এটা হবে 'গ' একইভাবে দ্বিতীয় ভাগের পঞ্চম অধ্যায়কে লেখা হয়েছে পঞ্চম পরিচ্ছেদ। দ্বাদশ অধ্যায়ের পর গ্রন্থের 'তৃতীয় ভাগ' শুরু হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে লেখা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়। এ ধরনের কিছু ভুল উপেক্ষা করলে বইটির বাঁধাই, প্রচ্ছদ ইত্যাদি চমৎকার। লোক প্রশাসন চর্চার সাথে যুক্ত শিক্ষক, ছাত্র/ছাত্রী, পেশাজীবি ও গবেষকবৃন্দ নিঃসন্দেহে এই বই থেকে উপকৃত হবেন। শ্রমসাধ্য অনুবাদের জন্য সবশেষে মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে এবং বই এর পুর্নমুদ্রনের জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

খন্দকার নাইমুল ইসলাম

IBS PUBLICATIONS

The IBS, established in 1974, is an advanced interdisciplinary centre for study and research on the history and culture of Bangladesh and such other subjects as are significantly related to the life and society of Bangladesh leading to M. Phil and Ph.D degrees.

The IBS has a number of publications : Two annual journals, seminar volumes, books and monographs to its credit.

PUBLICATIONS

1. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies* edited by S.A. Akanda, Vols, I-VI (1976-82); M.S. Qureshi, Vols, VII-XII (1983-89) : S.A. Akanda, Vols. XIII-XV (1990-92); M.S. Qureshi, Vols XVI-XX (1993-97).
2. *Reflections on Bengal Renaissance* (seminar volume 1) edited by David Kopf and S. Joarder (1977).
3. *Oitijya, Sangskriti, Shahitya* (seminar volume 3 in Bengali) edited by M.S. Qureshi (1979).
4. *Studies in Modern Bengal* (seminar volume 2) edited by S.A. Akanda (1981).
5. *The New Province of Eastern Bengal and Assam* (1905-1911) by M.K.U. Mollah (1981).
6. *Provincial Autonomy in Bengal* (1937-1943) by Enayetur Rahim (1981).
7. *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (seminar volume 4) edited by S.A. Akanda (1983).
8. *Tribal Cultures in Bangladesh* (seminar volume 5) edited by M.S. Qureshi (1984).
9. *Bankim Chandra O Amra* (seminar volume 6) by Amanullah Ahmed (1985).
10. *Bangalir Atmaparichaya* (seminar volume 7) edited by Safar A. Akanda (1991).
11. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh* (seminar volume 8) edited by Safar A. Akanda & Animal Islam (1991).
12. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol. I (From the fall of Daud Karrani 1576 to the death of Jahangir 1627) also in Bangla, Vol. 2 ... by Abdul Karim (1992, 1995).
13. *The Institute of Bangladesh Studies, an introduction,* (1994).
14. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies : An up-to-date Index* by Md. Shahjahan Rarhi, (1993).
15. *IBS Journal Bangla annual review* edited by M.S. Qureshi; 1400:1, 1401:2, 1402:3, 1403:4
16. *Bangla Sahityer Itihas Roconar Somosya* (seminar volume 9) edited by M.S. Qureshi, (1997).
17. *Socio-Economic Development of a Bengal District : A Study of Jessore 1883-1925* by Muhammad Muhibullah Siddiquee, (1997).